সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ গল্প

(প্রথম গুচ্ছ)

পুষ্প

বাঙ্গুর এভিন্যু, কলকাতা পঞ্চান্ন

ভূমিকা

দেশী সাহিত্যের সঙ্গে তুলনামূলক বিচারে বাঙলা সাহিত্যের
শ্যপট বা পরিসর অনেক ছোট, নিন্দুকদের এ অপবাদ দীর্ঘদিনের।
ক্ষে বা বিপক্ষে যুক্তি অনেক, অবকাশ নেই তর্কের জাল বুনে সন্দেহাতীতভাবে
কজনকে শ্রেষ্ঠ প্রতিপন্ন করার— তবুও বাংলা সাহিত্যে সামিয়ানার কয়েকটি
কাণের অন্ততঃ একটির স্বামী শ্রীসঞ্জীব চট্টোপাধ্যায় নিজেই, একথা রসিকরা
মেশাই স্মরণ করেন। অনতিদীর্ঘ সাহিত্যজীবনে শ্রী চট্টোপাধ্যায়ের মূল্যায়ণে
হু উচ্চারিত এ কথাটি তাঁর অমিত সম্ভাবময়তা থেকে ক্রম উত্তরণ
বং প্রাপ্তি বিষয়ক স্থিতির দ্যোতক।

চট্টোপাধ্যায়ের লেখার মুখ্য বিষয় মানুষ, বহু উৎকর্ষতা নিয়ে
সুস্থ-আধাসুস্থ মানুষ এবং ক্রমবিস্তারিত উদাসীনতা থেকে হৃদয়হীনতা।
ার আছে সারি সারি নিঃসঙ্গ মানুষ, দীর্ঘ পদযাত্রায় ক্লান্ত, কুণ্ঠায়
হায্য ভিক্ষার পথেও যান না, জানেন প্রায় সকলেই ভিক্ষুক, দাতা নেই,
হীতা সারি সারি। অসম্ভব নিষ্প্রভ মুখ শ্রী চট্টোপাধ্যায় তাঁর
ল্প সাজান— হাসির কি? এত আর্দ্র মুখ নিয়ে হাসির গল্প লেখা সম্ভব?
শ্রী চট্টোপাধ্যায়ের হাসির গল্প তাই হাসির গল্প হয়েও বিমর্ষ,
ষ্ট এবং নিঃসঙ্গ। এরই মধ্যে বহমান জীবন এবং মৌকি
শ্রম প্রয়াসের দ্বৈতাদ্বৈত।

বর্তমান শ্রেষ্ঠ গল্পের সংস্করণে সন্নিবেশিত গল্পসমূহের মধ্যে তাঁর
ভিন্ন স্বাদের এবং মেজাজের ১৩টি গল্প রয়েছে। মূল লক্ষ্য ছিল
খকের সাহিত্যজীবনের প্রতিনিধিত্বমূলক গল্পসমূহকে ধরা।
আশা করি এই সংকলন পাঠক-সমাজে যথোচিত মর্যাদা লাভ করবে।

উৎসর্গ

শ্রীঅশোক দাস

বন্ধুবরেষু

তৃতীয় পুরুষ

সদরে গাড়ি থামার শব্দ হল। মিটার ফ্ল্যাগ তোলার ক্ষীণ একটু শব্দও শোনা গেল। বঙ্কিমের কান সজাগ ছিল বলেই, রেডিও চলা সত্ত্বেও শুনতে পেল। খাটের বাজুতে ঠেসান দিয়ে, ঠ্যাঙের ওপর ঠ্যাঙ তুলে, বঙ্কিম সকালের কাগজ পড়ছিল, রেডিও-ও শুনছিল, পাশের বাড়ির শাশুড়ী বউয়ের প্রাত্যহিক প্রাতঃকালীন ঝগড়ার দিকেও কান রেখেছিল। এখন গাড়ি থামার শব্দ এবং মিটার ফ্ল্যাগ তোলার ক্লিং শব্দটাও শুনল। বঙ্কিম একসঙ্গে অনেক দিকে মনোযোগ দিতে পারে বলেই, তার জীবনে বোধ হয় কিছু হল না। বহুমুখী মন নিয়ে বঙ্কিমের কেরিয়ারের বারোটা বেজে গেল। বঙ্কিমের মেকার্সদের অন্তত সেই রকমই ধারণা।

ক্লিং শব্দটা হতেই বঙ্কিম চট করে উঠে রেডিওটা বন্ধ করে দিল। হাত দিয়ে মাথার চুল খানিক এলোমেলো করে নিল। খাটের মাথা থেকে একটা

চাদর নিয়ে গায়ে জড়ালো। এখন এই রকম একটা অসুস্থতার মেক-আপ নিয়ে তাকে প্রতিমার সামনে দাঁড়াতে হবে। তাতেও শেষ রক্ষে হবে কিনা সন্দেহ। বঙ্কিমের বউ ফিরে আসছে নার্সিং হোম থেকে, তাদের জয়েণ্ট ভেনচার, প্রথম সন্তান কোলে নিয়ে। ফিরিয়ে আনছে বঙ্কিমের পিসতুতো বোন। বিয়ের বছর না ঘুরতেই, বঙ্কিম প্রাউড ফাদার।

বঙ্কিম কিন্তু জানে, সে মোটেই প্রাউড নয়, বরং কাওয়ার্ড। সে নিজেকে কোনো দিনই ফাদার বঙ্কিম বলে ভাবতে পারেনি। তার ধারণা, ফাদার হবার যোগ্যতা একমাত্র তার ফাদারেরই আছে। তিন কি বড় জোর চার বছর বয়সে মা মারা যাবার পর তার জীবন একেবারে কানায় কানায় পিতৃময়। তার মন, ভাব, ভাবনার আকাশ আচ্ছন্ন করে পিতা পরমেশ্বর। শৈশবে পিতৃভক্তির আতিশয্যে বঙ্কিম সুর করে সকাল সন্ধ্যে পিতৃশ্রাদ্ধের মন্ত্র পাঠ করত—পিতা স্বর্গ, পিতা ধর্ম। বঙ্কিমের এক জ্যাঠাইমা যাঁর ঠোঁটকাটা, কটুভাষী, কাণ্ডজ্ঞানহীন বলে পরিচয় আছে, তিনি একদিন বঙ্কিমের ভুল ধরিয়ে দিয়ে বলেছিলেন, 'এ কি রে? এ তো মাথা ন্যাড়া করে, ঘাটে বসে পিণ্ডোৎসর্গের সময় পড়তে হয়।' বঙ্কিম সত্য মিথ্যে জানার জন্যে পিতা পরমেশ্বরকে প্রশ্ন করেছিল। ভয়ও ছিল, শ্রাদ্ধের মন্ত্র পড়ে জীবিত পিতার পরলোকের পথ প্রশস্ত করে ফেলছে না তো! তিনি বলেছিলেন, 'ও সব সংশয়বাদীদের কথা। ভক্তিমার্গে এসব বাধা ইগনোর করবে। পিতা আর পরমপিতার শুধু তিনটি শব্দের তফাৎ— প র আর ম। পিতাকে যে সন্তান পরম পিতা করে নিতে পারে তার আর মার নেই। পিতার জন্মও নেই মৃত্যুও নেই। নে সেই গানটা গা। তোর দাদুর সেই গানটা।' বঙ্কিম সংশয়মুক্ত মনে, সিঙ্গল রিডের হারমোনিয়াম বাজিয়ে, চাঁছা ছোলা গলায় গেয়েছিল, সুখে ডালে বসি ডাকিছো পাখি রে, ডাকিছো কি সেই পরমাপতারে।

চোখ বুজিয়ে বঙ্কিম বহুবার মাকে দেখবার চেষ্টা করেছে। পারেনি। দেবদেবীর মূর্তিও আসতে চায় না। চোখ বুজলেই পিতা পরমেশ্বর— সিনিক্যাল মুখ, পাতলা নাক, ডগাটা অল্প একটু বেঁকে কমার মত পাতলা ঠোঁটের ওপর ঝুঁকে পড়ে গজাল গোঁফ জোড়াকে যেন জিজ্ঞেস করছে—কি হে ভায়া, ঠিকঠাক আছ তো! মাথার সামনে খেলার মাঠের মত একটি অসাণ টাক। তীক্ষ্ম দুটি চোখ, লিভারের গ্যাঁড়াকলে প্রায়ই হলুদ বর্ণ।

সোনালী ফ্রেমের শৌখীন চশমা। একেবারে স্ট্রেট ইরেকট্ মেরুদণ্ড। সামনে লুটানো কোঁচা। ফাইন ধুতি। কালো ঝকঝকে জুতোর ওপর রাস্তার মিহি ধুলো। সাদা টেনিস সার্ট। ক্রিম কালারের কোট। গটগট করে মিলিটারিদের মত হাঁটা। জুতোর গোড়ালির শব্দ কি। খট্‌খট্। নির্মূল করে কামানো দাড়ি। সদা গম্ভীর মুখ। সে মুখে মেয়েলি মুচকি হাসি বঙ্কিম কখনও দেখেনি। বছরে একবার বিজয়ার দিন একটু সিদ্ধি খেয়ে পরমেশ্বর যখন হাসতেন, বঙ্কিম সে হাসির নাম রেখেছিল—একতলা-দোতলা। হাসির রোল লাফাতে লাফাতে ধাপে ধাপে উপরে উঠে যেত, আবার নেমে আসত ধাপে ধাপে। স্বরযন্ত্রের স্বচ্ছন্দ বিহার। পাড়ায় আর একজন মাত্র মানুষের এই রকম হাসি ছিল। তাঁর নাম ছিল সন্তোষদা। বাড়ির পাশেই পান বিড়ির দোকানের মালিক। তাঁর হাসির অবশ্য একটা ডিফেক্‌ট ছিল। পরমেশ্বরের হাইটে উঠত ঠিকই, তবে ওই খোল ফাটা তুবড়ির মতো। শেষ ধাপে উঠেই হাসি হয়ে যেত ব্রঙ্কাইটিসের কাশি। সন্তোষদা কাশতে কাশতে শেষকালে বুকটা চেপে ধরে, 'ওরে বাবারে, ওরে বাবারে' বলে আর্তনাদ করে উঠতেন। সন্তোষদা দিনে শখানেক বার হাসতেন। তখন বাঙলা দেশে হাসির কাল চলেছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের টাকা হাওয়ায় উড়ছে। পরমেশ্বর হাসতেন বছরে একবার। সেই কারণে একটায় ছিল নাদ, অন্যটায় আর্তনাদ।

বঙ্কিমের মনে যে ফাদার, ফিগার বা ফিগার ফাদার ছিল, তা পরমেশ্বরের আদলে ঢালা। ঠুমরি নয়, একেবার ধ্রুপদ। বঙ্কিম নিজে একেবারে উল্টো। পরমেশ্বর তাকে ইটারনাল সান করে গড়ে তুলেছিলেন। তার ভেতর থেকে পিতৃনির্যাসের শেষ বিন্দুটুকু বের করে নিয়ে বঙ্কিমকে এমন কায়দায় মানুষ করেছিলেন, মেয়েছেলে দেখলেই যেন গো-বৎসের মত হাম্বা, মা মা করে ওঠে। বঙ্কিম নিজেও বিশ্বাস করতে শুরু করেছিল—ফাদার হবার কোনো কোয়ালিটিই তার মধ্যে নেই। সারা পৃথিবীতে বাবাদের যদি কোনো স্ট্যাণ্ডার্ড স্পেসিফিকেসান তৈরি করে কোয়ালিটি মার্ক দেবার প্রথা থাকত, তাহলে সেই স্ট্যাণ্ডার্ড তৈরি হত পরমেশ্বরকে দেখে। পরমেশ্বর চিরকালের ফাদার, বঙ্কিম চিরকালের সন্তান। বঙ্কিমের ভাব সন্তানভাব। তার ভেতরটা কেবলই বাবা বাবা করছে। কিন্তু বিধির বিধানে, সেই বঙ্কিম আজ ফাদার। পরমেশ্বরের সমর্থন ছাড়াই এই অশনিসম্পাত। সে নিজে এককালে

বাবা, বাবা করেছে, এইবার তাকে বাবা বাবা করবার এতটুকু একটা যন্ত্র তৈরি হয়েছে।

প্রতিমা বুকের কাছে এতটুকু একটা তোয়ালের পার্সেল ধরে, ধীরে ধীরে সিঁড়ি ভেঙে ওপরে উঠে আসছে। বঙ্কিম লাজুক লাজুক মুখে সিঁড়ির মাথায় দাঁড়িয়ে আছে। মুখ দেখলে মনে হবে বঙ্কিমই যেন মাদার। আর প্রতিমা যেভাবে উঠে আসছে মনে হচ্ছে সেই যেন ফাদার। যেন পরমেশ্বর বাজার করে ফিরছেন, বগলে একটা এক পাউন্ড রুটি। বঙ্কিম চোরের মত এদিক ওদিক একবার তাকিয়ে দেখল। যেন কত বড় একটা অপরাধ করে ফেলেছে! দুজন থেকে তিনজন হয়েছে। প্রতিমার গর্ভসঞ্চারের ব্যাপারটা যখন কিছুতেই আর চেপে রাখা গেল না, সারা শরীরে এবং ব্যবহারে মায়ের দয়ার মতই শনৈঃ শনৈঃ প্রকাশিত হল, তখন পরমেশ্বর ছেলেকে বলেছিলেন—'মাল্টিপ্লিকেশান ইজ এ রুল বাট ডোণ্ট মেক ইট এ ন্যাচারাল প্র্যাকটিস।' সেই সারমন শোনার পর থেকেই বঙ্কিমের লজ্জা ও অপরাধ বোধটা আরো বেড়ে গেছে।

আর তিনটে ধাপ ভাঙলেই প্রতিমা দোতলায় উঠে আসবে। বঙ্কিম সারা মুখে একটা নির্বোধের হাসি ছড়িয়ে, লম্বা তর্জনীটা একটা হুকের মত সামনে বাড়িয়ে, চাপা গলায় জিজ্ঞেস করল—'এইটা, এইটা?' প্রতিমা কোনো উত্তর দিল না। শুধু একটু থেমে কটমট করে তাকাল। বঙ্কিম ভয়ে ভয়ে বলল—'একটু হাত দেবো?' স্পর্শ করার জন্যে আঙুলের হুকটা একবার বাড়িয়েও ছিল। তোয়ালের মোড়কটা বুকের কাছে আড়াল করে প্রতিমা বললে—'না।' প্রতিমার স্বাভাবিক গলাই লাউডস্পীকারের মত। 'না'টা একটু জোরেই বলেছিল। সারা বাড়িটা যেন শিউরে উঠল। বঙ্কিম তাড়াতাড়ি একপাশে সরে দাঁড়াল। প্রতিমা গট গট করে নিজেদের ঘরে গিয়ে ঢুকলো। প্রতিমার কাঁধের পাশে হলদে কাপড়ের একটা সাইড ব্যাগ ঝুলছে। সাইড ব্যাগে কি আছে, কে জানে! আসল বস্তুটা ব্যাগে নেই তো।

বঙ্কিম জানে প্রতিমার পক্ষে সবই সম্ভব। একবার একটা দুধচোর হুলোকে বাজারের ব্যাগে ভরে মাইলখানেক দূরে ছেড়ে দিয়ে এসেছিল। যদিও বেড়ালটা প্রতিমা ফেরার আগেই ফিরে এসে আবার ঘরে যথাস্থানে গ্যাট হয়ে বসেছিল। এই সিঁড়িতেই একবার প্রথম রাতে একটা ছিঁচকে চোরের হাত থেকে নতুন তোয়ালে, গেঞ্জি, আরো কি কি সব কেড়ে নিয়ে, চোয়ালে

একটা আণ্ডারকাট ঝেড়েছিল। চোরটা শেষ ধাপে ছিটকে পড়ে বলেছিল—মা, এমন ঘুষি থানার বড় দারোগার হাত থেকেও খালাস হবে না। ঘুষির প্রশংসায় খুশি হয়ে প্রতিমা চোরকে নতুন গেঞ্জিটা উপহার দিয়েছিল। পরমেশ্বর অবশ্য বলেছিলেন, বাইরের লোকের সামনে ঘোমটা দিয়ে বেরোলে শালীনতা বজায় থাকে। প্রতিমা বলেছিল, এর পর চোরে আপনার তোয়ালে কি জুতো চুরি করতে এলে ঘোমটা দিয়েই ঘুষি চালাব। এই প্রতিমাই পরমেশ্বরের হার্ট এটাকের সময়, পাড়ার এক জুনিয়ার ডাক্তারকে সাইকেলের পেছনে বসিয়ে পড়ি কি মরি করে নিয়ে এসেছিল। বঙ্কিম তখন অফিসে। পরমেশ্বর সুস্থ হতে হতে বলেছিলেন, বউমার জন্যে এ যাত্রা বেঁচে গেলুম। সুস্থ হয়ে বলেছিলেন—হি-ওম্যান। গোঁফ থাকলে ওই বঙ্কিমের স্বামী হত। প্রতিমা সব পারে, কেবল মেয়েছেলে হতে পারে না।

বঙ্কিম পায়ে পায়ে ঘরে এসে ঢুকল। প্রতিমা ইতিমধ্যে খাটে পা মুড়ে বসেছে। কোলের ওপর তোয়ালেতে এতটুকু একটা লাল মত মানুষ। মানুষের বাচ্চা যে এত জঘন্য দেখতে হয় বঙ্কিমের ধারণাই ছিল না। মাথায় কয়েক গুচ্ছ লোম। ওকে চুল বলা যায় না। মুখটা অনেকটা আলুপোড়ার মত। গায়ের চামড়া যেন রোস্টেড রাঙাআলু। পেটে একটা কাপড়ের পট্টি। ওই জায়গাটাতেই ছিল প্রতিমার সঙ্গে নাড়ীর যোগ। জীবনের ভাইটাল সাপ্লাই লাইন। কোথায় দুধের টিনের গায়ে আঁকা সেই একমাথা কোঁকড়া চুল, নীল আকাশের মত চোখ বাচ্চা! একটু আগের স্পর্শ করার ইচ্ছেটা তার আর নেই। প্রতিমাকে কত সুন্দর দেখতে। এক মাস নার্সিং হোমের যত্নে থেকে রং যেন ফেটে পড়ছে। মুখের চামড়া একেবারে টান টান তেলা তেলা। চোখ দুটো মনে হচ্ছে অয়েলিং ক্লিনিং করে নতুন ফিট করা হয়েছে। মণি দুটো ঝকঝকে কালো। সেই প্রতিমার জঠর থেকে এইরকম একটা আগলি জিনিস বেরোলো। নিজের সৃজনী শক্তির ওপর বঙ্কিমের ঘেন্না ধরে গেল।

বঙ্কিম রাস্তার ধারের জানালার গর‍্যাদ ধরে দাঁড়াল। মানুষের বাচ্চা সে একটু বড় অবস্থায় দেখেছে। ফ্রেশ ফ্রম এবডোমেন, সে দেখেনি। পাশের বাড়ির গরুর বাচ্চা সে ডেলিভারী হতে দেখেছে। মার পেট থেকে পড়েই খোলা মাঠের ওপর দিয়ে দৌড়লো। চারটে পা তখনো ছোটায় অভ্যস্ত নয়। ধড়াস ধড়াস করে বার কতক আছাড় খেল। তবু পৃথিবীর মাটিতে পা

রাখবার কি আনন্দ। ধবধবে সাদা রং। বড় বড় নতুন চোখ। বঙ্কিম ভাবে বিভোর হয়ে মনে মনে বলেছিল—ও ক্রিয়েটার! কি সুন্দর, কি সুন্দর! মানুষের বাচ্চা গরুর মত হবে সে একসপেকটও করে না, ডিজায়ারেবলও নয়। তাহলেও এই কি একটা স্যাম্পল! সে ছাগলের বাচ্চা, খরগোসের বাচ্চা, কুকুরের একসংগে আটটা বাচ্চা, বেড়ালের বাচ্চা, মুরগীর একগাদা বলের মত বাচ্চা দেখেছে। একমাত্র পাখির বাচ্চা ছাড়া এত কুৎসিত প্রোডাকসন সে আর দেখেনি।

বঙ্কিম জানলার পাশ থেকে সরে এসে, খাটের আর একদিকে বসে একটু উসখুস করে জিজ্ঞেস করল, 'এই রকমই হয় বুঝি?' প্রতিমা এতক্ষণ একটাও কথা বলেনি। রাগে জ্বলে যাচ্ছিল। পুরো একটা মাসের বারুদ, এক কথায় ভিসুভিয়াসের মত ফেটে পড়ল—'হ্যাঁ এইরকমই হয়। স্বার্থপর, চোর, জোচ্চোর, ধাপ্পাবাজ, চিটিংবাজদের ছেলে এইরকমই হয়। কথা বলতে লজ্জা করছে না। এ ছেলে তোমার নয়।' ভাগ্যিস বুদ্ধি করে বঙ্কিম ঘরের দরজাটা বন্ধ করে দিয়েছিল। এ সব ডায়ালগ পিতা পরমেশ্বরের কানে গেলে রক্ষে নেই। একেই তিনি সেদিন বলেছিলেন -'আমার ছেলেটা সেণ্টলি ইনোসেণ্ট ছিল। পাল্লায় পড়ে পেকে গেল।' কথা হচ্ছিল বোনের সঙ্গে। বঙ্কিম ওভার হিয়ার করেছিল। 'জেনে রাখবি, ভাল যখন খারাপ হয় তখন খারাপকেও সে ছাড়িয়ে যায়।' পরমেশ্বরের সঙ্গে প্রথম থেকেই প্রতিমার সম্পর্ক খুবই খারাপ। দর্শনেই অ্যালার্জি। বিয়েটা নেহাত গোলেতালে হয়ে গেছে। পরমেশ্বরের বন্ধু অক্ষয়বাবু আবার হাত দেখেন। বঙ্কিমের মনে আছে, বেশ কিছুকাল আগে পরমেশ্বর বলেছিলেন - 'দেখ তো অক্ষয় এর হাতটা একবার। একমাত্র ছেলে। সংসারে থাকবে বলে মনে হচ্ছে না।' বঙ্কিম তখন মা বলতে মূর্ছা যায়।

অক্ষয়বাবু হাত দেখে হাসতে হাসতে বলেছিলেন—চন্দ্র ইজ ভেরি গুড। উচ্চ চিন্তার কারক। বৃহস্পতি ইজ ভেরি স্ট্রং। সেভ করবে। বাঁচিয়ে বাঁচিয়ে নিয়ে যাবে শেষ জীবন পর্যন্ত। তবে তবে। বার কতক তবে তবে করে বললেন—সন্ন্যাসী। নো চানস। শুক্রটা ফেরোসাস হয়ে আছে। বাঘের মত। বরং একটু সাবধানে থাকা উচিত। আচোট কাগজ, চোট করে দিতে পারে। ওয়ান ড্রপ অফ ইংক, ফিনিশ। সাদা আর সাদা থাকবে না বাবাজীবন, স্পটেড, কলঙ্কিত।

পরমেশ্বর মুখে এই শাস্ত্রটিকে 'ফেক' বলতেন। বলতেন বোগাস। কিন্তু যেহেতু অক্ষয়বাবু একটা খারাপ সম্ভাবনার কথা বলেছেন, পরমেশ্বর সঙ্গে সঙ্গে সেটিকে ধ্রুবসত্য বলে ধরে নিলেন। পরমেশ্বর ভাল দেখতে পান না, দেখতে পারেন না, ভালতে তাঁর বিশ্বাসও নেই। অক্ষয়বাবু ভাল কিছু বললে জ্যোতিষশাস্ত্র বাজে হয়ে যেত। খারাপ বলে পরমেশ্বরের বিশ্বাসে শাস্ত্রকে প্রতিষ্ঠিত করলেন। আর বঙ্কিমও সেই শাস্ত্র নির্দিষ্ট পথেই আচোট কাগজে চোট খেল। প্রতিমাই সেই কালির আঁচড় ধরেই মেরে দিয়েছে। খানায় ফেলে দিয়েছে।

বঙ্কিম-রূপ-দুর্গকে দখলে রাখার অনেক চেষ্টা করেছিলেন পরমেশ্বর। পারেন নি। প্রতিমার কাছে সেই দুর্গের পতন হয়েছে। মেবারের রানা মোগলাই বাহিনীর ধাক্কায় পরাজিত। পরমেশ্বরের প্রতিরোধ চুরমার। অধ্যাত্ম রামায়ণ থেকে ছেলের নোটবুকে শ্লোক লিখে দিয়েছিলেন—স্ত্রীয়াঃ সমস্তা সকলা জগৎসু। চার্বাক না অন্য কোনো একটা মুনির মেয়েছেলে সম্পর্কে একটা ড্যামেজিং কোটেসানও ছেলেকে শিখিয়েছিলেন। সবটা বঙ্কিমের মনে নেই। একটু যা মনে আছে তা হল—মূত্র, পুরীষ ভাবিতে। অর্থাৎ বর্তমানে একটা মাংসের দলা নিয়ে যে প্রতিমা খাটে বসে আছে আইবুড়ো বেলায় তার বাইরের রূপ দেখে—ডোণ্ট গেট চার্মড। তত্ত্বদর্শী মুনি বলছেন—বঙ্কু, সি ইজ নাথিং বাট কিছু মল, কিছু মূত্র, কিছু কফ, কিছু পিত্ত। এত করেও ছেলে বাঁচল না। লাইফ সেভিং কিট নিয়েই বঙ্কিম ভুড় ভুড় করে জলে ডুবে গেল। হিতোপদেশের গল্পে আছে নিমজ্জমানকে উদ্ধার না করে তীরে দাঁড়িয়ে উপদেশ ছুঁড়ে দিতে হয়। পরমেশ্বর উপদেশের মধ্যে একটি উপদেশই ছেলেকে দিলেন—'গোয়িং দি ফ্যামিলিওয়ে, সব সময় মনে রাখবে, রেট অফ মাল্টিপ্লিকেশন ইজ ডাইরেকটলি প্রোপোরশনাল টু রেট অফ এক্সপেনডিচার।' এই একটি কথা বলেই পরাজিত পরমেশ্বর, পুত্রে আর দুচোখে দেখতে পারি না—পুত্রবধূর সংসারে, নিজের চারপাশে একটা ম্যাজিনো লাইন দাঁড় করিয়ে দিলেন। বঙ্কিম যদি হিটলার হত তাহলে হয়তো ব্লিৎসক্রিগ করে উড়িয়ে দিতে পারত। সে নেহাতই জরু কা গোলাম।

বঙ্কিম বিছানায় হাতের চেটো দুটো ইকির মিকির চামচিকির খেলার ধরনে পেতে, মিনমিনে গলায় বউকে বললে—'চেঁচাচ্ছো কেন? পাড়ার লোককে আমাদের প্রাইভেট কথা শুনিয়ে কোনো লাভ আছে?' বঙ্কিমের

আবেদনে কোনো লাভ হল না। প্রতিমার স্বাভাবিক গলাই 'জি'শার্পে' বাঁধা, তার উপরে উত্তেজিত। বঙ্কিম একটু কল্পনাপ্রবণ, নরম প্রকৃতির লোক। হৃদয়টি শ্রীচৈতন্যের, শরীরটাই যা কেবল অকেজো বঙ্কিমের। ছেলে কোলে প্রতিমাকে যীশু কোলে মাতা মেরী ভেবে এই প্রচণ্ড মুখরা অবস্থাতেও ভালবাসা যায় কিনা, বঙ্কিম চেষ্টা করে দেখল। প্রতিমা ঝাঁঝিয়ে উঠল, 'চেঁচাবো না মানে? আমি ঢাক পেটাবো। তোমরা বাপ-ব্যাটা মানুষ না অমানুষ?' মেরীমাতাকে চিন্তায় আনা গেল না। বঙ্কিম 'বাপ' শব্দটাকে সহ্য করতে পারে না। বাবা বলতে দোষটা কি? সেও এবার শ্বশুর মশাইকে সসুর বলবে, শাশুড়ীকে সাউড়ি। বঙ্কিম মৃদু প্রতিবাদ করল। স্ত্রীকে প্রয়োজন শাসন করা যায়, কিন্তু যে স্ত্রী সদ্য মা হয়েছে তাকে এখনি কি কড়া কথা বলে! সহজ ডেলিভারি নয়, সিজারিয়ান। অনেক স্টিচ পড়েছে, এখনও পুরো শুকোয়নি। স্টিচটা কোথায়! স্টিচ কেমন! বঙ্কিমের জানার কৌতূহল ভীষণ। প্রতিমা নিজের বউ হয়েও এমন বিহেভ করছে, যেন পরস্ত্রী! বঙ্কিম বললে—'ব্যাপারটা তোমার সঙ্গে আমার, এর মধ্যে বাপ বাপ করে সেই এলুফ বৃদ্ধকে টানছ কেন?' প্রতিমা কোনো যুক্তিই মানে না, ঘোড়ার ডিম। সে সেই একই ভল্যুমে বললে—'টানবো না মানে? এইবার গলায় ছাতার বাঁট লাগিয়ে দুটোকেই টানবো। লজ্জা করে না, বাপ ব্যাটায় পরামর্শ করে খরচের ভয়ে ভুঁড়িটা একটু বড় হতেই . '

বঙ্কিম সামলে দিলে—মাইন্ড ইওর ল্যাঙ্গুয়েজ। বাপ তবু সহ্য করা যায়, ভুঁড়ি শব্দটা দেখতেও যেমন শুনতেও তেমনি আগলি। প্রতিমা বললে, 'রাখো তোমার আগলি, আগলির নিকুচি করেছে। আমার ইচ্ছে করছে,' দাঁত কিড়মিড় করে প্রতিমা বললে, 'তোমার কাপড় খুলে...।' আর নয়। বঙ্কিম বললে, 'তোমার পেটে ওয়ার্ম'স হয়েছে, যেরকম দাঁত কিড়মিড় করছে, নাক খুঁটতে ইচ্ছে করে? এক ডোজ 'সিনা' দিতে পারলে ভাল হত।'

'ওয়ার্ম'স যেটা হয়েছিল সেটা এখন কোলে। সিনা খেয়ে তোমার ওয়ার্ম'স মারো। রোগটা ভীষণ ছোঁয়াচে।'

বঙ্কিম আর বসতে পারল না! দাঁড়িয়ে পড়ল। অসম্ভব। সে যদি হিপনোটিজম জানত! এ-মেয়েকে বশে আনার ক্ষমতা রাখে একমাত্র সার্কাসের রিং মাস্টার। পরমেশ্বর ঠিকই বলেছিলেন—যেসব মহিলার গড়ন ডেয়ো পিঁপড়ের মত হয়, দেখতে ভাল হলে কি হবে, স্বভাবে তারা প্রতিমার মত

হয়। গুরুজন-বাক্য শোনেনি, তখন তো প্রেম-যমুনায় ঢেউ গুনেছে, এখন তো ম্যাও সামলাতেই হবে। অবশ্যই এ তরফের কিছু ল্যাপসেস আছে। তা বলে বাড়িতে ঢুকেই এইভাবে তাদের পিণ্ডি চটকানোর কোনো মানে হয়। এটা কি ভদ্রলোকের মেয়ের পক্ষে শোভন! বঙ্কিমের কি দোষ! সে তো হেল্পলেস হাবি। সংসারের কন্ট্রোল গিয়ার তো পরমেশ্বরের হাতে। বঙ্কিম যা রোজগার করে, ডিউটিফুল ছেলের মত মাসে মাসে তুলে দেয় পরমেশ্বরের হাতে। সংসার নামক স্টেজকোচের সঙ্গে সেই কেবল টিকিটধারী যাত্রী, প্রতিমা তার লাগেজ। গাড়ির গায়ে যাত্রীদের জন্যে, পরমেশ্বরের ওয়ার্নিং, মাল নিজ দায়িত্বে রাখুন। মাল এবং মালের জন্য ড্রাইভার কাম কনডাকটার পরমেশ্বরের কোনো রেসপনসিবিলিটি নেই। বঙ্কিম নিজের দায়িত্বে ফাদার।

পরমেশ্বর হিসেবী মানুষ। তাঁর নানা হিসেব। অসংখ্য খামে অসংখ্য ফাণ্ড। খামগুলোর রং গোলাপী। কারণ বঙ্কিমের ফুলশয্যার তত্ত্বে শ্বশুর-মশাই মেয়েকে চিঠি লেখার জন্যে যে রাইটিং সেট দিয়েছিলেন তার মধ্যে এই খামগুলো ছিল। বিয়ের পর আর প্রেম থাকে না। গোলাপী খাম ইউসলেস। পরমেশ্বরের কাজে লেগে গেছে। কোন খাম 'এডুকেশন ফাণ্ড,' কোনো খাম 'ফেস্টিভ্যাল ফাণ্ড', একটা 'অকেসানাল বুক পারচেজ ফাণ্ড.' এইভাবে 'ট্রিটমেণ্ট ফাণ্ড', 'লুচি, ফাণ্ড,' 'অ্যামিউজমেণ্ট ফাণ্ড।' সবচেয়ে বড় ফাণ্ড, যেটা খামে ধরে না, সেটা হল—'হাউস বিলডিং ফাণ্ড।' মাসে মাসে থোক টাকা ব্যাঙ্কে জমা পড়ছে—সবার আগে বাসস্থান। পরমেশ্বর বলেন, সব কিছু কার্টেল করে আগে একটা মাথা গোঁজার ঠাঁই। বেশ কষ্টেই সংসার চলে। প্রতিমা জানে, কতদিন রাতে কুমড়োর ঘ্যাঁট আর রুটি খেয়ে, দুজনে পাশাপাশি শুয়ে, মুখে বড় এলাচের দানা ফেলে মাঝরাত অবধি গজগজ করেছে, দধীচির হাড় দিয়ে বাড়ি তৈরি হবে অবশেষে, সেই বাড়ি হবে আমাদের সমাধি, তোমার আমার প্রেমের তাজমহল সেই খামফাণ্ড বা ফাণ্ডখামে প্রেগনান্সির কোনো প্রভিসান ছিল না। পরমেশ্বরের হিসেবে—বঙ্কিমের একসপেকটেড ফার্স্ট ইস্যু—পাঁচ বছর পরে। বঙ্কিম যদি স্লিপ করে, বঙ্কিমের বাবা কি করবেন? পুরোটাই এখন বঙ্কিমের দায়িত্ব।

ফার্স্ট ইস্যু, রিসক অনেক, এ বাড়িতে দেখাশোনা করার দ্বিতীয় কোনো মহিলা নেই, এইসব যুক্তিপূর্ণ কথা বলে প্রতিমাকে বাপের বাড়ি পাচার করা হয়েছিল। তাতে অপরাধটা কি হয়েছে! বেশির ভাগ মেয়েই তো

প্রথম মা হবার সময় বাপের বাড়িতেই হয়। বঙ্কিম বললে—'ঠিক আছে, আমি পার্টটাইম করে, যা খরচ হয়েছে হিসেব করে তোমার বাপকে ইনস্টলমেণ্টে শোধ করে দেবো, দরকার হলে ইণ্টারেস্টও দেবো।' বঙ্কিম ইচ্ছে করেই বাপ বলল। বাপে বাপে কাটাকাটি।

'তোমার টাকায় তারা...'

তাঁরা যা করে দেন, অন্তত, প্রতিমা যা বললে বঙ্কিম উচ্চারণ করতে পারবে না।

'টাকাটা বড় কথা নয়, বড় কথা হল মন। সেই ছ'মাসে আমি গেছি, তোমাদের বাড়ি থেকে কেউ একবার দেখতে গেল না। আড়াই টাকা দামের গোটাকতক চাটনি আপেল হাতে করে অন্তত একজনও কেউ একদিন যেতে পারত। তোমার কথা ছেড়েই দিচ্ছি। তুমি তো একটা মেষ। বাইবেলের হোলি ল্যাম্ব।'

বঙ্কিম দমে না গিয়ে নিজেদের ডিফেনসে বললে 'আর কে আছে যে যাবে? যেতে হলে বাবাকেই যেতে হয়। তিনি এসব পছন্দ করেন না।'

'কি পছন্দ করেন না?'

বঙ্কিম বললে -'মানুষের বাচ্চা হওয়া। আমি জন্মাবার পরই মা মারা গেলেন তো, সেই থেকে বাচ্চাতঙ্ক। তাছাড়া আর একটা মারাত্মক ব্যাপার আছে। ওই হিজড়ে।'

'হিজড়ে মানে?'

'একদল হিজড়ে আসে না, বিশ্রীভাবে হাততালি দিতে দিতে, কার হল গো, কার হল, খোকা হল না খুকি হল।' বঙ্কিম সুর করে বলল। 'এনিহাউ ওটাকে স্টপ করতে হবে।'

প্রতিমা অবাক হয়ে বলল, 'বাব্বা, একখানা বাড়ি বটে। পাগলের বংশ বলব, না শয়তানের বংশ! এমন জানলে গর্ভপাত করিয়ে আসতুম।'

পাগল কিংবা শয়তান দুটো বিশেষণই বঙ্কিমের পছন্দ হল না। হজম করা ছাড়া উপায় নেই।

প্রতিমার আর এক প্রস্থ আক্রমণ—'তোমার কি হয়েছিল শুনি? মাসখানেক না হয় অসুখে ভুগেছ। তারপর? একবার নার্সিংহোমে যেতে কি হয়েছিল? মজা মারবার সময় মেরেছিলে, তারপর যে মরছে সে মরছে, তাই না? স্বার্থপর, খলিফা।'

বঙ্কিম বললে, 'ছি ছি, সে কি কথা? আসলে লজ্জা করছিল। সবাই আঙুল দেখিয়ে বলবে, ওই দেখ, ওই ছেলেটার বাবা। বিচ্ছিরি ব্যাপার! যা করে ফেলেছি ফেলেছি। আমাদের মধ্যেই থাক। লোক জানাজানি করে লাভ কি?' বঙ্কিম এমনভাবে বলল, যেন কত অপরাধ করে ফেলেছে! কুমারী বা বিধবার সন্তান হয়েছে!

বঙ্কিমের বাচ্চা এই সময় ওঁয়া ওঁয়া করে কেঁদে উঠল! 'ওমা, কাঁদে যে! থামাও থামাও, বাবা কি মনে করবেন?'

'তোমার বাবাও একদিন কেঁদেছিলেন। সব বাবাই কেঁদেছিল। যাও, বাইরে যাও, আমি একে খাওয়াবো।'

'কি খাওয়াবে?'

'আদিখ্যেতা। শিগগির পরিষ্কার একটা বাটিতে একটু গরম জল করে আন।'

এতদিন পিতাপুত্রে রান্না করে খাওয়াদাওয়া করছিল। মাঝে মধ্যে পরমেশ্বরের বোন এসে সাহায্য করছিলেন। এই তিন চার মাস বঙ্কিম তার ব্যাচেলার লাইফ ফিরে পেয়েছিল। পরমেশ্বরও বেশ খুশি খুশি ছিলেন যেন হারানো ছেলে ফিরে পেয়েছেন। দিনের মধ্যে এক আধবার বঙ্কিম হাসতেও দেখেছে। আজ আবার অন্য পরিস্থিতি। বঙ্কিম রান্নাঘরে ঢুকে দেখল পরমেশ্বর গম্ভীর মুখে উনুনে চায়ের কেটলি চাপিয়ে উবু হয়ে দু'হাতে মাথা ধরে বসে আছেন। বঙ্কিম একটু লজ্জা পেল। চা টা তারই করা উচিত ছিল। আমতা আমতা করে বলল, 'সরুন, আমি করছি।' জল প্রায় ফুটে এসেছে সোঁ সোঁ শব্দ করছে। পরমেশ্বর একটা হাত কপাল থেকে সরিয়ে ছেলের দিকে তাকালেন। হাতটাকে আবার যথাস্থানে ফিরিয়ে দিয়ে বললেন—'আমিই করছি, তুমি এখন আদারওয়াইজ এনগেজড। তোমার সময় কোথা?' তবু বঙ্কিম চামচের পেছন দিয়ে চায়ের কৌটোর ঢাকনা খোলায় ব্যস্ত হল। খুলতে খুলতে জিজ্ঞেস করল—'ক'কাপ জল আছে?' পরমেশ্বর সেই ভাবেই বসে থেকে বললেন—'তিন কাপ। এক কাপ বেশি নিয়েছি।' বঙ্কিম বুঝল। পরমেশ্বর প্রতিমারও জল নিয়েছেন। বঙ্কিম বলল—'আপনি ঘরে যান, আমি চা দিয়ে আসছি' পরমেশ্বরকে রান্না ঘর থেকে সরাতে না পারলে বঙ্কিম তার ছেলের জন্যে গরম জল বসাতে পারছে না। একেই প্রতিমা তেমন কাজের নয়, গোছানো নয় বলে প্রথম

থেকেই পরমেশ্বরের অফুরন্ত অভিযোগ। এখন বঙ্কিমকে বউয়ের ফরমাইশ খাটতে দেখলে কি বলে বসবেন কে জানে! একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে পরমেশ্বর উঠে দাঁড়ালেন। উঠতে বেশ কষ্ট হল। ইদানীং কোমরে বাত আশ্রয় করেছে। যেতে যেতে বলে গেলেন—'কড়ায় চিঁড়ে ভেজে রেখেছি। চায়ের আগে দিও। ও কতদূর কি জানে জানি না, তবে তোমার কিছু জানা উচিত, এই সময় চিঁড়ে ভাজা, ঘিয়ে রসুন ভাজা, সাবু—এইসব খাওয়া উচিত।'

জলে চা ভিজছে। পরমেশ্বর যে পিঁড়েটায় বসেছিলেন সেই পিঁড়েতে এখন বঙ্কিম। তারও মাথায় হাত। দিনটা আনন্দের না দুঃখের বোঝা দায়। বঙ্কিম তার মায়ের অভাব এতদিনে ভাল করে বুঝল। সেদিনও বুঝেছিল, বুঝেছিল ফুলশয্যার দিন সকালে, যেদিন পরমেশ্বর তাদের ঘরে নতুন খাট ফিট করে ছেলের ফুলশয্যার শয্যা তৈরি করে দিচ্ছিলেন। রজনীগন্ধার মালা ঝুলিয়ে দিচ্ছিলেন চার দিকে। বঙ্কিম সেদিন অসম্ভব লজ্জা পেয়েছিল। সে কেবলই ভাবছিল, কয়েক ঘন্টা পরেই এই খাটে একটা মেয়ের সঙ্গে সে শোবে, শুধু শোবে না, নিজেদের আইবুড়ো অবস্থার উপর রঙীন মশারি ঝুলিয়ে দেবে, অন্ধকার মাঝ-রাতে ঘরের হাওয়ায় পরীর মত ডানা মেলে ফুলের গন্ধ উড়বে। এখন পরমেশ্বর অন্য ঘরে। নিদ্রাহীনতার রুগী। নির্জন বিছানায় স্মৃতি সঙ্গী করে ভোরের অপেক্ষায় জানলার বাইরে তাকিয়ে থাকবেন।

বঙ্কিম স্টেনলেস স্টিলের বাটিটাকে অন্তত দশবার ধুলো। পৃথিবীতে সদ্য আগত অতিথি উষ্ণ জল খাবে। জল খাবে, কি অন্য কিছু খাওয়াবে প্রতিমাই জানে। অত্যন্ত সতর্ক হতে হবে, কোনোরকম জীবাণু যদি একবার ঢোকে, কত রকম কি হতে পারে—পোলিও, ডিপথেরিয়া, জিআর্ডিয়া, ব্যাসিলাই ডিসেণ্ট্রি। পরমেশ্বরের হোমিওপ্যাথি বই পড়ে ভয়ংকর ব্যাধির জগতের অনেক তথ্য বঙ্কিমের নখদর্পণে। প্রতিমার আবার চোরা অম্বল নেই তো! চেক করতে হবে। ভাবনার শেষ নেই। শিশুমৃত্যুর হার এদেশে এখনও খুব বেশি। তাছাড়া এ ফ্যামিলির ফার্স্ট ইস্যু বাঁচে না। রেকর্ড আছে। পরমেশ্বরের প্রথম কন্যা সন্তান দুমাস না তিন মাসের হয়ে পটল তুলেছিল। বেঁচে থাকলে বঙ্কিমের একটা দিদি থাকত। বঙ্কিমের জ্যাঠামশায়েরও সেই একই ব্যাপার।

দুর্ভাবনা আর গরম জল নিয়ে বঙ্কিম ঘরে ঢুকতেই প্রতিমা তাড়াতাড়ি বঙ্কিমের দিকে পিছন ফিরে বসল। ছেলেকে দুধ খাওয়াচ্ছে। বঙ্কিমের একটু হিংসের মত হল। মনে মনে বললে স্যাক্রিফাইস করতে হবে। বিছানার উপর

একটা ময়লা এক টাকার নোট অবহেলায় পড়ে আছে। বঙ্কিম জিজ্ঞেস করল—'এটা কি?' 'তোমার ছেলের মুখ দেখে গেল।' 'এর মধ্যে আবার কে মুখ দেখে গেল?' প্রতিমা খুব তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বলল—'বামুনদি।' এই বামুনদি, এক সময়, বঙ্কিমদের যখন বোলবোলা ছিল, তখন রান্নার কাজ করত। বুকে পিঠে করে বঙ্কিমকে মানুষ করেছে। এখন অন্য বাড়িতে কাজ করলেও, পুরোনো মনিব বাড়ির মায়া কাটাতে পারেনি। বঙ্কিম টাকাটা মাথায় ঠেকিয়ে তুলে রাখল।

গরম জলের বাটিটা নিয়ে প্রতিমা বললে, 'ঝিনুক?' সর্বনাশ, ঝিনুক কোথায় পাবে বঙ্কিম! মুখটা কাঁচুমাচু করে ভৃত্যের মত দাঁড়িয়ে রইল। প্রতিমা বললে, 'নিকালো।' এমনভাবে বললে, যেন চোরকে চোরাই মাল বের করতে বলছে জাঁদরেল দারোগা। 'ঝিনুক তো নেই।' 'কেন নেই? তোমাদের হিসেব, এই হিসেবটা নেই কেন?' বঙ্কিম বললে, 'চামচে দিয়ে আপাতত ম্যানেজ করা যায় না!' প্রতিমা ঝোলাটা দেখিয়ে বললে, 'বের কর। জানতুম আমি তোমাদের মুরোদ কত।' ঝুলি থেকে ঝিনুক বেরোলো। 'কিনলে?' প্রতিমা বললে, 'কিনবো কেন? বাপের বাড়ি থেকে বাগিয়েছি। এই ঝিনুকে আমি দুধ খেতুম।' বঙ্কিম অবাক হয়ে ঝিনুকটা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখল। মার ঝিনুকে ছেলে দুধ খাবে। কি আশ্চর্য! দেখা শেষ করে বঙ্কিম বললে, 'দাঁড়াও ধুয়ে আনি।' প্রতিমা বললে, 'ভ্যাগ, ধোবার কি আছে? পরিষ্কারই তো আছে।' 'অ্যাপারেন্টলি পরিষ্কার, মাইক্রোস্কোপের তলায় ফেললে অসংখ্য জীবাণু জড়িয়ে আছে। বয়েল করে স্টেরিলাইজ করে আনি। তুমিও হাতটা ডিসইনফেকটান্ট দিয়ে ভাল করে ধোও।' প্রতিমা অবজ্ঞার সঙ্গে বললে, 'অত সব পারবো না।'

ঝিনুক ফোটাতে ফোটাতে বঙ্কিম খুব ঘাবড়ে গেল। বউ দেখছি ব্যাকট্রোলজির এ-বি-সি জানে না। ফুলস ট্রিড হোয়ার এঞ্জেলস ফিয়ার। ওঃ, বাড়িতে গিন্নীবান্নি কেউ নেই! কোর্ট থেকে কোনো হুলিয়া বের করা যায় কি? ডিস-ওবিডিয়েন্ট মাদার ছেলেটাকে দেখছি মেরেই ফেলবে। মা বেঁচে থাকলে যা হয় একটা কিছু করা যেত। বঙ্কিমের মঙ্গলের জন্যে বঙ্কিমের মা পাঁচু ঠাকুরের দোর ধরেছিলেন। পাঁচু ঠাকুর আবার কোন দেবতা! দোর ধরাটা কি? কে বলে দেবে বঙ্কিমকে!

খাটে বসে প্রতিমা পা নাচিয়ে নাচিয়ে চিঁড়ে ভাজা চিবোচ্ছে। চিঁড়ের মুচমুচ শব্দের সঙ্গে খাটের জয়েন্টের কিঁচকিঁচ শব্দ। চায়ের কাপ থেকে রোদের

গায়ে ফিকে ধোঁয়া উঠছে। ঘরে একটা বেশ সুখ-সুখ ভাব। শিশু-শিশু গন্ধ। বঙ্কিম বললে, 'দোর ধরতে জানো?' প্রতিমা একটু হাই তুলে বললে, 'সে আবার কি? দোর মানে দরজা। কার দরজা?'

'পাঁচু ঠাকুরের দরজা।' বঙ্কিম ব্যাপারটাকে একটু ব্যাখ্যা করল। প্রতিমা বললে, 'অসুখটা তো মেয়েদের হয়, তোমার হল কি করে?'

'কি অসুখ!'

'আঁতুড়ে বাই। পুয়ের পেরাল ইনস্যানিটি বইটা পড়ে দেখ—প্রসবের পর বা পূর্বে বলক্ষয় প্রভৃতি কারণে কোন কোন রমণী উন্মাদ রোগাক্রান্ত হইয়া থাকে। ওষুধটাও দেখে নাও—হায়োসায়েমাস ৩, ট্রামোনিয়াম ৩, ক্যানাবিস ইণ্ডিকা ৬, লক্ষণ মিলিয়ে তোমার বাবার বাক্স থেকে এক ডোজ খেয়ে নাও।'

'তুমিও পড়েছ?'

'পড়বো না? আমার বাবারও ওই বই একটা আছে।'

বঙ্কিমের আর কথা বলার সময় নেই। প্রসূতি পরিচর্যা, পরমেশ্বরের চর্যা সব একসঙ্গে ঘাড়ে পড়েছে। এখুনি এক বালতি গরম জল চাই। প্রতিমার স্নান। দুপুরের খাওয়া। পরমেশ্বরের তৃতীয় পক্ষের চা। বইয়ে লেখা আছে, প্রথম সপ্তাহে ডাল বা কোন গুরুপাক তরকারি খাওয়া সংগত নয়। তা হলে মাছের ঝোলই বোধহয় বিধেয়।

বাথরুমে গরম জল দিয়ে বঙ্কিম যখন ঘরে এল, প্রতিমা তখন ঘুমন্ত ছেলেকে ঘাঁটু ঘাঁটু করে আদর করছে। 'ব্যাটা ভীষণ শয়তান। সারা দিন পড়ে পড়ে ঘুমোবে, রাত্তিরে চিল-চেঁচান চেঁচাবে।' বঙ্কিমকে দেখে বললে 'রাতে তোমার ভার। তুমি সামলাবে। আমি পড়ে পড়ে ঘুমোবো।' বঙ্কিম বললে, 'তাহলে ঈশ্বরের কাছে দুটো জিনিস এখুনি বর হিসেবে চেয়ে নিতে হয়, সারা রাত চুষবে কি?'

গরম জল দিয়েই সমস্যা মিটল না। প্রতিমার পরবর্তী ফরমাশ, পিঠে একটু সাবান আর স্পঞ্জ ঘষে ময়লা তুলে দিতে হবে। প্রস্তাবটা লোভনীয়। প্লেজেন্ট জব। কিন্তু দুজনে বাথরুমে ঢুকলে, পরমেশ্বর যদি জানতে পারেন—জয় মা, জয় মা বলে চিৎকার করে বুঝিয়ে দেবেন, পৃথিবীতে অনাচারের বর্গক্ষেত্র ক্রমশই বড় হচ্ছে, যা কিছু ভরসা তুমি মা।

দুজনে চোরের মত পা টিপে টিপে বাথরুমে ঢুকল। প্রতিমার তেলা পিঠে জল ঢেলে সবে সাবানের ফেনা করেছে, বন্ধ দরজা ভেদ করে একটা ক্ষীণ ওঁয়া

ওঁয়া শব্দ কানে এল। বঙ্কিমের অভিলাষ পূর্ণ হল না। অনেক দিন পরে একটু স্ত্রীসঙ্গ, একটু আদর আনন্দ। স্পঞ্জটা হাত থেকে নিয়ে প্রতিমা বলল, 'আস্তে কোলে তুলে নিয়ে হাঁটুটা নাচিয়ে নাচিয়ে সুর করে আয় রে আয় রে কর, ঘুমিয়ে পড়বে। ঘাড়ের কাছে হাত দিয়ে তুলবে, আবার ঘাড় মটকে দিও না। ব্রহ্মতালু এখনও তপতপে, ওখানে খোঁচাখুঁচি করো না।'

বঙ্কিম বাথরুম থেকে বেরিয়েই পরমেশ্বরের সামনে পড়ে গেল। প্ল্যাস্টিকের মগ হাতে দাড়ি কামাবার জল নিতে আসছিলেন। বঙ্কিমের মুখটা শুকিয়ে গেল। তবু স্কুয়িং আপ কারেজ, আমতা আমতা করে বলল, 'একটু এনগেজড আছে, দিন আমি গরম জল রান্নাঘর থেকে এনে দিচ্ছি।'

পরমেশ্বর গম্ভীর মুখে বললেন, 'আমিই পারবো।'

তৃতীয়বারের চা দিতে গিয়ে বঙ্কিম দেখলে, পরমেশ্বর হাতের তালুতে দাড়ি কামাবার বুরুশের জল ঝাড়ছেন মনোযোগ দিয়ে। মুখ যেন আষাঢ়ের মেঘ। টেবিলের রং-চটা প্ল্যাস্টিক কভারের একপাশে কাপ নামিয়ে রেখে বঙ্কিম বললে, 'চা।' একটি ডিশে সকালের পুজোর দুটো প্রসাদী বাতাসা, আটাকা, পিঁপড়ের ভোগ হয়ে পড়ে আছে। বঙ্কিম জানে, একটা তার, অন্যটা তৃতীয় পক্ষের। ফুঁ দিয়ে পিঁপড়ে উড়িয়ে বাতাসা দুটো হাতে নিয়ে বঙ্কিম বেরিয়ে যাচ্ছিল, পরমেশ্বর জানালার ফ্রেমের পেরেকে সুতো বেঁধে বুরুশটা ঝোলাতে ঝোলাতে বললেন—'তোমাদের অফিসে মেটারনিটি লিভের ব্যবস্থা আছে?'

বঙ্কিম বললে—'আজ্ঞে হ্যাঁ, আছে।'

'তা হলে নিয়ে নাও।'

বঙ্কিম অবাক। তার মুখ দিয়ে বেরিয়ে এল, 'সে তো মেয়েদের!'

পরমেশ্বর বললেন, 'স্পেশাল কেস কর। দেখ গ্রান্ট করে কিনা! প্রয়োজন হবে। শিশুপালন তো তোমাকেই করতে হবে। কে ওর দায়িত্ব নেবে! বুড়ো বয়েসে আমার পক্ষেও সম্ভব নয়। ওর মা তো ফেলে সরে পড়বে। বেড়ালের স্বভাব। ফেলাইন হ্যাবিট। শী ইজ নট এ মাদারলি টাইপ।'

বঙ্কিম ধাক্কা খেয়ে বেরিয়ে এল। মনে মনে বলল, খেল শুরু। ছ' মাস ফ্রন্টিয়ারে সিজফায়ার ছিল। নাও শালা হোস্টিলিটি বিগিনস।

পরমেশ্বর নমো-নমো খাওয়া শেষ করে কাগজ পড়ছেন। প্রতিমা খেতে বসেছে। বঙ্কিম হাত নেড়ে নেড়ে ছেলের মুখের মাছি তাড়াচ্ছে। হঠাৎ তার একটু কেরামতি করার ইচ্ছে হল। অধীত বিদ্যা একবার যাচাই করে দেখলে

মন্দ কি! বইয়ে পড়েছে, নাভিতে রেড়ির তেলের প্রদীপের সেঁক দিলে তাড়াতাড়ি শুকিয়ে যায়। বুড়ো আঙুলটা শিখায় গরম করে আলতো করে চেপে ধর। প্রদীপ পায় কোথায়! কিন্তু লাইটার আছে! ছেলের পেটের পটিটা খুলে ফেলল। লাইটারে বুড়ো আঙুল তাতিয়ে আলতো করে চেপে ধরল। প্রথমবারে কিছু হল না, দ্বিতীয়বার দিতেই ছেলে কঁকিয়ে কেঁদে উঠল। প্রতিমা এঁটো হাতে ধড়মড় করে ছুটে এল, যেভাবে মুরগীর মা ছুটে আসে।

'কি করছ, কি? ও কি, ওটা খুলেছো কেন?'

বঙ্কিম অপরাধীর মত মুখ করে বলল—'নশো সাতচল্লিশ পাতা।'

'তার মানে?'

'নাভিতে প্রদীপের সেঁক দেবার কথা আছে। প্রদীপের অভাবে লাইটার।'

প্রতিমা ছো মেরে লাইটারটা কেড়ে নিয়ে জানালা গলিয়ে রাস্তায় ফেলে দিল। রাগে মুখ থমথমে, বুঝেছি, ছেলে সহ্য হচ্ছে না, যতক্ষণ না শেষ করতে পারছো ততক্ষণ শান্তি নেই।' বাঁ হাতে ছেলেকে বুকে তুলে নিল।

বঙ্কিম মনে মনে বললে, ভুল, ভুল, পরমেশ্বরের অ্যাসেসমেণ্ট ভুল। কে বলে, শী ইজ নট এ মাদারলি টাইপ। শুনিয়ে শুনিয়ে বাথরুমে গান গাইলে কি হবে, মা হওয়া কি মুখের কথা! বঙ্কিমও এবার প্রতিমার পক্ষ নিয়ে গাইবে—মা যদি নিদয়া হয়, তা হলে কি প্রাণ রহিত? বঙ্কিম লাইটার উদ্ধারেব জন্যে রাস্তায় দৌড়ল, রাস্তায় নেই, আটকে আছে কার্নিসে।

প্রতিমা এমনিই একটু ফাঁকিবাজ টাইপের। সংসারে সে বউ হতে চায়, ঝি নয়। অথচ বাঙালী কনজারভেটিভ পরিবারে হাম ভি মিলিটারি, তোম ভি মিলিটারি গোছের বউ কেউ চায় না। বউ হবে ডিগনিফায়েড মেড-সারভেণ্ট। মুখ বুজে হুকুম তামিল করবে—পানি লাও, চা বানাও, চিৎ হও, উপুড় হও, ত্রিভঙ্গমুরারি হও। বদলে, বছরে চারখানা শাড়ি, আঁচলে এক গোছা চাবি, চার বেলা আহার, সপ্তাহে একটা সিনেমা, দশ কি বারো বছরে তিন থেকে চারবার প্রজনন। ব্যতিক্রম হলেই তুমি শালা জাঁহাবাজ মহিলা। প্রতিমা ব্যতিক্রমের মধ্যে পড়ে গেছে। তাকে 'ইয়েস ওম্যান' বলা চলে না। অতএব তিনি এখন তোফা ঘুমোবেন। আর বঙ্কিমচন্দ্র ব্যস্ত হবে সরষের বালিশ তৈরিতে। বঙ্কিমের পিসীমা কথায় কথায় বলেছিলেন, সরষের বালিশে শোয়ালে মাথাটি নিটোল গোল হবে, একেবারে পাকা বেলের মত! বঙ্কিমের সেই কেতাব আবার বলছে, ভূমিষ্ঠ হইবার পর হইতে একশ দিন পর্যন্ত শিশুকে চিৎভাবে শয়ন না করাইয়া

ডান বা বাম পার্শ্বে শয়ন করানো ভাল। সারা মাসের রান্নার সরষে বালিশের খোলে ভরে যে জিনিস তৈরি হল তাকে বালিশ না বলে সরষের কাঁথা বলাই ভাল।

ঘুমন্ত শিশুর মাথার তলায় সেই বল বেয়ারিং বালিশ ঢোকাতে গিয়ে দুটো মারাত্মক ত্রুটি আবিষ্কার করল। প্রথমত চিৎ, দ্বিতীয়ত হাঁ করে নিশ্বাস নিচ্ছে। বঙ্কিমের বই বলছে, সব সময় নজর রাখ। হাঁ হয়েছে কি বুজিয়ে দাও। ম্যাক কিঙ্কসাহেব বলেছেন, ওই হাঁ পথে যত রোগজীবাণু শিশুর শরীরে ঢুকবে। প্রথম অসুখই টি-বি। ইস, দিনের বেলায় না হয় ঘুরতে ফিরতে একবার করে এসে বুজিয়ে দেওয়া গেল, রাতের বেলায় টর্চলাইট জেবলে কে পাহারা দেবে। মা আর ছেলে দুজনেই হাঁ। বঙ্কিম প্রথমে ছেলেরটা বোজাল। বউয়েরটা বোজাতে একটু বেগ পেল। টেম্পার করা ঠোঁট। যেই বোজায়, সঙ্গে সঙ্গে প্যাট করে খুলে যায়। বোজা, খোলা, খোলা, বোজা করতে করতে প্রতিমার ঘুম ভেঙে গেল। বঙ্কিম অপ্রস্তুতের হাসি হেসে বলল—'হাঁ করে ঘুমোনো চলবে না। জীবাণু ঢুকে যাবে।' প্রতিমা বিশাল একটা হাই তুলে বলল—'আদেখলের আংটি হল, দেখতে দেখতে প্রাণটা গেল। নাও, একটা ফর্দ কর—দুধ এক টিন বড়, গ্রাইপ-ওয়াটার একটা, রবার ক্লথ দু মিটার, গোল মশারি, তোয়ালে এক ডজন।'

বঙ্কিমের মুখ শুকিয়ে গেল—টাকা? ব্যাঙ্কার তো পরমেশ্বর। বঙ্কিম জিজ্ঞেস করল, 'এখনই দুধ কেন? এখন তো তোমার দুধই যথেষ্ট।' প্রতিমা বললে, 'যথেষ্ট নয় বলেই তো বলা হচ্ছে।' কিন্তু এখনই টিনের দুধ। বই বলছে, মায়ের দুধের একমাত্র বিকল্প গাধার দুধ। পাশেই ধোপা আছে, গাধাও আছে, গাধী তো নেই! চারিদিকে শত গাধা। গাধীরা কোথায় থাকে? গাধারা কোথায় জন্মায়। বুঝেছি সব শালা খচ্চর, আসলে কেউ পিওর গাধা নয়। দুধ নিয়ে মহা চিন্তা হল তো। প্রতিমাকে জিজ্ঞেস করলে—'খাটালে গিয়ে রাম খেলোয়ানকে জিজ্ঞেস করে আসব, ওরা কি করে গরুর দুধ বাড়ায়?'

প্রতিমা বললে, 'আমি জানি, ফুকো দেয়, আর রোজ পাঁচ সের ভেলি বিচিলির সঙ্গে খাওয়ায়। দুধ না কিনে যাও ফুকোর ডাক্তার ডেকে আন!'

বিকেলের চা পর্বের উপর সন্ধ্যা নামল। বহুকালের প্রথা, ঠাকুরঘরে প্রদীপ দেখিয়ে শাঁখ বাজানো। প্রতিমা কোনো কালেই করেনি। এখন তো

সাত খুন মাপ। আঁতুড়ে পক্ষাঘাত। পরমেশ্বরই করেন। মেয়েদের হাতে শেষ সন্ধ্যার প্রদীপ পড়েছিল তিরিশ বছর আগে। বঙ্কিম শাঁখের আওয়াজ শুনলো। পরমেশ্বর বাজাচ্ছেন। পরমেশ্বরের এই শাঁখ সন্ধ্যায় মাঙ্গলিক নয়, প্রতিমার অক্ষমতার পেছনে শিঙে ফোঁকা। প্রথম ফুঁ—অপদার্থ। দ্বিতীয় ফুঁ—ম্লেচ্ছ স্বভাব। তৃতীয় ফুঁ—দেখবো, দেখবো, কতদিন এই ভেড়া-স্বামীর পদসেবা পাস হতভাগী। সন্ধ্যে উৎরে অন্ধকার বেশ ঘন হল। পরমেশ্বর খবরের কাগজে মুড়ি ঢেলে তেল মেখে খাচ্ছেন। মাঝে মাঝে এক-আধটা বাদামভাজা, একটা করে গোলমরিচের দানা। কুড়িটা বাদাম, পাঁচটা মরিচ হল ডোজ। বঙ্কিম পায়ে পায়ে ঘরে ঢুকলো।

পরমেশ্বর আড়চোখে দেখে শুকনো গলায় বললেন –'আয়।'

গলার স্বরে আর বেশী দূর কথা এগোক এমন কোনো ইঙ্গিত নেই। তবু বঙ্কিমকে বলতে হবে—দুধের কথা, রবার ক্লথের কথা, তোয়ালের কথা। বঙ্কিম আমতা আমতা করে বলল—'ওটাকে একবার দেখলেন না!' ওটা শব্দটা এমনভাবে উচ্চারণ করল যেন নিউটার জেন্ডার। একটা কীটপতঙ্গ বিশেষ। পিতৃত্বের অহংকারকে বাথটবের ঠান্ডা জলে চুবিয়ে মারা। পরমেশ্বর ইস্‌স্‌ করে একটা শব্দ করলেন—মরিচের ঝাল হতে পারে, বা ভেতরে জমে থাকা বিষাক্ত হাওয়ার আউটলেটও হতে পারে। নির্বিকার মুখে বললেন—'দেখার সময় এলেই দেখব। আমার সব কিছু একটা নিয়ম আছে।' নিয়মের লাটাকলে পরমেশ্বর বাঁধা। বঙ্কিম প্রস্তুত হল পরের প্রসঙ্গের জন্যে। মোস্ট ডেলিকেট ইস্যু টাকা। একটা ঢোক গিলে বললে—'কিছু টাকার প্রয়োজন ছিল, কয়েকটা জিনিস, এই যেমন..।' পরমেশ্বর একটা মরিচ মুখে ফেলতে যাচ্ছিলেন, ফেলা হল না, দু' আঙুলে ধরে রেখে বললেন, 'আই অ্যাম সরি বঙ্কিম, আমার হাত এখন একেবারে খালি। ধারধোর করে জোগাড়ের চেষ্টা করতে হবে।' তার মানে তুমি ধারটার করে ম্যানেজ কর। পরমেশ্বর আর একটু যোগ করলেন—'আমি তো প্রিপেয়ারড হবার কোনো চান্সই পেলুম না। সব কিছুর একটা প্রিপারেশন চাই। তুমি প্রিপেয়ারড না হয়ে পরীক্ষা দিয়ে ফেল করলে, প্রিপেয়ারড না হয়ে ফাদার হলে, পভার্টি ডেকে আনলে।' বঙ্কিমকে বেশ মোলায়েম করে কড়কে দিলেন। বাছাধন এইবার বোঝ, বাপ হয়ে বাপ বাপ কর।

সব শুনে প্রতিমা বললে, 'এইবার লোকের বাড়ি ঝি-গিরি করতে বেরোই,

ওইটাই আর বাকি থাকে কেন। বাড়-খোঁপা করে, মুখে দোক্তাপান ঠুসে 'বাড়ি বাড়ি বাসন মেজে বেড়াই।'

বঙ্কিম বললে, 'কাল থেকেই চেষ্টা করি, মারোয়াড়ীর গদিতে পার্ট টাইম। না জোটে ফুটপাথে গামছা বিক্রি। মধ্যবিত্তের আবার মান-সম্মান! ছেলেটাকে মানুষ করতে হবে তো। আপাতত ঘড়িটা বেচে যা লাগে কিনে আনি।'

প্রতিমা বললে—'মাইরি আর কি। ঘড়িটা আমার বাবার দেওয়া। বেচতে হয় তোমার বাপের ট্যাঁকঘড়িটা বেচ গে যাও।'

শেষ পর্যন্ত অবশ্য কাউকেই কিছু করতে হল না। সাত দিনের দিন পরমেশ্বর বঙ্কিমের মার একটা মপচেন বঙ্কিমের ছেলের গলায় পরিয়ে দিলেন। স্নান করে শুদ্ধ বস্ত্র পরেছেন। কপালে চন্দনের টিপ। রুক্ষ চোখে কোমল দৃষ্টি। দু' হাতের উপর শিশুকে শুইয়ে বঙ্কিমের ঠাকুর্দার ছবির সামনে চোখ বুজিয়ে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে বিড়বিড় করে বললেন—'এসেছেন, তিনি এসেছেন।'

সেই শিশু পরমেশ্বরের হাতে বড় হতে হতে এখন বারো বছরের দুর্দান্ত কিশোর। পরমেশ্বর বাহাত্তর বছরের সাত্ত্বিক বৃদ্ধ। বঙ্কিমের চুল পেকেছে। ছুটির দিন প্রতিমা পাকা চুল তুলে দেয়। তা না হলে কুটকুট করে। অস্থির করে মারে। বিল্ডিং ফান্ডের টাকায় নতুন বাড়ি হয়েছে। দোতলার ঘরে দাদু আর নাতি হইহই করে ক্যারাম খেলে।

বৃদ্ধ নাতিকে বলেন, 'তোমার বাবার অনেক গুণ ছিল। মহাপুরুষ হতে হতে একটুর জন্যে পুরুষ হয়ে গেছে।' নাতি বলে, 'রেগে গেলে বাবাকে মহাপুরুষের মত দেখায়।' পরমেশ্বর হাসতে হাসতে বলেন, 'ইয়েস, ঠিক বলেছো। রাগ হল পুরুষের অলংকার, তোমার যা ইন্টেলিজেন্স আর অবজার্ভেশান, মরে যদি না যাও তুমি মহাপুরুষ হবে। দেখি রবিরেখাটা একবার।'

রোজ একবার করে নাতির রবিরেখা দেখেন। নাতি তখন দাদুর গলা জড়িয়ে ধরে আবদারের গলায় বলে, 'দাদি আর একটা, আর একটা দাদি।'

পরমেশ্বর তাঁর সামান্য পেনসানের টাকায় এই হনুমানের জন্যে ফল-পাকড়-কলা স্টোর করে রাখেন। যেমন রাখতেন মা-মরা বঙ্কিমের জন্যে আজ থেকে পঁয়ত্রিশ বছর আগে। নাতি এখন নিঃসঙ্গ বৃদ্ধের শয্যাসঙ্গী। নিদ্রাহীন বৃদ্ধ মাঝরাতে ঘরময় পায়চারি করেন। ল্যাম্পপোস্টের আলোর অন্ধকার দুলে ওঠে। স্ত্রীর ছবির সামনে মাঝে মাঝে দাঁড়িয়ে বলেন, 'আর পাঁচটা বছর আমাকে সময় দাও। আমার শেষ যুদ্ধটা করে যাই। তুমি জান, আমি সহজে কখনও হারি না। জাস্ট ফাইভ ইয়ারস, মাই জব উইল বি ডান। আমার বড্ড ভরসা এই ছেলেটা। তোমারও তো নাতি গো। বেঁচে থাকলে, কি বল?'

বুদবুদ

'আমি বিভূতি' মাইকের ডাণ্ডাটা বাঁহাতে চেপে ধরে ডানহাত হাওয়ায় ছুঁড়ে মঞ্চে দাঁড়ানো যুবকটি একটা অদ্ভুত অঙ্গভঙ্গী করল। গলায় একটা গাঢ় নীল রঙের রুমালের ফাঁস। এক মাথা ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুল। ডান হাতে স্টিলের কব্জিবালা। গলায় সোনালী পদক। বুক, পালোয়ানের মত টান টান। চোখে রঙীন চশমা। 'আপনাদের আমি কিস্যু দেবো না, কিস্যু করবোও না। ভোট দিতে হয় দেবেন, না দিলে গলায় ন্যাপকিন দিয়ে আদায় করবো। সে টেকনিক আমার জানা আছে।'

আমার পাশে বসেছিলেন এক বৃদ্ধ ভদ্রলোক। দুধের মত সাদা চুল। টকটকে ফর্সা রং, ভাঙা গাল। চোখে নিকেল-ফ্রেমের পুরু লেন্সের চশমা। কনুইয়ের খোঁচা মেরে বললেন, 'এই তো চাই। শাবাশ ভাই। বাপের বেটা।' খোঁচাটায় খুব বিরক্তি বোধ করলুম। থিয়েটার কি সিনেমায় এই ধরনের সহদর্শক ভীষণ জ্বালাতনের। মেয়েছেলে হলে মধুর লাগে। বুড়োর

খোঁচায় মধু নেই। মনে মনে একটা গালাগাল দিলুম—'ঘাটের মড়া।'

মঞ্চের যুবক তখন বলছে, 'আমি মশাই সাতচল্লিশের প্রোডাকট। আমার বাবা ছিলেন জেনুইন দেশসেবক। বিপ্লব-টিপ্লব করেছিলেন। দু-চারটে পটকা মটকা ছুঁড়েছিলেন খেঁকুরে সাহেবদের দিকে। ও'রা বলতেন বোম। আমি জানি পটকা। বোম হল আমাদের কালের মাল। মণ্ডা-মিঠাইয়ের মত আমরা ঘরে ঘরে তৈরি করি। আর মানুষ মারার উৎসব তো লেগেই আছে। কারুর একটু বেচাল দেখলেই ডজনখানেক টপকে দি। সব সময় একটা-দুটো মাল পকেটে মজুত। আমাদের কাছে জীব-জন্তুর দাম আছে, মানুষকে আমরা পশু বলেও মনে করি না। মানুষ হল ভূসি মাল, তরফের বিচালি গোছা গোছা আঁটি বাধা গরুর খাদ্য।'

বৃদ্ধ ভদ্রলোক খ্যাচ করে একটা খোঁচা মেরে বললেন, 'বাঃ বাঃ ছোকরা আচ্ছা বলছে।' একটু কাত মেরে বসলুম। বিভূতি বলেই চলেছে— 'গুরুদেব বলেছিলেন, মরতে মরতে মরণটাকে শেষ করে দে একেবারে। ওই একটা লাইনই মনে আছে গুরু। ছেলেবেলায় আমার বিপ্লবী বাবা এইসব খুব বলতেন নেচে নেচে। আমার বাবাকে দেখে সার বুঝেছি মশাই, টাকাটাই সব। মানি মানি মানি সুইটার দ্যান হনি। ভোগের জন্যে টাকা, যোগের জন্যে টাকা। টাকা থাকলে মান, সম্মান ইজ্জৎ, যশ, খ্যাতি, প্রতিপত্তি। টাকা না থাকলে আমার বাবা। বেশ ছিলেন বামুণ্ডুলে মানুষ। পার্টি ইস্তাহার আদর্শ নিয়ে বায়ুভুক, নিরালম্ব। হঠাৎ কি হল শাদি করে বসলেন কচি একটা মেয়েকে। আমার মা ছিলেন পয়লা নম্বর ইডিয়ট। আদর্শবান পুরুষ দেখে স্বয়ম্বরা হয়ে গেলেন। মা ছিলেন বাইশ সালের প্রোডাকট। চরকায় সুতো কাটতেন। লাল পাড় খদ্দরের শাড়ি পরতেন। স্বদেশী গান গাইতেন চোখ-মুখ লাল করে। আমার সেই স্বদেশী মা এখন মিড-ওয়াইফ! মানুষের বাচ্ছা বের করেন। আমার সঙ্গে কোনো সম্পর্ক নেই। আমার টাকায় মা আমার পেচ্ছাপ করে দেন বলেছেন। হে ধাত্রী পান্না! টাকার মহিমা তুমি কি বুঝবে বল? সে বোঝে আমার বৌ।'

বৃদ্ধ ফিসফিস করে বললেন, 'একটু অশ্লীল হয়ে যাচ্ছে।' আমি শুনেও শুনলুম না। আমার কান বিভূতির দিকে।

'বিয়ের ব্যাপারটা আমি আগেই সেরে নিয়েছি। আপনারা সকলেই জানেন লেট ম্যারেজ আরলি অরফ্যান, আরলি ম্যারেজ লেট অরফ্যান।

তেলকলওয়ালার এক ডবকা মেয়েকে বের করে এনেছি। শ্বশুরটা খুব বাগড়া দিচ্ছিল। ছোটো মত একটা ঝেড়ে দিলুম। কলু ব্যাটা এখন পঞ্চভূতে মিশে গেছে। বৌ আর তেলকল দুটোরই আমি এখন মালিক। তাই আমার এত তেলানি। মেয়েদের কাছে বাপের চে প্রেম বড়। প্রেমের চে পয়সা বড়। স্মাগল্ড সোনা দিয়ে আমার বৌকে মুড়ে দিয়েছি। বাপের শোক ভুলে গেছে। মেয়েরা মশাই মজার জিনিস। ফিনফিনে মেনিমুখো ছেলের চেয়ে মেয়েরা গুণ্ডাফুণ্ডাদেরই একটু বেশী পছন্দ করে। আমার অফিসিয়াল বৌ একটা। আনঅফিসিয়াল অনেক। বুঝতেই পারছেন মেয়েদের উপর এমনিই আমার হোল্ড আছে। আমিও বিপ্লবী তবে আমার ফাদারের ফ্যাশানে নয়। আমার পথ আলাদা পথ।

সবাই বলে বৃটিশের জেল বাবাকে বীর্যহীন করে দিয়েছিল। আমার জন্মটা বকলমে। কে জানে শালা কে কি বলে। জ্ঞান হয়ে তক দেখে এসেছি আমার জীবিকাহীন বিপ্লবী বাবা আর স্বদেশী মা সংসার চালাতে অষ্টপ্রহর চুলোচুলি করছেন। অন্নপূর্ণার আবদারে মহাদেবের কাছা কোঁচা খুলে যাবার যোগাড়। দেশ স্বাধীন করে বাবা আমার কখন মুদির দোকানের কর্মচারী কখন বিড়ি বাঁধার শ্রমিক; এরই মধ্যে দিয়ে পথ করে করে আমার যৌবন। ফাদারের হেডঅফিসে সব তালগোল পাকিয়ে গেল। গঙ্গার ধারে গিয়ে উবু হয়ে বসলেন। সারাদিনের কাজ ঢেউ গোনা, আর বিড়বিড় করে বকা। হাতে একটা গাছের ভাঙা ডাল নিয়ে ঘুরতেন। বাবা বলে ডাকলে থমকে দাঁড়িয়ে পড়তেন। ঘোলাটে চোখে তাকিয়ে বলতেন, 'মারবি? মার মার এই নে খুলে দিচ্ছি' বলে কাপড় খুলে দিতেন। বিশ্বাস করুন হৃদয়টা আমার পাথরের তবু সে দৃশ্য আজও আমি ভুলতে পারিনি, গঙ্গার পাড়ে গাছের ডাল হাতে আমার সর্বত্যাগী, উলঙ্গ বাবা। তাই আমি আজ ভোগী। আমার বাবার ত্যাগ, আমার মার ত্যাগ, আমি এক জীবনের ভোগ দিয়ে উসুল করে নোবো। আমি হারেম বানাবো, মদের ফোয়ারা ছোটাবো, পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ খাবার, আমার টেবিলে। কাউকে কিছু দোবো না। দাঁড়ান একটু জল খেয়েনি।' বিভূতি এক চুমুক জল খেল।

'বাবার জন্যে পেনসানের ব্যবস্থা করতে গেলুম। কর্তৃপক্ষ জানালেন তিনি যে বিপ্লবী ছিলেন সার্টিফিকেট চাই। কে সার্টিফিকেট দেবে? কোনো

প্রতিষ্ঠিত বিপ্লবী। শুনলেন কথাটা! বিপ্লবীদেরও ক্লাস আছে। প্রতিষ্ঠিত বিগ্রহ হওয়া চাই, নদীর ধারের নুড়িই সিংহাসনে শালগ্রাম। শুকতলা ক্ষয়ে গেল। একজনকে ধরলুম। সে মাল বললে পাগলের আবার সার্টিফিকেট। এক কলি গানও গাইলেন সেই গাইয়ে বিপ্লবী—যার পিতা-মাতা বদ্ধ পাগল ভাল কি হয় তাদের ছেলে। অবশ্য পেনসনের আর প্রয়োজন হল না। একদিন দেখা গেল গঙ্গার একটা পরিত্যক্ত ভাঙা ঘাটে বিপ্লবী বিপিনবাবু মুখ থুবড়ে পড়ে আছেন হাতে তখনো সেই গাছের ডালটা মুঠো করে ধরা পাশে মুখ চুন করে বসে আছে তাঁর শেষ জীবনের ফ্রেণ্ড একটা লেড়ি কুত্তা, যার সঙ্গে ঘণ্টার পর ঘণ্টা তাঁর দার্শনিক আলাপ চলত।'

পাশের বৃদ্ধ হঠাৎ ধড়মড় করে উঠে পাশের প্যাসেজে গিয়ে দাঁড়ালেন। প্রথমটা বুঝতে পারিনি বৃদ্ধ কি করতে চাইছেন? মঞ্চের দিকে মুখ করে যতদূর সম্ভব চিৎকার করে বললেন, 'ও বাবা বিভূতি। তোর বাবা এখনো মরেনি রে। এই দেখ বেঁচে আছি। এই দেখ পায়ে আমার ছেঁড়া কেডস কড়ে আঙুলটা বেরিয়ে আছে।' বৃদ্ধ ডানপাটা তুলে দেখাতে গিয়ে ধড়াস করে পেছন দিকে পড়ে গেলেন। দর্শকের মধ্যে থেকে কে একজন বলে উঠলেন, বুড়ো মরে রে। প্যাসেজের পাশে যাঁরা বসেছিলেন তাঁদের মধ্যে দু-চারজন দৌড়ে এলেন। বিভূতি মাইক ছেড়ে মঞ্চের সামনে এসে বললে, 'কে আপনি?'

বৃদ্ধকে ততক্ষণে ধরাধরি করে দাঁড় করানো হয়েছে। যন্ত্রণার গলায় বললেন 'আমি তোর বাবারে ।'

বিভূতি বললে, 'আপনি তা হলে আমার গডফাদার। সুরাট কংগ্রেসে সুরেন বাড়ুজ্যের দিকে জুতো ছুঁড়েছিলেন?'

'না বাবা আমরা ছিলুম নরমপন্থী। টোটাল ফ্রীডম চাইনি বাবা। হোম-রুলেই সন্তুষ্ট ছিলাম। জেল খেটেছি অনেক বছর। ক্ষমতা দখল করতে পারিনি। নেপোয় মেরে দিয়েছে দই। এখন এই ডানপায়ে একটা ছোটো মত একজিমা সেইটাই গত তিরিশ বছর ধরে চুলকোচ্ছি। ডাক্তার দেখিয়েছি বাবা, বলছে সারালে হাঁপানি হবে। কি করি বলতো? একজিমা ভাল না হাঁপানি ভাল। তুই এতসব জানিস বিভূতি এইটা আমায় বলে দে না?'

'ভোট দেবেন আগে বলুন তাহলে বলবো।'

'লিস্টে নাম থাকলে নিশ্চয়ই দোবো রে; তুই যে আমার ছেলে।'

'তাহলে একজিমাটাই থাক, উইপিং না ড্রাই ?'

'ড্রাই বাবা খুব চুলকোয় খোসা ওঠে শীতে বাড়ে।'

'যাক তবু ভাল। খুব বেশী ছড়াবে না হাঁপানিতে বড় শ্বাসকষ্ট। মার আছে দেখেছি তো। হাঁপানিতে আবার পরমায়ু বেড়ে যাবে। আর ক' বছরই বা চুলকোবেন ? ঘণ্টা তো শুনতেই পাচ্ছেন। এবার তো যেতে হবে।'

'তা হবে তা হবে!' বৃদ্ধকে আবার পাশে বসিয়ে দিয়ে গেল। আমি ছোঁয়াচ বাঁচিয়ে আর একটু সরে বসলুম। বিপ্লবী মাথায় থাকুন। এক-জিমা চুলকোনো হাতে গায়ে খোঁচা মারলে স্পষ্ট প্রতিবাদ করবো। ইয়ারকি নাকি? বিপ্লব এক জিনিস একজিমা আর এক জিনিস। বিপ্লব তেমন ছোঁয়াচে নয়। বিপ্লব ধরলে পার পাওয়া যায়। প্রতিবিপ্লব দিয়ে বিপ্লবকে ঠেকিয়ে রাখা যায়। মিলিটারী দিয়ে বিপ্লব চুরমার করা যায়। বিপ্লবীদের মেরুদণ্ড ভেঙে দেওয়া যায়। কিন্তু একজিমা একবার ধরলে রক্ষে নেই। সারা জীবন চুলকে যাও ঘেঁসোর ঘেঁসোর করে।

বিভূতি আবার মাইকের সামনে চলে এসেছে। বাঁ হাত দিয়ে মাথার ঝাঁকড়া চুল ঠিক করতে করতে আবার সে শুরু করল, 'আমি মশাই নেতা ফেতা নই আমি একটা চামচে।' বৃদ্ধ আমার দিকে সরে এসে জিজ্ঞেস করলেন, 'চামচে কি বাবা?'

আমি বললুম, 'ইমপসিবল, আপনার পাশে বসে কারুর বাবার সাধ্য নেই থিয়েটার দেখে।'

'আমি আর বিরক্ত করব না, শুধু চামচেটা বলে দাও বাধা।'

'চামচে হল চাটুকার ফেউ।' বৃদ্ধ আবার ঠিক হয়ে বসলেন। ইতিমধ্যে বিভূতি অনেক কথা বলেছে শোনা হয়নি। বিভূতির দিকে যখন কান দিলুম তখন সে বলছে, 'পৃথিবীর সমস্ত প্রাণীর দুটো জাত—খাদ্য আর খাদক, বাঘ আর ছাগল। নীতি একটাই, কিল অর বি কিলড, মারো আর না হলে মর। আমি যাঁর চামচে, পলিটিকসের তিনি প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানী খুলেছেন। রাজনীতি এখন মুদির দোকানে বিকোয়, কেউ নগদে কেনে কেউ ধারে। বেশীর ভাগই ধারের খদ্দের। নগদে কেনার পয়সা মধ্যবিত্তের নেই। আমরা গ্র্যান্ড পলিটিক্যাল গ্রোসারস শপের সেলসম্যান। আমরা যা বিক্রি করি সবই এডালটারেটেড, ভেজালে ভর্তি। চিনতে বালি, ঘিয়ে পশুর চর্বি, এসট্রাকট বের করা মশলা। ভেজালটাই এ যুগের প্রকৃষ্ট

খাদ্য। খাঁটি আমাদের পেটে সহ্য হবে না। আপনারা সব বাঁচিতে চায়, মশাইয়ের সুবোধ বালক গোপাল যাহা পায় তাহাই খায়, কদাচ অ উঠলেন না। অবাধ্য হইলেই আমাদের হাতে দাওয়াই আছে তাহারই কয়েক প্রয়োগ করিলেই বুড়ো গোপালের দল বাধ্য ; বশীভূত। এটা কি ল্যাটিন আমেরিকা, ভিয়েতনাম না আফ্রিকা, লিবারেশন লিবারেশন করে দেশ জুড়ে আদিখ্যেতা চালাবেন! ও সব ইয়ারকির কোনো মানে হয়। একে এই গরম, তায় লিভার, ওদিকে শালা হার্টের ছেঁদা বুজে আসছে, রক্ত ঘন হয়ে জমাট বেঁধে যাচ্ছে, স্নায়বিক দুর্বলতা, লো প্রেসার, দাঁড়ালেই মাথা ঘুরে যাচ্ছে, নুন আনতে পান্তা ফুরোচ্ছে, পলিউশান, সাফোকেশান ইনফ্লেশান, ডিকটেশান, এবরশান, হাইপারটেনশান, কনজেশান, লিকুইডেশান, ম্যানিপুলেশান, মেনস্টুরেশান কমপ্লিকেশান, স্টেরিলাইজেশান, সিফিল ইজেশন, ইনফেবশান, অ্যাফেকশান, অ্যাডিশান সাবস্ট্র্যাকশান, ডিভিশান, মালটিপ্লিকেশান, একেবরে শানিয়ে ছেড়ে নিচ্ছে। কে চায় মশাই রুক্কু ঝামেলা ? ওসব পলিটিকসের ঝামেলায় ভদ্দর লোকে যায়! হয় বড়লোক না হয় লোফার ব্যবসাদার না হয় চোর এদের হাতেই ব্যাপারটা থাক না। আপনারা হঠাৎ মাথা গরম করে এমনিই গরম মাথাকে আরো কেন গরম করবেন? যুবকদের জন্যে হিন্দি ছবি আছে, রাস্তায় পেট পিঠ বের করা-জুলিয়েটরা আছে, চাকরির ধান্দা আছে ডিগ্রি ডিপ্লোমার কসরত আছে, ব্যস্ত থাকার মত আরো কত কি আছে। কবিতা আছে, সাহিত্য আছে, যাত্রা আছে, সৌখীন থিয়েটার আছে, বারোয়ারী আছে, কালচরাল ফ্যাংশান আছে, চুল আছে, দাড়ি আছে, অফসেটে ছাপা সিনেমার কাগজ আছে, প্রেম আছে, বিরহ আছে, রেজিস্ট্রী ম্যারেজ আছে, ড্রাগস আছে, ধেনো আছে, পরের পয়সায় বিলাইতি আছে, মড়া পোড়ানো আছে, পরচর্চা আছে, বাঁশ আছে, আরো কত কি আছে। কতো কি ভাল কাজ আছে। ধেড়েদের জন্যে চাকরি আছে বাকরি আছে, মাগ আছে, বখে যাওয়া ছেলে আছে, প্রেম-লোটা মেয়ে আছে, মেয়ের পেছনের ফেউ তাড়ানো আছে, জামাই ধরার পনের টাকা রোজগার আছে, ঘুষ আছে, অফিসে পরস্পরে পেছনে কাঠি দেওয়া আছে, লেডি স্টেনো টাইপিস্ট, টেলিফোন অপারেটর আছে, রেসের মাঠ আছে, পরস্ত্রী আছে, জন্ম নিয়ন্ত্রণের বটিকা আছে, বাসে-ট্রামে লেডিজ ছিটের কাছে দাঁড়াবার ধান্দা আছে, দক্ষিণেশ্বর, তারকেশ্বর বক্রেশ্বর, রামেশ্বর আছে, ধার আছে, পাওনাদার আছে, ধান্দা আছে, ডাণ্ডা

‘তাহলে এক’
[illegible]নে বাড়বার ঝাণ্ডা আছে, ছেলের চাকরির জন্যে চাকরিদাতাদের
‘ড্রাই [illegible]
[illegible] তেল দেওয়া আছে, গিন্নিকে পেটানো আছে, পাশের ফ্ল্যাটের কাপতেনের সঙ্গে সাপ্তাহিক ঝগড়া আছে, তাস আছে, জুয়া আছে, শালা আছে, শালী আছে। এতসব থাকতে আপনারা মাইরি খামোখা কেন জেনুইন পলিটিকস করবেন? রাজনীতি হল ত্যাগীদের জিনিস। আপনাদের কি ত্যাগের বয়েস হয়েছে গুরু? আমাদের ধাতে কি ত্যাগ সইবে মাইরি! আপনারা হলেন বরেণ্য ভোটার, আপনারা হলেন ডোনার, পোচার সাফারার, চামার, ধামার ব্লাফার। আপনারা শুধু ভোটটি বাকসে ফেলে দেবেন। আপনারা সব কাস্টার। বছরে বছরে একটি করে সন্তান বৌয়ের পেটে কাস্ট করবেন। একটি করে ভোটার দেশকে উপহার দেবেন। ভোট হল আপনাদের মেয়ে। পাত্রস্থ করে দিন তারপর বরাতে যা থাকে হবে। আর বরাত হল রেসের ঘোড়া। আমীরও করতে পারে ফকিরও করতে পারে। তবে জেনে রাখুন, ভোট দিয়ে কোনো শালা কোনো কালে বড়লোক হতে পারেনি। চুরি ছাড়া বড়লোক হবার অন্য কোনো রাস্তা নেই। আমি চ্যালেঞ্জ করে বলছি। ভাগ্য ফেরাতে হলে লাইন দিতে হবে। তদবির লাগাতে হতে হবে। ভেবে দেখুন ষাট কোটি মানুষ যদি পেছনে পেছনে লাইন দেয় কি অবস্থা হবে। আদ্দেক শালা ভারত মহাসাগরের জলে গিয়ে পড়বে। অতএব একজন দুজন ভাগ্য ফেরাবে অন্যে তাকে ঈর্ষা করবে। ঈর্ষা করার মত ল্যেকও তো চাই। তা না হলে ঈশ্বরের দেওয়া ঈর্ষা বস্তুটা যাবে কোথায়? ঈর্ষায় যদি জ্বলে পুড়ে শুদ্ধ না হলেন তাহলে মরণকালে যে নরকবাস হবে মশাই।’

বৃদ্ধ হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে চিৎকার করে বললেন, ‘আমি পেচ্ছাপ করবো বিভূতি।’

‘কি করবেন?’

‘পেচ্ছাপ বাবা।’

‘কোথায়? আমার মুখে?’

‘ছি ছি বাবা। তোমার মুখে কেন, পেচ্ছাপখানায়।’

‘করে আসুন। কে আটকে রেখেছে আপনাকে?’

‘তুমি রেখেছো মানিক আমার। তুমি একটু থামো। ফিরে এলে শুরু কোরো।’

‘ঠিক আছে, ততক্ষণ দেশাত্মবোধক গান হোক।’

‘আমি যে দেশাত্মবোধক গান ভালবাসি, নিজে যে এক সময় এমনি করে হাজ-

মুঠো করে গাইতুম, স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায়রে, কে বাঁচিতে চায়, কোন শুকরের বাচ্ছা পরাধীনতা চায়রে চায় ?' বৃদ্ধ সুর করে গেয়ে উঠলেন। বিভূতি মঞ্চের সামনের দিকে সরে এসে বললে।

'ধ্যুৎ মাইরি ওটা গান নয় কবিতা। সব গুলিয়ে ফেলেছেন দাদু। দেশাত্ম বোধক গান হল এইটা।

বিভূতি পাছা দুলিয়ে দুলিয়ে টুসকি দিতে দিতে গেয়ে উঠলো,

হাম তুম এক কামরে মে বন্ধ হায়।
আর চাবি খো যায়, হাম তুম

কোথা থেকে ম্যারাকাস বেজে উঠল, ঝ্যাক ঝ্যাক ঝ্যাক। বঙ্গতে বোল ফুটলো টাকা টাকা টাকাডুম, টাকা টাকা ট্রাকা ডুমট্রাকা, টাকা ডুম। বিভূতি ঘুরে ঘুরে নাচছে।

হাম তুম এক কামরেমে বন্ধ হায়

বৃদ্ধ বললেন, 'পাগল ছেলে, উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে, কি একটা গানকে স্বদেশী গান বলে চালিয়ে দিলে। জ্ঞানগম্মির মাথা খেয়ে বসে আছে। তুমি আমাকে একটু পেচ্ছাপখানায় নিয়ে যাবে ?'

সে কি রে বাবা, এতো আচ্ছা জ্বালা হল। না মশাই পারবো না, আমার পক্ষে সম্ভব হবে না।'

বৃদ্ধ গলা ছেড়ে চিৎকার করলেন, 'বিভূতি বিভূতি।' বিভূতি যেন আমাদের গার্জেন। বিভূতির গান থেমে গেল। চিৎকার করে বলল, 'কি হল আবার ?'

'এই ইয়ংম্যানটি আমাকে পেচ্ছাপ করাতে নিয়ে যাচ্ছে না।'

'সে কি! যুবকদের কাজই হল বুড়োদের পেচ্ছাপ করানো। যাও খোকা, ভ্রষ্টাচারের দায়ে পড় না।'

বৃদ্ধ আমার দিকে ঝুঁকে পড়ে বললেন, 'শুনেছো বিভূতির আদেশ।'

'আপনি আমার মুখের কাছে মুখ এনে কথা বলবেন না প্লিজ। আপনার মুখে দুর্গন্ধ।

বৃদ্ধ আবার বিভূতিকে কমপ্লেন করলেন, 'ও বিভূতি, এ বলে আমার মুখে দুর্গন্ধ।

'দুর্গন্ধ ? আমাদের সকলের মুখেই দুর্গন্ধ। সব শালারই লিভার পচে মুখ গহবরে টাট্টিখানা বানিয়েছে। ও শালার আছে। আমারও আছে। একে

বলে হেলিওটোসিস। দ্যাটস এ ন্যাশনাল ডিজিজ। আমি তো ওই জন্যে সময় মুখে মাল ঢেলে বসে থাকি। মদের গন্ধে অ্যারিসট্রোক্র্যাসি, মুখের গ দূরে থাকি। দাদু আপনিও একটু মালটাল চালান, নইলে প্রেম হবে নাতনীরা বলবে তফাত যাও।'

'তাহলে আমি চেপে রাখি।'

'তাই রাখুন, কিংবা ওখানেই করুন না, ক ফোঁটাই বা হবে, আপনি তো চিনি গ্রস্ত, সুগার আছে না? থাকতেই হবে। সব ভেতো বাঙালীরই চল্লিশের পর চিনি হয়।'

'এখানেই করবো বাবা?'

'কেন করবেন না? আমাদের ন্যাশনাল হ্যাবিটই তো, খাই যেখানে হাগি সেখানে। লাগিয়ে দিন। প্রকৃতির আহবান উপেক্ষা করবেন না। ভয় নেই পাঁচ আইন কাগজে আছে, ভিতরেও নেই বাইরেও নেই।'

বৃদ্ধ আসনে বসে পড়লেন। বসে পড়ে আপন মনে একটু হাসলেন। স্বগ-তোক্তি কানে এল, 'সহযোগিতা! পাশাপাশি বসে সহযোগিতা হচ্ছে না, সহযোগিতা হবে সারা দেশ জুড়ে। পাশাপাশি বসে ঘেন্নায় মরে যাচ্ছে মুখে বলছে, সবার ওপরে মানুষ সত্য, সমালোচনা করছে সাদা চামড়ার দল কালোদের কেন ঘেন্না করে। অ্যাপার থিডের বিরুদ্ধে লম্পঝম্ফ!'

বৃদ্ধকে এক ধমক লাগালুম, 'চুপ করা সম্ভব না হলে বেরিয়ে যান দয়া করে।'

ধমক খেয়ে বৃদ্ধ সংযত হয়ে বসলেন। যেন কত শান্তশিষ্ট মানুষ।

বিভূতি আবার মাইকের সামনে ফিরে গেছে। 'সমস্ত মানুষই অবস্থার দাস। দাসত্ব করার জন্যেই মনুষ্যত্ব! দাস কখনও প্রভু হতে পারে না। আপনারা মুক্তির স্বপ্ন দেখবেন কিন্তু মুক্ত করে দিলেই হাহাকার করে উঠবেন। ছোট থেকে আরও ছোট হওয়াতেই মানুষের আনন্দ। সবচেয়ে সুখী মানুষ সবচেয়ে বিড়ম্বিত মানুষ। জীবন একটা চটচটে আঠা, সেই আঠার সঙ্গে জুড়ে আছে হাজার সমস্যার পাতা। ছাড়াবার জন্যে যতই গড়াগড়ি দেবেন ততই আরো পাতা জড়িয়ে গিয়ে সেই বাঘের মত অবস্থা হবে। বেঁচে থাকার সবচেয়ে বড় কৌশল হল ভুলে থাকা, জীবনের ভারে নুয়ে পড়ে ক্রীতদাসের মত মৃত্যুর দরজার দিকে হেঁটে যাওয়া। অথচ মৃত্যুকেই

মানুষের সবচেয়ে বড় ভয়। সেই মৃত্যুর ভয়ে আপনারা মৃত্যুকেই ভোট দেবেন। দিলেও মৃত্যু না দিলেও মৃত্যু। হাহা পরিস্থিতি এখন আমাদের হাতের মুঠোয়। আমরা যেমন প্রগতি তেমনি অধোগতি, আমরা প্রাচুর্য, আমরা দুর্ভিক্ষ, আমরা ঝরা, আমরা ক্ষরা, আমরা উৎপাদন, অনুৎপাদন, আমরা মুক্তি, আমরা শৃঙ্খল।'

'তুমি একটি গাড়োল,' উইংসের পাশ থেকে আর একটি লম্বা-চওড়া ছেলে বেরিয়ে এল, 'এইভাবে মূর্খের মত কথা বললে কেউ তোকে ভোট দেবে শালা। ভোট হল ভদ্দরলোকের জিনিস। তোর ওই পেটোপটকার চেয়ে অনেক শক্তিশালী। গায়ের জোরে ভোট হয় না গুরু, প্রেম হয় না গুরু ওসব স্নেহ দিয়ে ভুলিয়ে আদায় করতে হয়। আশার ছলনা দিয়ে পরে নিরাশ করতে হয়। বাস করবে ডেমোক্রেসীতে কথা বলবে ডিকটেটারের ভঙ্গীতে, এটা কি তোমার মামার বাড়ি রাসকেল? ভোটের বক্তৃতা হবে এই রকম।' দ্বিতীয় ছেলেটি বিভূতিকে সরিয়ে দিয়ে মাইক নিল।

'বরণ্যে ভোটদাতাবা, আপনারা দাতা আমরা গ্রহীতা। গ্রতীতার কিছু বিনয় থাকা প্রয়োজন। বিভূতির হঠাৎ কি হয়েছে জানি না। সে যা বলতে চেয়েছিল, বলতে পারেনি। মানুষ সাধারণত পড়ানো পাখি। ব্যবহারিক জীবনে যে কোন কাজ আদায়ের জন্যে মন কথা বলে না কথা বলে তার উদ্দেশ্য। বিভূতির মন হঠাৎ ফসকে বেরিয়ে এসেছে! সে বলতে এসেছিল অন্য কথা! বিভূতি আপনাদের ছোট করেছে, আপনাদের ভূমিকাকে খাটো করেছে। মানুষ যে অমৃতের সন্তান তা ভুলে গেছে। আত্মার শক্তিতে মানুষ যে তুচ্ছতার ঊর্ধ্বে উঠতে পারে সেকথা স্বীকার করেনি। ভারতের অধ্যাত্মবাদ, পশ্চিমের রাজনৈতিক বিশ্বাস, জীবন স্বাধীনতা কোনটাই সে মানতে চায়নি। অনেকটা জারের মত কিংবা কাইজারের মত কিংবা কসাইয়ের মত কথা বলেছে। ব্যাটা বাঙাল। বুদ্ধিশুদ্ধি নেই। উদো বঙ্কা। বিভূতিকে ভোট দেওয়া মানে, বিভূতির পার্টিকে ভোট দেওয়া মানে একটা দলের শাসন প্রতিষ্ঠিত করা। যে দলে অনেক মাথাওলা উদার লোক আছে যাদের নীতিও উদার। সব দলেই তাই থাকে। বিভূতি হল দলের হাত, মাথা হলুম আমরা। আমরা যা বলব বিভূতি তাই করতে বাধ্য। বিভূতির নিজের কোন স্বাধীনতা নেই। স্বাধীন হলেই বিভূতির মৃত্যু হবে। বিভূতিকে আমরাই ক্রিয়েট করেছি। সে একটি বুদবুদ। বেচাল দেখলেই একটি আলপিনের খোঁচা, ব্যাস, বিভূতিবাবু ফুট।

আপনাদের চোখের সামনেই বিভূতির মত কত মাল এল কত মাল গেল। আপনারা বেশ ভালই জানেন, নেতা মে কাম নেতা মে গো লাইফ উইল কনটিনিউ ফর এভার। এন্ড হোয়াট ইজ লাইফ? জীবন কি? ও শালা বলেনি? বলার মুরোদ নেই তাই বলেনি। শেক্সপিয়ার বলেছেন, লাইফ ইজ এ ওয়েকিং ড্রিম। গীতা বলেছেন, নৈনংছিন্দতি শস্ত্রানি, নৈনংদহতি পাবক। তার মানে কোন শালা কোন শালার কিছু করতে পারবে না। শালায় শালায় শালাশালী হলেও সব শালা অমর। বিভূতির পেটো, বিভূতির ছুরি-ছোরা আপনাদের কি করতে পারে? নাথিং, ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে। আপনাদের কত বড় গর্ব, মন্বন্তরে মরিনি আমরা মারি নিয়ে ঘর করি। তবে আপনারা ভিখিরি হতে যাবেন কেন? রাজার মত ভোট দেবেন, রাজার মত সংসার করবেন। তার বদলে হ্যাংলার মত চাইবেন কেন। কবি কি বলেছেন, যা চাবি তা বসে পাবি খোঁজ নিজ অন্তঃপুরে। চাইবেন নিজের কাছে, ধন দাও, মান দাও, চাকরি দাও বাকরি দাও, জমি দাও, জমা দাও, জিনিসের দাম কমিয়ে দাও। নিজেকে জাগিয়ে তুলুন, বলুন জাগো বাঙালী। সেই ছেলেবেলা থেকে শুনে আসছেন—সেল্‌ফ হেল্‌প ইজ দি বেস্ট হেল্‌প। তবু প্রথামত দেশের জন্যে দশের জন্যে আমাদের একটা কর্মসূচী আছে যেমন, সব ছেলে মেয়েকে আমরা ভাল ভাল চাকরি দেবো, না থাকলেও দেবো, সব গরীবকে বড়লোক করে দেবো, জিনিসপত্রের দাম কমিয়ে দেবো, আই-বুড়ো মেয়েদের ব্যাংক তৈরি করে ভাল ভাল পাত্রের সঙ্গে বিনাপণে বিয়ের ব্যবস্থা করে দেবো, জন্মবর্ধন কর্মসূচী চালু করবো, রাশি রাশি শিশুকে পোলট্রির কায়দায় মানুষ করে ক্ষেতে কিংবা নদী বুজিয়ে নতুন চাষের জমি বের করে খামারে ছেড়ে দেবো, জমি না থাকলে সাগর বোজাব। আমরা বিশ্বাস করি, মানুষ জন্মনিয়ন্ত্রণ না করলে প্রকৃতি নিজেই মহামারী দিয়ে, দুর্ভিক্ষ দিয়ে জন সংখ্যায় সাম্য এনে দেবে। প্রকৃতিই যা পারে আমরা শুধু শুধু তা করে অপ্রিয় হতে যাই কেন। আমরা চোরকে চুরি করতে দেবো, গৃহস্থকে সজাগ হতে দেবো, দুর্নীতি রোধের জন্যে কমিটি করে দেবো, সাধুকে সৎ হতে দেবো, অসতীকে সতীসাধ্বী করার চেষ্টা করব না, ভেজাল জিনিসের দোকান, আসল জিনিসের দোকান দুটোই খোলা রাখবো, গুণ্ডা দমন করবো না, সাধারণ মানুষকে পাহারা দেবো, কারুর জীবিকা কেড়ে নেবো না। আমাদের সব নীতিই পজেটিভ, ইতি বাচক। সাদা বাজার, কালো বাজার, স্বর্গ নরক পাশাপাশি থাকবে। বস্তি থাকবে প্রাসাদ থাকবে। গরীব থাকবে বড়লোকও থাকবে। সোস্যালিজম,

ক্যাপিটালিজম, মার্কসিজম সমস্ত ইজম পুরোদমে চলবে। আমরা হব ভক্ত বাঞ্ছা কল্পতরু। জীবন যে রকম আমরাও সেই রকম হব। তত্ত্বদর্শীরা বলেছেন, স্বর্গও এখানে, নরকও এখানে। অতএব আমাদের কর্মসূচীতে স্বর্গ আর নরক দুটোই গুলজার হবে। আমরা দেবদূত আবার যমদূত।' 678 58

বৃদ্ধ আবার উঠে দাঁড়ালেন, 'হ্যাঁ বাবা, তোমার নামটা জানালে না, তোমাকে বিভূতির মাথা বলেই ডাকি, বুড়োদের জন্যে তোমাদের কোন কর্মসূচী আছে ?'

'আছে বৈকি দাদু। যৌবনের একসটেনশানই হল বার্ধক্য। আপনাদের কি ফেলা যায় ? আপনারা হলেন সমাজের ফরওয়ার্ড'ব্যাকওয়ার্ড ফোর্স। আপনারা যুবশক্তির লাগাম। আপনারা ক্রীতদাসের জন্ম দিয়েছিলেন বলেই প্রভুত্ব আছে, চাষী আছে, শ্রমিক আছে, সেরেস্তার মাসমাইনের কর্মচারী আছে, বয় আছে, বেয়ারা আছে, বেশ্যা আছে, বধূ আছে, আমাদের দলের হাত আছে, পা আছে, দালাল আছে, ফোড়ে আছে, হাফ গেরস্ত আছে, ফুটপাথের মানুষ আছে, পণ্ডিত আছে, মূর্খ আছে, আমরা আছি, তাহারা আছে, বিশেষ্য আছে, সর্বনাম আছে, কর্তা আছে, করণ আছে। আপনাদের জন্যে পার্কে পার্কে আরো বেঞ্চি বাড়াব, তাসের দাম আরো সস্তা করে দেবো মেয়েদের ব্লাউজের মাপ আরো খাটো করে দেবো, বিনা পয়সায় পর্ণগ্রাফি বিতরণ করবো।'

বাঃ বাবা বাঃ, বেঁচে থাকো মানিক' বৃদ্ধ ধপাস করে বসে পড়লেন।

বিভূতির মাথা আবার শুরু করলেন, আমরা সব ব্যাপারেই নিষ্ক্রিয় থাকব, তালে তাল দিয়ে যাব ! আমরা জানি আমাদের ভোটদাতারা চেয়ে না পেলে মানিয়ে নিতে জানেন। কেউ একশো টাকার সংসার চালায়, কেউ হাজার টাকায়। চলছে সকলেরই, সকলেরই অভাব। আপনাদের যা কিছু ক্ষোভ সব শোবার ঘরে বৌয়ের ওপর। বেশি ক্ষুব্ধ হলে, রাস্তার মিছিলে চিৎকার, চলবে না, চলবে না। আপনাদের চাল চলন আমাদের স্টাডি করা আছে। আপনাদের মত মানুষ সত্যি হয় না। আপনাদের প্রতিনিধিত্ব করার মত সোজা কাজ কিছুই নেই। চিড়িয়া-খানার ম্যানেজারকেও এর চেয়ে বেশী বেগ পেতে হয়। আমাদের সংঘর্ষ তো আপনাদের সঙ্গে নয়। আপনারা সব রবারের মানুষ চাপলেই ছোট হয় জান। দিকে খুশি দোমড়ানো যায়। আমাদের যত ক্ল্যাশ নিজেদের মধ্যে। ল্যাং মারামারি, কামড়া-কামড়ি। সেই জন্যে আমরা বিশেষ ইনসিওরেন্স প্রথা চালু করবো। আমাদের স্বার্থ দেখার জন্যে বোর্ড অফ ট্রাস্ট থাকবে। আমরা এবার থেকে আটঘাট বেঁধে নামব।'

বেশ কিছুক্ষণ আমার একঘেয়ে লাগছিল। নাট্যকার কি যে বলতে চাইছেন, কি যে করতে চাইছেন, এর পর কি করবেন, আমার মাথায় আসছে না। অনেক আশা নিয়ে এসেছিলুম ভাল একটা নাটক দেখতে, তা আর হল না। আশা সব সময় পূর্ণ হয় না। নির্বাচন সব সময় মনের মত হয় না, কি প্রতিনিধি নির্বাচন, কি নাটক নির্বাচন, এই সত্যটুকুই বোধ হয় আজকের নিট লাভ। পাঁচ টাকার জ্ঞান পকেটে নিয়ে উঠে দাঁড়ালাম। এই একই জ্ঞান অনেকে হয়তো দশ টাকা কিংবা দু টাকার সংগ্রহ করলেন। একই জ্ঞান বিভিন্ন মূল্যে সংগ্রহ করা যায়। জীবনের এইটাই বোধহয় পরম সত্য। মঞ্চে তখন দুই চরিত্রে কথা কাটাকাটি চলছে, বিভূতি বলছে, কোদাল কে কোদাল বলাই ভাল, ভাঁওতা দিয়ে ক্ষমতা দখলের অর্থ বঞ্চিত মানুষকে বঞ্চনা করা। দ্বিতীয় চরিত্র বলছে, মানুষ জেনে শুনেই বঞ্চিত হতে চায়। জীবনের কাছে মানুষের প্রত্যাশা অসীম অথচ পাবার জন্যে যে মূল্য দেওয়া উচিত মানুষ কোন কালেই তা দিতে প্রস্তুত নয়, ফাঁকতালেই মানুষ সব কিছু পেতে চায়। মানুষের স্বভাবেই রয়েছে ফাটকাবাজী, ধাপ্পাবাজী, শঠতা, প্রবঞ্চনা, ছলনা অতএব সেই চেনা রাস্তাতেই মানুষ ভাঁড়িয়ে মানুষকে কাজ আদায় করতে হবে। একসার মানুষ ঠেলে অন্ধকার প্যাসেজ বেয়ে বাইরে বেরিয়ে এসে যেন হাপ ছেড়ে বাঁচলুম। মুক্ত আকাশ মাথার ওপর, শীতল বাতাস। মানুষ কত অল্পে খুশি! একটা পরিবেশে থেকে আর একটা পরিবেশে এলেই মন অন্যরকম হয়ে যায়। ভাবছি এবার কোন দিকে যাব। পেছন থেকে কাঁধের ওপর মৃদু হাতের স্পর্শ। চমকে উঠেছিলাম। তাকিয়ে দেখলুম সেই বৃদ্ধ। মুখে মৃদু হাসি। একটু আগের দেখা নেই অসহায় ভাব, সেই বোকা নেকামি নেই। সম্পূর্ণ অন্য ব্যক্তিত্ব। ঋজু, সরল, উজ্জ্বল এক মানুষ। প্রশ্ন করলেন, 'উঠে এলে কেন? একজিমার ভয়ে? মুখের গন্ধের ভয়ে? সত্যি কিন্তু আমার একজিমা নেই, মুখে হয়ত গন্ধ থাকতে পারে, আগে কেউ বলে নি, তুমি আজ ধরিয়ে দিলে, সেল্‌ফ কন্সাস করিয়ে দিলে, এবার থেকে পকেটে বড় এলাচ রাখবো।'

আমি হেসে ফেললুম। হলের বাইরে বৃদ্ধকে বেশ ভালই লাগছিল। বললুম, 'ভাল লাগছিল না বলে উঠে এলুম আপনার জন্যে উঠে আসি নি।'

'একটু সময় হবে, তোমার কিছু সময় আমাকে দেবে?'

একটু বিব্রতই হলুম। তবু বললুম, 'কেন দেবো না?'

'তা হলে আমার সঙ্গে একটু এসো।'

বৃদ্ধকে অনুসরণ করে সোজা চলে এলুম গ্রীনরুমে। বড় বড় আয়নার মাথায় চড়া পাওয়ারের আলো ঠিকরোচ্ছে। ঘর ভর্তি নারী আর পুরুষ চরিত্র। বিভিন্ন মেক আপে সেজে বসে আছেন। এক সুন্দরী মহিলা, তখনো নিজের হাতে মেক আপ নিয়ে চলেছেন। টানা টানা ভুরু আরো টানা করছেন। কাজলের রেখায় চোখের প্রেম আরো চটুল। সারা ঘরে যেন আর এক জগৎ। দেহের গন্ধ, প্রসাধনের গন্ধ, পুরুষালী গন্ধ; মেয়েলী গন্ধ। বৃদ্ধকে দেখে সকলেই সসম্ভ্রমে উঠে দাঁড়ালেন, 'চলে এলেন আপনি? আপনার আর নেই।' বৃদ্ধকে বসার আসন ছেড়ে দিলেন। বসতে বসতে বললেন, 'পলাতককে ধরে এনেছি। আমার নাটকের শেষ না দেখে চলে যাচ্ছে। জানতে চাই কেন? আমি তো অডিটোরিয়ামে বসে মাঝে মাঝে একটু ভাঁড়ামি করি, না করলেও নাটক আটকাবে না। বস, তুমি বস।' মেক আপ নিচ্ছিলেন যে মহিলা তাঁর পাশের খালি চেয়ারে পেছন ফিরে বসলুম। টাটকা যৌবনের ঝাঁজ ও গন্ধ দুটোই পেলুম। বৃদ্ধ বললেন, 'চা দাও।'

'তুমি কি জীবনবিমুখ দর্শক? তুমি কি শুধুই প্রেম, মৃত্যু, বিবাহ, বিচ্ছেদ, সংঘাত, পরিণতি চাও? তুমি কি চাও সত্যম, শিবম, সুন্দরম?'

কি চাই তাতো জানি না। নাটক দেখি কিন্তু নাট্যকারের প্রশ্নের জবাব খুঁজে পাই না। জীবন দেখি, জীবনদেবতার সন্ধান পাই না! কি চাই! আমি কি চাই! 'বোধহয় ভালো লাগাটাই চাই।'

'গুড, ভেরি গুড! কিন্তু জীবনের সব কিছুই কি তোমার ভালো লাগে?'

'না।'

'তবে জীবন থেকে সরে যাও না কেন?'

'জীবন সরিয়ে দেয় না বলেই, ভালো হোক খারাপ হোক জীবনকেই আঁকড়ে থাকি।'

'ভুল ভুল। আমরা ভালো লাগার মুহূর্তটুকুতেই বেঁচে থাকি, খারাপ লাগার মুহূর্তে জীবনের হাল ছেড়ে একপাশে সরে দাঁড়াই, উদাসীন হয়ে যাই। পালিয়ে যাই। একেই বলে এলিয়েনেশান। আজকের জীবনের যা কিছু আয়োজন তাতে হৃদয় নেই, মন নেই, ভালবাসা নেই, ভালোলাগা নেই, আমাদের শূন্যতা ভরে উঠছে 'না কার্যে' 'না-কারণে'। আমার এই নাটক হল সেই 'না-জীবনের' 'না নাটক'। এ জীবনে নেশা আছে পেশা আছে, জন্ম আছে মৃত্যু আছে, আড়ম্বর

আছে আয়োজন আছে, নেই কেবল দিশা। এ শূন্যতা সাধকের সাধনলব্ধ নয়. এ শূন্যতা মহাশূন্যের সৃষ্টির আয়োজন নয় এ শূন্যতা হল জীবনহীন ভ্যাকুয়াম। নাটকের বাইরে সবচেয়ে বড় অভিনয়। আমাদের অন্তর থেকে অন্তরটা উড়ে গেছে, আমাদের বোধ হাওয়ায় মিলিয়ে গেছে, আমাদের আমিটা বাইরে প্রক্ষিপ্ত হয়ে গেছে. অপরিচিতের মত শূন্য প্রান্তরে গাছের তলায় সে দাঁড়িয়ে আছে. তাকিয়ে দেখি চিনতে পারি না। নির্জনতায় যখন সে তুমি তুমি করে ফিরে আসতে চায়. আমরা বলি পরে পরে. এখনও বড় ক্লান্ত. একটু ঘুমোই। 'আমি শূন্য' জীবনে ক্লান্তির প্রভুত্ব। এখন নাটকটাই জীবন, জীবনটাই নাটক। জীবন খারাপ লাগে বলেই তুমি পালাচ্ছিলে। তোমাকে কনসাস করতে চেয়েছি বলেই তোমার খারাপ লেগেছে।'

ভাঁড়ের চা হাতে এল। নাট্যকার বললেন, 'খাও।' এক চুমুক খেয়ে বললেন, 'তুমি তো কিছু বলছ না?'

আমার কোনো প্রস্তুতি নেই। হয়তো আপনি ঠিকই বলেছেন আমার কনসাসনেসের মৃত্যু হয়েছে। বেঁচে আছে কিছু অভ্যাস। আর অভ্যাসকেই জীবন বলে ভুল করছি।'

তুমি ব্রেন ইনজিওরড পেশেণ্ট দেখেছো?'

'না।'

'আমি দেখেছি। হসপিটালের বেডে অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছে মাসের পর মাস। শ্বাসপ্রশ্বাস আছে. জীবন আছে. জৈব প্রয়োজন আছে, খাদ্য চাইছে, জল চাইছে. সময় হলেই মলমূত্র ত্যাগ করছে, গরমে ঘামছে. শীতে গায়ে কাঁটা দিচ্ছে কিন্তু সুক্ষ্মবোধের উৎসটা গুঁড়িয়ে গেছে। যুবতী রমণীর লাল ঠোঁটের চুমু তার কাছে অর্থহীন, আলপিনের খোঁচা ব্যথাহীন, আমি কি বলতে চাইছি বুঝেছো? চাওয়ার দুটো ধরন আছে. সচেতন চাওয়া অচেতন চাওয়া। তোমার মাথায় ডাণ্ডা মেরে তোমার সচেতন চাওয়াকে শেষ করে দিতে পারি, আর কিভাবে পারি. তোমাকে প্রতিমুহূর্তে বঞ্চনা করে, সমস্যার ঘূর্ণাবর্তে ফেলে সমাধান থেকে দিনের পর দিন দূরে রেখে তোমাকে গুলিয়ে দিয়ে তোমার কনসাসনেসকে হত্যা করতে পারি। তুমি কেন চাও, কি চাও শিব চাও কি বাঁদর চাও তুমি নিজেই জানো না। অন্ধকার ঘরে দীর্ঘদিন তোমাকে বন্দী করে রাখলে তোমার চোখে আলো আর সহ্য হবে না। অন্ধকারটাকেই তখন তুমি ভালো বলবে। তুমি তোমার ভালোলাগাটাই সকলের ভালোলাগা বলে ভুল করবে।

একেই বলে আইসোলেসন।'

'আমার সব গুলিয়ে যাচ্ছে।'

'গুলিয়ে যাচ্ছে না তুমি নিজেই গুলিয়ে আছো। ওই দেখো আমাদের ব্যষ্টি জীবনের চাহিদার এক একটি চরিত্র হয়ে বসে আছে। ওই দেখ, বারবনিতা রাতের মন ভোলানো সাজে সাজছে। জিজ্ঞেস কর সে কি চায়? বলবে বেশ্যাবৃত্তি চলুক অপ্রতিহত কারণ এইটাই আমার বৃত্তি। ওই দেখ গৃহবধূ। সে কি চায়? বেশ্যাবৃত্তি বন্ধ কর কারণ ওই তার স্বামী, সব উপার্জন বেশ্যার সেবায় ঢেলে দিয়ে ফতুর। স্ত্রী চায় স্বামীর নিরাপত্তা, অটুট সংসারের আশ্রয়। ওই দেখ মজুতদার কালোবাজারী, সে চায় দুর্ভিক্ষ, অনাহার, মূল্যবৃদ্ধি, ফাটকাবাজী। ওই দেখ শিল্পপতি, সে চায় একচেটে পুঁজি। ওই দেখ শ্রমিক, সে চায় তার শ্রমের ন্যায্য মজুরী। ওই দেখ মালিক, সে চায় আরো মুনাফা, চায় অটোমেশন, ছাঁটাই। ওই দেখ ছাত্র, সে চায় আরো নৈরাজ্য। ওই দেখ শিক্ষক, সে চায় মানুষ গড়ার মত শিক্ষাব্যবস্থা কিংবা রাজনৈতিক ডামাডোল। ওই দেখ ফুটপাথের মানুষ, সে চায় পরিষ্কার দিন, হাওয়ার রাত, ধনীর কৃপা। ওই দেখ ধনী, সে চায় কম ট্যাক্স, ব্যাংকে লকার, আন ডিক্লেয়ারড ইনকাম। ওই দেখ অ্যাডমিনিস্ট্রেশান, সে চায় আরো ট্যাক্স, আরো বেহিসেবী খরচ। ওই দেখ মধ্যবিত্ত, সে চায় আরো সুযোগ, শ্রমহীন আরো উপার্জন। ওই দেখ বিদেশী মতবাদ, তারা চায় নাক গলাবার জায়গা। ওই দেখ পাতুল পরা পলিটব্যুরো, এক একজনের হাতে এক এক ফর্দ, সোস্যালিজম, ক্যাপিট্যালিজম, মার্কসিজম। আর তোমার মাথায় ওপর ছড়ানো শূন্যতা, তোমার আমিটা দিশাহারা, ডানা ভাঙা পাখির মত পাকসাট খাচ্ছে। ওই দেখ উজ্জ্বল আয়না, তোমার চেতনার দর্পণ, তোমার আমি তোমার দিকে বিমূঢ়ের মত তাকিয়ে আছে। তোমার সারা মুখে তোমারই জীবনের মেকআপ। একদিকে সমষ্টির চাহিদা আর একদিকে ব্যষ্টির চাহিদা মাঝখানে ক্ষমতার মঞ্চ, সামনে বিভ্রান্ত দর্শক। এই তো আমার নাটক। তুমি বলেছিলে না, আমার মুখে গন্ধ, তুমি সঙ্গে সঙ্গে আমাকে সেলফ কনসাস করেছো। আমি এখন থেকে কথা বলার সময়, হয় মুখে হাত চাপা দিয়ে কথা বলব, না হয় বড় এলাচ খাবো। এই 'বটা হল আমাদের সকলের মুখের দুর্গন্ধ। আত্মচেতনায় একটু আঘাত। অভিনয়ের অভিনয়, ড্রামার ড্রামা। বাকিটা দেখবে নাকি!

মজা আছে।'

বাকিটা আর দেখা হল না। সাজঘর থেকে সোজা রাস্তায়। রাতের কলকাতা রাস্তায় জ্বলছে, জানলার পর্দায় জমছে, বাতাসে উড়ছে, পথে পিষ্ট হচ্ছে। সারাদিনের উত্তাপ ঘোর হয়ে আছে পথের বাতির চোখে। দুঃস্থ মানুষ হয়ে পথ চলছি। বাসের স্টিয়ারিং হুইলে মাথা নিচু করে বসে আছে চালক। মানুষ ছুটছে ঘরমুখো। ফুটপাথে পাশ ফিরে শুচ্ছে ক্লান্ত মানুষ। দোকানের দরজা বন্ধ হচ্ছে, আলো নিভে আসছে একে একে। এদের মধ্যে কে জনতার প্রতিনিধি? আর একটু পরেই মানুষ যখন নিজস্ব হবে, তখন মধ্যযুগের কোনো খলিফা কি ছদ্মবেশে নগর ভ্রমণে বেরোবেন? জনপদের জানলায় উদ্‌গ্রীব দয়ালু মুখ উঁকি দিয়ে দেখে যাবে প্রতিটি মানুষের দুঃখ সুখের পরিধি। কে হবে জনপ্রতিনিধি, কি হবে শাসনব্যবস্থা। একই সংগে, কে হবে বারবনিতার বাবু, বনিতার কর্তব্যপরায়ণ স্বামী, কৃষকের কৃষি, শিল্পের শিল্পী, মালিকের বন্ধু শ্রমিকের দাবি, দাসের দাস, ধনীর মূলধন। কে হবে ছাত্রের শিক্ষা, শিক্ষকের ফাঁকি, শাসনের জুলুম, অপব্যয়ীর অপব্যয়, মিতব্যয়ীর মিতব্যয়। কে হবে বিদেশের স্বার্থ স্বদেশের স্বদেশ চেতনা।

কে যেন কাঁধে হাত রাখল। নাট্যকার নাকি। না আমি, তোমারই আমি। এতক্ষণ পাশাপাশি চলেছি। যতক্ষণ পাশে থাকবো ততক্ষণ কষ্ট পাবে। আমি যাই। 'আমি' যেখানে 'এক আমি' সেখানে আমি তোমার অপেক্ষায় থাকি। যেখানে প্রশ্নও নেই, সমাধানও নেই। তুমি বরং এক ঘুমে রাতটা পার করে দাও।

ঢেঁকি

'ঢেঁকি সম্বন্ধে আপনাদের কি ধারণা?'
বাঘা, বাঘা অফিসাররা মোটা মোটা ফাইল আর রিপোর্ট নিয়ে বসেছিলেন।
মন্ত্রীর প্রশ্নে সকলেই চমকে উঠলেন। প্রশ্নটা অনেকটা তলপেটে ঘুসি
চালানোর মত। কোঁক করে শব্দটাই কেবল হল না। এত জিনিস থাকতে
ঢেঁকি! মন্ত্রী বললেন, 'ঢেঁকি আপনারা দেখার সুযোগ পেয়েছেন
কখনো?'

'অফকোর্স'।' প্রথম সারিতে বসেছিলেন শিল্পদফতরের অধিকর্তা, তিনি
লাফিয়ে উঠলেন, 'দেশের ছেলে ঢেঁকি দেখিনি তা কখনো হতে পারে স্যার।'
তাঁর বিভাগের অন্যান্য অফিসারদের প্রোটেকশান দেবার জন্যে আরো বললেন
'দে হ্যাভ অল সিন ঢেঁকি।' তিনি থামলেন না, তাঁর সন্দেহ হল অনেকেই
হয়তো ঢেঁকি দেখে নি, পাছে উল্টো-পাল্টা কিছু বলে বসে, সেই ভয়ে ঢেঁকির
একটু বর্ণনা দিলেন, 'একটা ফালক্রামের ওপর বেশ ভারি মোটা একটা কাঠ
ফিট করা থাকে। হোয়েন নট ইন অ্যাকসান বিশাল একটা গ্রাসহপারের মত
দেখায়। প্রিন্সিপ্যালি ইট ওয়াজ ইউজড এক্সটেনসিভলি ফর পাউন্ডিং অফ

প্যাডি ইনটু রাইস। অপারেশান ইজ ভেরি সিম্পল। কাঠটার লম্বা অংশে একটা খুরো ফিট করা থাকে। সেই দিকের মাটিতে একটা গাব্বু থাকে। এদিকে কাঠের স্মল প্রোজেকসানের ওপর গ্রামের মেয়েরা একটা পা রেখে যেই প্রেসার অ্যাপ্লাই করে অমনি অপর মাথাটা উঠে পড়ে। বাই সিনক্রোনাইজেসান অফ দিস ভেরি সিম্পল মুভমেন্ট, ঢেঁকুস ঢেঁকুস করে তারা ধান ভানে। রেদার ভাঙতো। এখন দ্যাট মেথড হ্যাজ বিকাম অবসোলিট।'

মন্ত্রী একটু হাসলেন. 'মিঃ সেনগুপ্ত, আমি কিন্তু অ্যাকাডেমিক অ্যাপ্রোচ একেবারেই পছন্দ করি না। আমি চাই ইকনমিক অ্যাপ্রোচ। ঢেঁকির অর্থ নীতি সম্বন্ধে হ্যাভ ইউ এনি আইডিয়া? আপনার লেখাপড়া কোন্ স্ট্রিমে!' মিঃ সেনগুপ্ত ইতিমধ্যে বসে পড়েছেন। অল্প একটু উঠে বললেন, 'ফিজিক্স।'

'ইকনমিকসের কেউ আছেন? এনি অফ ইউ?'

একেবারে পেছনের সারিতে বসেছিলেন ডক্টর ঘোষাল। ফিলাডেলফিয়া থেকে ডক্টরেট করে এসেছেন। বিষয়, 'অনুন্নত দেশের অর্থনীতিতে গোবর গ্যাস।' ডক্টরেট বলে কথা কম বলেন, মুখে সব সময় লম্বা পাইপ। সামনের কল্কেটা ঝকঝকে কোনো ধাতুর তৈরি। ডক্টর ঘোষাল নিজে দেশী কিন্তু তাঁরা সব কিছু বিলিতি, চোখে রুপোলী ফ্রেমের চশমাটা জার্মানীর, পাইপটা আমেরিকার, পকেটের গ্যাস লাইটারটা ইংলন্ডের, জুতো ইতালির, ফোল্ডিং ছাতাট জাপানের, গোঁফটা ফ্রানসের মানে ফরাসী দেশের সেলুন দ্য আইফেল থেকে ট্রিম করানো, শরীরের সানট্যান সিসিলির, ইংরেজীর অ্যাকসেন্ট ইন্দো-আমেরিকান, পেটে হ্যাম, হামবার্গার স্কচ, সিনক্রানো। চলনে ফক্সটর্ট, আচরণে ডেজার্ট ফক্স। মেজাজে হিটলার। সকলের সঙ্গে পার্থক্য বজায় রেখে চলেন। ঘোষাল উঠে দাঁড়ালেন। দাঁড়াবার ভঙ্গিটা জাহাজের ডেকের নেলসনের মত। একটু বিলিতি ধরনের কেশে বললেন, 'ইকনমিকস ইজ মাই সাবজেক্ট। আই অ্যাম এ ডক্টরেট।'

'ঢেঁকি দেখেছেন?' মন্ত্রীর সোজাসুজি প্রশ্ন।

'ইয়েস স্যার। একবার সামারে আই ওয়াজ ইন লাতিন আমেরিকা। সেখানে একটা ইনটিরিয়ার ভিলেজে আই স এ থিং এগজ্যাক্টলি সিমিলার টু ঢেঁকি, এ ফালক্রাম, টু নিট প্রোজেকশান অন আইদার সাইড, সিমিলার সিনক্রোনাইজড মুভমেন্ট, ঢিপ, ঢিপ, ঢিপ, ঢিপ।'

নিজের দেশে ঢেঁকি দেখেছেন? মন্ত্রীর প্রশ্নের ডক্টর ঘোষাল একটু শ্রাগ

করলেন। 'নিজের দেশ সম্পর্কে' তাঁর একেবারেই ভাল ধারণা নেই। তিনি নিজেকে ফরেনার মনে করেন। যেন ইংরেজ সিভিলিয়ান ইণ্ডিয়ান সার্ভিসে কয়েক বছরের জন্যে এসেছেন। ঘোষাল বললেন, 'খুব কাছ থেকে না দেখলেও দূর থেকে দেখেছি। অন দি ওয়ে টু নর্থবেঙ্গল একবার আমার গাড়িটা একটা ভিলেজের কাছে ব্রেক ডাউন হয়ে গিয়েছিল। সেই সময় আমি দূর থেকে, হাওয়েভার স্কুলের পাঠ্যপুস্তকে আমি স্কেচ দেখেছি।'

'দূর থেকে দেখা বা স্কেচে হবে না, আমি চাই থরো নলেজ, ইন ডেফথ স্টাডি ইন এ নিউলাইট, নতুন আলোতে ঢেঁকিকে দেখতে হবে, আই মিন আমাদের দেখতে হবে।'

মন্ত্রীর কথায় মিঃ সেনগুপ্ত উঠে দাঁড়ালেন, 'আমি স্যার এখুনি লাইব্রেরী থেকে বুক অফ নলেজ আর এনসাইক্লোপিডিয়া বত্রিশ খণ্ড আনাচ্ছি। ডিটেলস সেইখান থেকেই পেয়ে যাবো।' ডক্টর ঘোষাল একটু ব্যঙ্গের হাসি হেসে বললেন, 'নট দ্যাট ইজি স্যার। ব্রিটানিকায় কোন রেফারেন্স পাবেন না ইভন ওয়েবস্টারের বড় ডিকসনারিতেই কোন উল্লেখ নেই। সামান্য একটু ওবলিক রেফারেন্স আছে পাউণ্ডারের, এ গান থ্রোয়িং এ প্রোজেকটাইল অফ এ স্পেসিফায়েড ওয়েট।'

মিঃ চৌধুরী হাত নেড়ে ঘোষালকে থামিয়ে দিলেন, 'আমার মনে হয় একটা সামান্য জায়গায় আমরা আটকে গেছি। আসলে ইংলিশ টু ইংলিশে আমাদের প্রবলেম সল্ভ করা যাবে না, আমাদের যেতে হবে বেঙ্গলি টু ইংলিশ। ঢেঁকির ইংরেজীটা আমাদের জানতে হবে! কত বড় ফাঁকিবাজী দেখুন স্যার, স্বাধীনতার পর থেকেই ঢেঁকি পড়েছে ভিলেজ ইনডাসট্রিজ স্কিমে। গান্ধীয়ান অর্থনীতির পিভট। এত বছর গেল তোমরা ঢেঁকির ইংরেজীটা দেশবাসীকে জানতে দিলে না। স্রেফ চালাকি করে হ্যাণ্ড পাউণ্ডিং অফ রাইস বলে চালিয়ে গেলে এতকাল। কেন বলতে পারতে না পাউণ্ডিং অফ রাইস উইথ এ ঢেঁকির প্রপার ইংলিশ টার্ম। মহাত্মাতেও ভেজাল। এডালটারেটেড মহাত্মা লাইক এডালটারেটেড মিল্ক অর ঘি! তোমরা বসে না থেকে ইংরেজীটা যদি করে রাখতে আজ আমাদের এই অসুবিধেটা হত না। সংখ্যাবিদ্ হিসেবে আমরা সবার আগে স্ট্রেস দি টার্মস, নমিনক্লেচার, কোডিং, ইনডেকসিং-এর উপর। আগে জিনিসটাকে প্রপার ইন্টারন্যাশনাল নমিনক্লেচারে প্লেস কর, তখন রেফারেন্স ইজ ভেরি ইজি।

ভাল ভাল বই আছে, খোলো আর দেখ।'

চৌধুরীর সংগে ঘোষাল একমত হলেন, 'দ্যাটস ট্রু স্যার। ভেরি ট্রু। এখন দেখা যাচ্ছে একটা রেফারেন্স কমিটি করে সবার আগে ঢেঁকির ইংরেজীটা বের করতে হবে। ও, এ-টি দেব সুবল মিত্রের কর্ম নয়। হ্যারো, হার্ভার্ড থেকে এক্সপার্ট আনাতে হবে।'

মন্ত্রী বোধহয় কিছু বলতে যাচ্ছিলেন, মিঃ ভঞ্জ হৈ হৈ করে উঠলেন। গলার জোর, শরীরের জোর দুটোই তাঁর বেশি। সংস্কৃতের এম-এ, শিল্প-দপ্তরে কিভাবে এসে গেছেন। প্রাচীন ভারতের শিল্পের উপর গবেষণা করছেন ডক্টরেট হবার জন্যে। প্রচুর পান খান। এখনো মুখে একটি নিটোল খিলি। তিনি তাঁর স্বাভাবিক গলায় প্রতিবাদ করে উঠলেন, 'ঢেঁকি হল থার্ড ওয়ার্ল্ডের জিনিস। সেটাকে এঁরা ফার্স্ট ওয়ার্ল্ডে ঠেলে দিচ্ছেন। কোনো মানে হয়। এশিয়ার জিনিসের সন্ধান চাইছেন আমেরিকায়। আমাদের এই ভারত সভ্যতা কত সু-প্রাচীন। এখানে একদা হেলিকপটার ছিল, অ্যাটম বোম ছিল, উড়ো জাহাজ ছিল, চড়ক ছিল, সুশ্রুত ছিল।'

উত্তেজিত ভঞ্জের মুখ থেকে পানের টুকরো ছিটকোচ্ছে, মিঃ সেনগুপ্ত ফাইলের আড়ালে আত্মরক্ষার চেষ্টা করছেন! 'কি ছিল না এই ভারতে। আজ দানিকেন সাহেবের কথায় আমাদের বিশ্বাস আসছে অথচ রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ আমরা বিশ্বাস করলুম না। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে ঢেঁকির ক্রিয়ার রেফারেন্স আছে। যদিও ঢেঁকি একটি অনার্য জিনিস, মুণ্ডা ডিংকি থেকে ঢেঁকি এসেছে, পুরোপুরি ট্রাইবাল ব্যাপার। নীলনদের সভ্যতা আর বৈদিক সভ্যতায় ঢেঁকি একটা ইমপর্টান্ট ইনোভেশান। অসভ্য মানুষ সভ্য হচ্ছে, প্রস্তরযুগ, লৌহযুগ, তাম্রযুগ, কাঁচা মাংস, পোড়া মাংস, রান্না মাংস চাষ সেচ গুহা জনপদ শস্য ঢেঁকি। ঢেঁকি হল সভ্যতার চৌকাঠ। নারদের ঢেঁকি চড়া, ইজ ইট জাস্ট এ স্টোরি? নো, নেভার, কান্ট বি।' ভঞ্জ তিন দিকে মাথা ঝাঁকালেন, তাঁর ফিলিংস এসে গেছে। 'এর ইমপ্লিকেসান অনেক সূক্ষ্ম—আর্য আর অনার্য সভ্যতার মিলন। ঢেঁকি হল বর্ণসংকর।'

মন্ত্রী টেবিলের ওপর হাল্কা আঙুলে গোটা তিনেক টোকা মেরে বললেন, 'বসুন, বসুন, অল অফ ইউ।' সকলে বসলেন। তিনি হাসি হাসি মুখে সমবেত সকলের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'ইউ হ্যাভ কমপ্লিটলি মিসড মাই পয়েন্ট। হাওয়েভার আমার বেশ ভালই লাগছিল। থরোলি অ্যামিউজড।

কিভাবে নিজেদের এইভাবে ক্রিপল করলেন? মানসিক দিক থেকে একেবারে পঙ্গু। দি সিসটেম, দিস রেচেড সিস্টেম! যে ভাবে আমরা দেশ শাসন করছি। এ ভাবে চলবে না। উই নিড এ চেঞ্জ। আপনাদের কাছে আমি থিসিস চাই নি। আমি যা চেয়েছি ভাল করে শুনে নিন, নাম্বার অফ ঢেঁকিস ইন দি স্টেট, কত ঢেঁকি আছে, নাম্বার অফ পার্সন্স এনগেজড, কত লোক ঢেঁকিতে নিযুক্ত, আরো কত লোক নিযুক্ত করা যেতে পারে, অ্যাভারেজ ডেলি প্রোডাকসান। কয়দিন আপনাদের সময় দিচ্ছি। আজ সোমবার, আগামী বুধবার আমি রিপোর্ট চাই। রিপোর্ট শুড বি ইন বেঙ্গলি। বিশুদ্ধ বাংলায় একটি সংক্ষিপ্ত রিপোর্ট বাই উয়েডনেসডে হিয়ার এন্ড এট দিস টাইম। আপনাদের কোনো ধারণাই নেই গ্রামীণ অর্থনীতিতে ঢেঁকি কি ভূমিকা নিতে পারে। আমি ঢেঁকির রিভাইভাল চাই। ঘর ঘর ঢেঁকি, সকাল সন্ধ্যে ঢেঁকির শব্দে আকাশ-বাতাস মুখর হয়ে উঠবে। কৃষকের ধান, কৃষক বধূর ঢেঁকি, লাল খোসাসুদ্ধ ঢেঁকি-ছাঁটা সুইট চাল, মাঠের টাটকা সবজি, পর্ণকুটিরের চালায় চালায় দোদুল্যমান লাউ, ছাঁচি কুমড়ো, সন্ধ্যার শাঁখ, নবান্ন, কোজাগরী লক্ষ্মীপুজো, আবার আমরা পুরোনো দিনে ফিরে যাবো, একেই বলবো আমরা গ্রামীণ রেনেসাঁ। দুঃখ নেই, দারিদ্র নেই, শাসন নেই, শোষণ নেই,' ঝাঁক ঝাঁক সুখের পায়রা, অসীম নীল আকাশে দীপ্ত সূর্যের ছটা ডানায় মেখে লাট খাচ্ছে, পাক খাচ্ছে, পাক খাচ্ছে লাট খাচ্ছে, এক্সকিউজ মাই সেন্টিমেন্ট, সামটাইমস আই সি ভিসানস।'

'অ্যান্ড আই প্রোটেস্ট।' মন্ত্রী চমকে উঠলেন। সোস্যাল ওয়েলফেয়ারের মিস নিয়োগী উঠে দাঁড়িয়েছেন। ফর্সা টকটকে রঙ। গোলগাল চেহারা। চোখে ঝকঝক করছে কালো ফ্রেমের চশমা। চওড়া কালোপাড় তাঁতের শাড়ি। মিস নিয়োগী এতক্ষণ একটিও কথা বলেন নি। কথা বলার সুযোগ পান নি। এখন 'আই প্রোটেস্ট' বলে উঠে দাঁড়িয়েছেন। হাতের দু আঙুলে একটা নীল পেনসিল নাড়তে নাড়তে বললেন:

'আপনার আইডিয়া, দি রিভাইভাল অফ ঢেঁকি আমি সমর্থন করি না। ইনফ্যাকট সমস্ত নারী সমাজের তরফ থেকে আমি এর বিরোধিতা করব। তাতে আমার চাকরি থাকে থাক, যায় যাক।'

মিস নিয়োগীর কথায় মন্ত্রী বেশ উৎসুক হলেন। রেগে গেছেন বলে মনে হল না। টেবিলের ওপর হাতের কনুইয়ের ভর রেখে মৃদু হেসে জিগ্যেস করলেন, 'হোয়াই?'

মিস নিয়োগী একটু উত্তেজিত হয়ে বললেন, 'হাতা, খুন্তি, বেড়ির মত ঢেঁকিও হল নারী জাতির আর এক বন্ধন। আপনি একটা প্রিমিটিভ, প্রিমিটিভ শব্দটার বাংলা মনে আসছে না, হাওয়েভার আপনি একটা প্রিমিটিভ টর্চার চালু করতে চাইছেন যা এই বিংশ শতাব্দীর শেষ পাদে, নারী ইমানসিপেসান, নারী মুক্তির যুগে চিন্তা করা যায় না, ভাবা যায় না। আই শাডার, আই অ্যাম শেকন টু দি পেলভিস, আই অ্যাম থরোলি বিউইলডারড। আপনি আমাদের ওম্যানস লিবকে দুশো বছর পেছিয়ে দিতে চাইছেন। আই কান্ট থিঙ্ক অফ স্যার। এর পর আপনি কুলীন প্রথা, সতীদাহ, নীলের চাষ সবই চালু করতে চাইবেন। মেয়েরা আর সে মেয়ে নেই। ঘরে ঘরে আজ শিকল ভাঙার গান, মুক্তির ঢেউ লেগেছে। হেঁসেল ছেড়ে মেয়েরা বেরিয়ে আসছে। আপনার ঢেঁকিতে পাড় দেবে কে? দিতে হয় বেকার আড্ডাবাজ ছেলেরা দিক, অলস নেশাখোর পুরুষরা দিক, নট দি লেডিজ। তাছাড়া এর একটা মেডিকেল দিক আছে। অনবরত ঢেঁকিতে পাড় দিলে মহিলারা ডিসেকসড হয়ে যান, বন্ধ্যা হয়ে যায়। ডু ইউ ওয়ান্ট দ্যাট? ডু উই ওয়ান্ট দ্যাট?'

প্রায় এক নিশ্বাসে মিস নিয়োগী তাঁর প্রোটেস্ট জানিয়ে ধপাস করে বসে পড়লেন। মন্ত্রী তাঁর চুলে কিছুক্ষণ আঙুল চালালেন। ঘর নিস্তব্ধ। একটা পাখা কেবল চামচিকের মত কি চ কি'চ করছে। মন্ত্রীর মুখ অল্প গম্ভীর। রাগে কিংবা নতুন কোনো চিন্তায় বলা শক্ত। সামনের দেয়ালের দিকে কিছুক্ষণ তাকালেন, তারপর চেয়ার থেকে উঠে পড়ার মত একটা ভঙ্গি করে বললেন, 'মিঃ সেনগুপ্ত, আপনার ওপর ভার দিলুম, প্রিপেয়ার দি রিপোর্ট, সমস্ত পয়েন্ট তাতে থাকবে, স্ট্যাটিসটিক্স, ইকনমিক্স, সোসিও ইকনমিক্স, অবসোলেসনেস, বারস অ্যান্ড বেরিয়ারস, রিলিজান, কাস্টম এমন কি মেডিকেল সাইড অফ ইট। মিস নিয়োগী?'

মিস নিয়োগী তাকাতেই মন্ত্রী বললেন, 'আমি জনসাধারণের নির্বাচিত প্রতিনিধি। আমার কাজের বেস ভিলেজ, নট ইওর ফ্যাশানেবল পশ সিটি এরিয়াস। আমাদের সংগ্রাম খিদের বিরুদ্ধে। খিদে নোজ নো ল। আই উইশ ইউ আর পোস্টেড ইন এ ভিলেজ।' মন্ত্রী গট গট করে বেরিয়ে গেলেন।

॥ ২ ॥

মিস্টার সেনগুপ্ত বা সেনগুপ্ত সাহেব তাঁর দলবল নিয়ে নিজের শীতল ঘরে চলে এলেন। ফাইল, রিপোর্ট কত কি নিয়ে গিয়েছিলেন মন্ত্রীর মাথা ঘুরিয়ে দেবার জন্যে। অনারেবল মিনিস্টার এক ঢেঁকি দিয়ে সব ব্যাটাকে কাত করে দিলেন। দ্বিতীয় আশানন্দ ঢেঁকি! জোরে জোরে গোটাকতক বোতাম টিপলেন। তিন চারটে ঘরে তার প্রতিক্রিয়া হল। প্রথমে তাঁর পি-এর ঘরে একটা লাল আলো জ্বলল নিভল। বাইরের করিডরে তাঁর অর্ডা-রলির মাথার ওপর একটা চৌকো বাক্স ধরা গলায় ধমকে উঠল ভাগ ভাগ। তাঁর সেকসান ইনচার্জের টেবিলে অনুরূপ কিছু কাণ্ড ঘটল। সকলকেই তাঁর এখন ভীষণ প্রয়োজন। গলায় ঢেঁকি আটকেছে। ঘরের দূরত্ব অনুসারে একজন এক এক সময়ে এলেন। পি এ আর পিওন একসঙ্গে হুড়মুড় করে ঘরে ঢুকলেন। তিনি দুজনকে প্রায় একই সময়ে বলে উঠলেন ঃ

'কফি। টপ প্রায়রিটি, টপ প্রায়রিটি, টপ প্রায়রিটি, তিনবার। টেলেক্স মেসেজ। টু অল দি ডি-এমস। ইমিডিয়েটলি সেন্ড স্ট্যাটিসটিকস অন, অন' ডিকটেশান থেমে গেল। বিব্রত মুখে বললেন, 'সত্যি ঢেঁকির কি ইংরেজী বলুন তো! এমন একটা জিনিস যা কোনো সাহেবের নজরে পড়েনি। কি লিখলেন, ইয়েস, স্ট্যাটিসটিকস অন ঢেন্‌কি, ডি এইচ ই এন কে আই। টোটাল নাম্বার ইন ইওর ডিস্ট্রিক্ট, পার্সনাস এনগেজড, ক্যাপাসিটি, কনডিসান। অলসো এসেস দি সোসিও ইকনমিক ভায়াবিলিটি অফ ইটস রিভাইভাল। আর্জেন্ট, ভেরি আর্জেন্ট, ভেরি ভেরি আর্জেন্ট। স্টপ। নোট নেওয়া শেষ হতেই বললেন. 'এক্ষুনি টেলেক্স। সব কাজ ফেলে টেলেক্স।'

ইতিমধ্যে সেকসান অফিসার এসে গেছেন। তাঁকে দম নেবার অবসর না দিয়ে মিঃ সেনগুপ্ত বললেন, 'এক্ষুনি কনট্যাক্ট করুন খাদির মুখার্জি, নিউ-ট্রিশানের চ্যাটার্জি, লাইব্রেরীর মিত্র, গাইনাকোলজিস্ট সেন, ফুডের ব্যানার্জি, অ্যাগ্রিকালচারের দাস, চিফ মেডিক্যাল অফিসার আর ধুরন্ধর চ্যাটার্জি। যে যেখানে আছে, অ্যাজ ইজ হোয়্যার ইজ এখানে চলে আসতে বলুন।'

সেকসান অফিসার নির্দেশ পালনের জন্যে প্রায় দৌড়োবার ভঙ্গিতে চলে যাচ্ছিলেন। মিঃ সেনগুপ্ত বললেন, 'আর হ্যাঁ পঞ্চায়েতের বোসকেও বলবেন। লাঞ্চ, মিটিং সেমিনার, সিনেমা, অ্যাপয়েন্টমেন্ট, এনগেজমেন্ট কোনো অজুহাতে চলবে না। বলবেন মিনিস্টারস অর্ডার।'

সকলে কফির কাপ ঠোঁটের ডগায় তুলে নিলেন। উঃ সকাল থেকে স্নায়ুর ওপর কম প্রেসার। অন্য দিন এতক্ষণ ছ' কাপ চা, ছ' প্যাকেট সিগারেট উড়ে যায়। কি এক শালা ঢেঁকি। এইরকম প্রেসারে চাকরি করলে হার্ট ডিজিজ ঠেকানো যাবে! কফিতে লম্বা একটা চুমুক দিয়ে মিঃ সেনগুপ্ত তিরস্কারের কণ্ঠে বললেন, 'ইউ আর অল এথেলরেড দি আনরেডি। আমি দেখেছি যখনই কোনো ক্রাইসিস আসে আপনারা অলওয়েজ আনপ্রিপেয়ারড। কিছুই জানেন না, কিছুই করেন না, সবই পরস্মৈপদী। বুড়ো হয়ে মরতে চললেন, ঢেঁকি দেখেন নি? কতবার বলেছি যে দেশে আছেন, সেই দেশটাকে একটু চিনুন, তা না বাড়ি অফিস, অফিস বাড়ি। ট্যুর মানেই দিল্লী বোম্বাই মাদ্রাজ। ফিজিক্সটা পড়া ছিল বলে তবু এক্সপ্লেন করতে পারলুম!'

মিঃ চৌধুরী বললেন, 'সাহস করে একটা টেকনিক্যাল পয়েন্ট তুললুম বলে মন্ত্রী খানিকটা সফট হলেন। তা না হলে কি যে হত?'

ডক্টর ভঞ্জ বললেন, 'সংস্কৃত চর্চা করেছিলুম বলে অর্থশাস্ত্রে ঢেঁকিটা ঢোকাতে পারলুম।'

মিঃ ঘোষাল বললেন, 'লাতিন আমেরিকায় দেখেছিলুম বলে তবু মুখ রক্ষে হল।'

মিঃ সেনগুপ্ত বললেন, 'মিস নিয়োগী আপনার পাকামোটা একদম ভালো লাগল না। মিনিস্টার ভীষণ অফেন্ডেড হয়েছেন বলে মনে হল। এইবার আপনার নির্ঘাত গ্রামে নির্বাসন। তখন বুঝবেন ঠ্যালা। ওম্যানস লিব বেরিয়ে যাবে। রাস্তা নেই, ঘাট নেই, আলো নেই, পাখা নেই, এই বড় বড় মশা, সর্বঅঙ্গ ফুলিয়ে ছেড়ে দেবে। ঠিক হয়েছে। কত ধানে কত চাল এইবার বুঝবেন। গ্রাম তো দেখেন নি। কাব্যেই পড়েছেন আর ছবিতে দেখেছেন। কয়েকদিন থাকলেই লিব শুকিয়ে যাবে।'

মিঃ ভঞ্জ বললেন, 'একে নারী তায় সুন্দরী, সাতখুন মাপ।' মিঃ ভঞ্জ ব্যাচেলার। কালিদাস পড়েন! দীর্ঘকাল মিস নিয়োগীর কাছাকাছি

একটু আসতে চাইছেন। পাত্তা পাচ্ছেন না। এই ঢেঁকি সূত্রে ঘনিষ্ঠ হবার শেষ চেষ্টা। মিস নিয়োগী কফিতে শেষ চুমুক দিয়ে বললেন, 'আমার অ্যাপ-য়েন্টমেন্টে বাইরে পোস্টিংয়ের কথা কোথাও বলা নেই। ট্রানসফার করলেই হাইকোর্ট। আমার বাবা জাঁদরেল ব্যারিস্টার। কেসে এক পয়সাও খরচ নেই।'

মিঃ সেনগুপ্ত খালি কফির কাপটা বাঁ পাশে সরিয়ে রেখে বললেন, 'যা ভালো বুঝবেন করবেন। কেউই আমরা কচি খোকা-খুকি নই। সো দি উইন্ড এন্ড রিপ দি হুইরল উইন্ড। হাওয়েভার লেট আস কাম টু দি পয়েন্ট। সময় খুব কম।' সেনগুপ্ত সবুজ টেলিফোনটা হাতে নিলেন। ডিরেক্ট লাইন। টেবিলে বিভিন্ন রঙের পাঁচটা ফোন। ফোন প্রুভস হিজ ইমপর্টেনস। ফোনের সংখ্যা দিয়ে পদমর্যাদা বোঝা যায়। চিফের টেবিলে আঠারোটা ফোন। ছাব্বিশটা বৈদ্যুতিক ঘন্টার বোতাম। সেনগুপ্ত ডায়াল করে বিকাশ নামক কোনো ভদ্রলোককে ধরেছেন। 'হ্যালো, হ্যাললো, হ্যালো বিকাশ! এ-প্রবলেম। এ জেনুইন প্রবলেম। তুমি সোসিওলজিস্ট। তুমি আমাকে বাঁচাতে পার। না না অ্যাপারেন্টলি ভেরি সিম্পল। হলে হবে কি অ্যাপ্রো-চটা সামথিং নিউ। হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক বলেছো ওল্ড ওয়াইন ইন এ নিউ বটল। বলবো। ঢেঁকির ওপর তোমার কোনো রিসেন্ট স্টাডি আছে? আরে না না কোনো নিউ পলিটিক্যাল পার্টি নয়। আরে না না কোনো ট্রাইব নয়। ধুর কোনো ক্রাইম নয়। আরে ঢেঁকি ঢেঁকি ঢ-এ চন্দ্র বিন্দু এ-কার কএ ই-কার। ঢে' ফর ঢেঁড়স কি ফর কিল। কিল, চড়, ঘুষি সেই কিল। হ্যাঁ হ্যাঁ স্বর্গে গেলেও দ্যাটস রাইট। সেই ঢেঁকির ওপর কোনো টেক-নিক্যাল রিপোর্ট আছে? টেকনিক্যাল মিনস মিনস, স্পেসিফিকেসান। ধর ঢেঁকির লেংথ কত, কাঠটা গোল মিনস রাউন্ড না ফ্ল্যাট, ফ্ল্যাট হলে থিকনেস, পিভট হাইট। কি বললে নট ইওর সাবজেক্ট! কার সাবজেক্ট? অ্যানথ্রোপলজি। কেন? যাঃ নৃতত্ত্ব আর ঢেঁকি তত্ত্ব কি এক জিনিস! ইম-পসিবল! নিয়ানডার্থেল ম্যান এন্ড ঢেঁকি। ডক্টর কারফর্মা! কোথায় আছেন! কোথায়? পেনসিলভ্যানিয়া? সে তো ইউ এস এ। ও মাই গড! আচ্ছা আচ্ছা। যাক অ্যানাদার পয়েন্ট, ঢেঁকি ও মানসিকতার ওপর এনি স্টাডি! যেমন যেমন, ধরো যারা এখনো ঢেঁকি ইউস করে তাদের চরিত্র স্বভাব ব্যবহার। অ্যাজ ফর এগজামপল. যাঁরা মোটর ইউস করেন তাঁদের একটু শ্রেষ্ঠত্বের বোধ, একটু স্বাতন্ত্র্যের ভাব এসে যায় না, একটু অহঙ্কার!

যেমন ধরো যারা সি সাইডে থাকে, নুন, ঝাল, টক খায়, একটু ফেরোসাস হয়, অথচ যারা পাহাড়ে থাকে, রাইট রাইট প্রোফেসান এন্ড স্বভাব, যেমন কসাই জল্লাদ, রাইট, পুওরদের ছেলেপুলে বেশি হয়। এইরকম কোনো অ্যাপ্রোচ তোমার করা আছে? কি বললে? জুয়েলার, কবলার, ওয়াচ রিপেয়ারার। ঢেঁকিটা কর নি কেন? তা করবে কেন? করলে যে দেশের উপকার হবে! ধুর আমার আজই চাই। ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ।' সেনগুপ্ত হতাশ হয়ে ফোন রাখলেন!

মিস্টার চৌধুরী বললেন, 'অত ডিটেলস কি মিনিস্টার চেয়েছেন? আমার যদ্দুর মনে হল উনি খালি স্ট্যাটিসটিকস চেয়েছেন। সাতকাণ্ড রামায়ণ করতে গেলে কালকের মধ্যে আপনার রিপোর্ট শেষ হবে না।'

'আলবৎ হবে। রিপোর্টের আপনি কি বোঝেন। আজ পর্যন্ত আমার সার্ভিস কেরিয়ারে শ পাঁচেক রিপোর্ট লিখেছি, আই মিন লিখিয়েছি! অ্যাগ্রি-কালচার থেকে সেরিকালচার, ক্রাইম থেকে লাইম, পল্যুশান থেকে ইভলিউশান এনি সাবজেক্ট আই ক্যান ডু জাস্টিস। রিপোর্ট আমাকে শেখাবেন না। আমি রিপোর্টের বাবা।' মিঃ সেনগুপ্ত উত্তেজিত হয়ে ঘন্টা বাজালেন। মিঃ চৌধুরী একটু ম্রিয়মাণ হয়ে গেলেন। ডঃ ঘোষাল ইতিমধ্যে পাইপ ধরিয়েছেন। ভঞ্জ মিস নিয়োগীর দিকে যথারীতি উদাস দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন। সারা ঘরে ঝিমঝিম করছে গা কাঁপানো ঠাণ্ডা।

ঘন্টা শুনে স্টেনো দৌড়ে এসেছেন—স্যার। 'টেক ডাউন। ইংরেজী হলে কারুর তোয়াক্কা করতুম না। মিনিস্টার বাঙলায় চেয়ে বড় বিপদে ফেলে দিয়েছেন। না পারছি ডিকটেশান দিতে, না পারছি আইডিয়াগুলোকে গুছিয়ে আনতে। হাওয়েভার ফ্রেমটা তৈরী হয়ে থাক। নিন—ঢেঁকি কমা এ সোসিও ইকনমিক রিভাইভ্যাল। ওয়ান. ইনট্রোডাকসান, ভূমিকায় থাকবে ইটস পাস্ট, প্রেজেন্ট, ফিউচার। টু, টেকনিক্যাল ডিটেলস। অর্থাৎ ঢেঁকির লেংথ, সারকমফারেনস, কি কাঠ থেকে হয়। নেচার অফ উড ইউসড। শাল, সেগুন, আম, জারুল। পাউন্ডিং প্রেসার। আপ এন্ড ডাউন মুভমেন্ট পার মিনিট। এন্ড রাইজিং অর্থাৎ পায়ের চাপে মাটি থেকে কতটা উঠছে।'

ডঃ ঘোষাল মুখ থেকে পাইপ সরিয়ে বললেন, 'সিলি। এ-সব কে চেয়েছে? মিনিস্টার চেয়েছেন ইকনমিক্স মিক্সড উইথ এ বিট অফ সোসিওলজি। দিস ইজ লাইক ধান ভানতে শিবের গীত।' আবার পাইপটা ঠোঁটে গুঁজে

দিলেন।

মিঃ সেনগুপ্ত ভীষণ আহত হয়েছেন। তিনি একটা সিগারেট ধরিয়ে বললেন, 'ননসেন্স। ফিজিক্স ছাড়া ইকনমিক্স আসবে কি করে মশাই? ধীরে ধীরে জিনিসটা আনফোলড করবে। রাম না জন্মাতেই রামায়ণ? ঢেঁকি আগে জন্মাক তারপর তো সব আসবে। ঢেঁকির শৈশব, কৈশোর, যৌবন, এণ্ড সো অন। তার স্বভাব। অর্থনীতির ওপর স্বভাবের প্রভাব নেই? ক্যান ইউ ইগনোর ইট? কেন কিছু মানুষ চিরকাল দরিদ্র। কেন আমরা অফিসার এণ্ড হি ইজ এ স্টেনো? কেন আমরা অফিসার এণ্ড মিনিস্টারি ইজ মিনিস্টার? কেন বুলক কার্ট ইজ এ কার্ট এণ্ড লরি ইজ এ লরি? আর্টসের স্টুডেণ্টেরা চিরকালই ভেরি মাচ ইনকোহেরেণ্ট। এভরিথিং শুড বিগিন ফ্রম দি বিগিনিং। ডোণ্ট ডিসটার্ব।'

ডক্টর ঘোষাল সোজা উঠে দাঁড়ালেন। মুখে সেই ফরমিডেবল পাইপ চারদিক থেকে ভস ভস করে ধোঁয়া বেরোচ্ছে। মনে হচ্ছে স্টেশানে একটা স্টিম ইঞ্জিন দাঁড়িয়ে আছে। জ্বলন্ত দৃষ্টিতে মিঃ সেনগুপ্তর দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে গটগট করে দরজার দিকে এগিয়ে গেলেন। সেনগুপ্ত অবাক হয়ে দেখলেন। দরজার চকচকে হাতলে হাত রেখে মিঃ ঘোষাল আর এক হাতে ঠোঁট থেকে পাইপটা খুলে নিলেন, 'আই ওয়াক আউট ইন প্রোটেস্ট।'

'কিসের প্রোটেস্ট?' সেনগুপ্ত অবাক হয়েছেন।

'প্রোটেস্ট অ্যাগেনস্ট ইওর ল্যাংগোয়েজ, ইওর ওভারবেয়ারিং অ্যাটিচিউড। আপনি ননসেন্স বলেন কোন্ সাহসে? কোন্ সাহসে?'

'আই সি! আপনি সিলি বললেন কোন্ সাহসে?'

'সিলি আর ননসেন্স এক হল? সিলি একটা কথার কথা। একটা মাত্রা। জাস্ট অ্যান অ্যাডজাংকট। হোয়্যারঅ্যাজ ননসেন্স! একেবার স্ট্রেট ডিরেক্ট চপেটাঘাত।'

'ঠিক আছে ওয়েবস্টার দেখা হোক। লেট ওয়েবস্টার বি দি জাজ ইন দিস কেস।'

'হোয়াই ওয়েবস্টার? হোয়াই নট অক্সফোর্ড?'

'বেশ দুটোই দেখা হোক। ওহে দেখ তো হে।' সেনগুপ্ত ঘূর্ণী চেয়ারে সাঁ করে একশো আশি ডিগ্রি ঘুরে র‍্যাক থেকে দুহাতে দুটো ডিকসনারি

নাড়ু ধরার মত করে ধরে, পায়ের চাপে আবার বোঁ করে ঘুরে টেবিলে বই দুটো ফেললেন। হাওয়া আর ধুলোর যুগপৎ ধাক্কায় স্টেনো ভদ্রলোক মুখটা পেছন দিকে সরিয়ে নিলেন।

মিঃ ভঞ্জ পঞ্চায়েতের মোড়লের মত গলা করে বললেন, 'যাকগে, যাকগে। সামান্য কথার মারপ্যাঁচ নিয়ে নিজেদের মধ্যে কলহ করার মানে হয় না। এখন এই দুর্যোগে ভূমিকম্পে জলপ্লাবনে সাপে মানুষেও বন্ধুত্ব করে চলে। সিলিও যা ননসেন্সও তাই। নো ডিফারেন্স।'

স্টেনোবাবু ততক্ষণে সিলি খুলে ফেলেছেন, 'সিলি ঃ ফুলিশ, ইমপ্রুডেন্ট, থটলেস, উইক মাইন্ডেড।' সেনগুপ্ত বললেন, 'জাস্ট সি, হাবা গাবা হাঁদা, গঙ্গারাম।'

ঘোষাল বললেন, 'ওয়েট ওয়েট, ননসেন্সটা দেখা হোক।'

স্টেনো ননসেন্স খুললেন, 'ননসেন্স ঃ অ্যাবসার্ড অর মিনিংলেস ওয়ার্ডস অর আইডিয়াস, ফুলিশ, অব একস্ট্রাভ্যাগান্ট কনডাক্ট, অ্যারেঞ্জমেন্ট এটসেটরা।'

সেনগুপ্ত সকলের দিকে চেয়ে বললেন, 'শুনলেন, ননসেন্স কোয়ালিফাইজ ওয়ার্ডস অর ইডিয়াজ কনডাক্ট, হোয়্যারঅ্যাজ সিলি কোয়ালিফাইজ দি ম্যান। সিলি ইজ রিয়েলি অ্যান অবজেকসানেবল ওয়ার্ড। ওয়াক আউট করতে হলে আমাকেই করতে হয়। কিন্তু নিজেই নিজের চেম্বার থেকে ওয়াক আউট করি কি করে? সো ইউ ওয়াক ইন অ্যান্ড হেলপ কনস্ট্রাকটিং দি রিপোর্ট।'

ঘোষাল হাতলে হাত রেখে একটু ইতস্তত করছিলেন। এমন সময় বাইরের চাপে দুম করে তাঁর নাকের ওপর দরজাটা খুলে গেল। পাইপের কল্কেতে সরাসরি দরজার ধাক্কায় ডাঁটিটা মুখে ঢুকে গিয়ে টাগরায় খোঁচা মেরেছে। ঘোষাল ঝট করে পাইপটা বের করে নিয়ে কাশতে কাশতে বললেন, 'শালা, হারামজাদা', তারপর কোনো রকমে নিজেকে সামলে নিয়ে যিনি সবেগে ঢুকলেন তাঁকে বললেন, 'বি এ বিট কেয়ারফুল।'

টকটকে লাল ফোলা ফোলা হাসি হাসি মুখে ঘরে ঢুকলেন গাইনাকোলজিস্ট মিঃ সেন। নড করে ঘোষালকে বললেন, 'অ্যাম সরি। সব সময় ডেলিভারি কেস অ্যাটেন্ড করতে করতে উই আর লাইক ফায়ার ব্রিগেডস।'

লম্বা পা ফেলে সেনগুপ্তের সামনে এগিয়ে গিয়ে বললেন, 'হোয়্যার ইজ দি পেশেন্ট?'

সেনগুপ্ত বললেন, 'সিটিং বিফোর।'

সেন বললেন, 'শুয়ে পড়ুন' এবং সকলে হেসে উঠলেন। ভঞ্জ হাসলেন খ্যাঁত খ্যাঁত করে, চৌধুরী হাসলেন খিক খিক করে। হাসলেন না কেবল ঘোষাল আর নিয়োগী। সেন নিয়োগীকে 'সরি' বলে বসে পড়লেন। ঘোষাল ফিরে এলেন। দেখতে দেখতে ঘর ভরে গেল। সেনগুপ্ত বাড়তি চেয়ার আনালেন। আবার কফির হুকুম হল।

॥ ৩ ॥

'মিত্র।' সেনগুপ্ত লাইব্রেরীয়ান মিত্রর দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন। কফি খেতে খেতে পরস্পর পরস্পরের সঙ্গে কথা বলছেন। মাঝে মধ্যে একটু হাসি। রুম কুলারে স্লাইড খুলে যাবার ঝড়াস শব্দ। থেকে থেকে ভঞ্জের নস্যি টানার প্রবল সোঁ। সেনগুপ্ত এতক্ষণ অন্য কি একটা জরুরি ফাইলে মুখ ডুবিয়ে ছিলেন। মিত্র মিস নিয়োগীর সঙ্গে কথা বলছিলেন। 'স্যার' বলে তটস্থ হলেন।

'তুমি উইদিন ওয়ান আওয়ার আমাকে একটা ব্রিফ নোট সাবমিট করবে—ঢেঁকির ইতিহাস। আমাদের জীবনে কোন্ সময় থেকে ঢেঁকি ঢুকেছে, মেগাস্থিনিস কি মার্কোপোলো, পাল কি সেন রাজা, বেদের কাল কি তারও আগে, অশোকের শিলালিপিতে কিংবা অজন্তার গুহাচিত্রে, ঢেঁকির অরিজিনটা তোমাকে ট্রেস করতে হবে। কোথাও কোনো ফসিল পাওয়া গেছে কিনা?'

'ফসিল?' অ্যাগ্রির দাস যেন একটু অবাক হলেন। 'ফসিল তো শুনেছি প্রাণীর কিংবা গাছপালারই হয়, ঢেঁকির আবার ফসিল হয় নাকি? ঢেঁকির ফসিল মানে কার্বোনাইজড উড বা কয়লা।'

'চুপ করুন, কিসে কি হয় আপনার জানার কথা নয়। আপনি জানবেন কাটুই পোকা কিংবা ধ্বসা রোগ। ফসিল ইজ নট ইওর মিট।' সেনগুপ্ত দাসকে পাংচার করে মিত্রকে নিয়ে পড়লেন, 'যেমন করে পারো, ঢেঁকির আদ্যশ্রাদ্ধ আজই আমার চাই।'

'কোথায় পাবো স্যার? ডিউই ডেসিম্যাল ক্ল্যাসিফিকেশানে ঢেঁকি কোথায় পড়বে? ফাইভ হান্ড্রেড ওয়ান কি এইট হান্ড্রেড টোয়েন্টি থ্রি?'

'আমি কি করে বলব? আমি বলতে পারলে তোমাকে ডাকবো কেন? ফানি!'

'ঢেঁকিটা কি বলবেন তো? ফিজিক্স না মেকানিক্স না কেমিস্ট্রি না ফিলোজফি?'

'ঢেঁকি আবার কি? ঢেঁকি, ঢেঁকি।'

মিঃ চৌধুরী আর থাকতে না পেরে বলে ফেললেন, 'ঢেঁকি হল মেকানিক্স, আরকিয়োলজিও হতে পারে।'

লাইব্রেরীয়ান দাস বিষন্ন মুখে ঘর ছেড়ে চলে গেলেন। বিড় বিড় করে বললেন, 'শালার চাকরি।'

সেনগুপ্ত তীক্ষ্ন গলায় ডাকলেন, 'মিঃ মুখার্জি!' টুকটুকে চেহারার নিরীহ মত এক ভদ্রলোক মুখ তুলে চাইলেন। ফর্সা গালে একটা বড় আঁচিল। খদ্দরের পাঞ্জাবি আর ধুতিতে পুরোপুরি বাঙালী। সাহেবদের দলে একটা অস্বস্তি মাথা মুখ। মুখার্জি বললেন, 'বলুন স্যার।'

'হ্যান্ড পাউন্ডিং ইন ইওর ইনডাসট্রি। আই ওয়ান্ট ডিটেলস, ইকনমিক্স স্ট্যাটিসটিক্স এন্ড অল।'

'ঢেঁকি আর নেই স্যার। ঢেঁকি লাটে উঠেছে।'

'লাটে উঠলে তো চলবে না। লাট থেকে টেনে নামাতে হবে।'

'কি করে নামাবো স্যার? ঢেঁকির যুগ শেষ।'

'নতুন যুগের সূচনা করতে হবে মিঃ মুখার্জি। মিনিস্টার চাইছেন ঢেঁকি শিল্পের প্রসার ও কর্মসংস্থান। ঢেঁকি এ টুল ফর রুর‍্যাল ইকনমিক ডেভালাপ-মেন্ট।'

'ধান ছাড়াই ঢেঁকি?'

'মুখার্জি, আপনার বোধহয় জানা নেই এ দেশের প্রধান কৃষিপণ্য ধান্য।'

সেনগুপ্তর খোঁচাটা সকলেই বুঝলেন। মুখার্জি কি একটা বলতে যাচ্ছিলেন তার আগেই অ্যাগ্রিকালচারের দাস বলে উঠলেন, 'ধান্য, প্রধান কৃষিপণ্য বালকেও জানে, কিন্তু সেই ধান্য তো মাঠ থেকেই সরকারী গুদামে। লেভির কথাটা বোধহয় ভুলেই গেছেন। তারপর গোলা থেকে ধান যায় বড় বড় ধান কলে। তারপর সেই চাল আসে সরকারী হেফাজতে। সেখান থেকে যায় রেশানের দোকানে ফেয়ার প্রাইস শপে। পুরো ব্যাপারটার মধ্যে ঢেঁকির কোনো ভূমিকা নেই। নো পোটেনশিয়াল রোল।'

'দেন?' মিঃ সেনগুপ্ত বোকা বোকা মুখে সকলের দিকে তাকালেন।

খাদির মুখার্জি বললেন, 'আমাদের কিছু করার নেই স্যার। ঢেঁকি এখন স্বর্গে গিয়ে ধান ভানতে পারে, নট হিয়ার।'

'দ্যাটস ট্রু।' সেনগুপ্ত আপন মনে বললেন, তারপর কি ভেবে লাফিয়ে উঠলেন, 'বাট? কৃষকের ভাগের ধানটা যায় কোথায়?'

পঞ্চায়েতের বোস বললেন, 'বেশির ভাগটাই যায় হাস্কিং মিলে। এদিক ওদিক কিছু হয়তো ঢেঁকিতে ভেঙে নেয়।'

'সে ভাঙাকে তো আর ইনডাসট্রি বলা যায় না। নিজের ব্যবহারের জন্যে। তাহলে তো তোলা উনুনকেও ইনডাসট্রি বলতে হয়।' মুখার্জি গ্রামীণ শিল্পের তালিকা থেকে ঢেঁকিকে ছেঁটে দিলেন।

'চলবে না, আই ওণ্ট অ্যালাও দ্যাট।' সেনগুপ্ত চিৎকার করে উঠলেন। কি চলবে না, কেন চলবে না, কিসের উত্তেজনা কেউই বুঝলেন না। সকলে বোকার মত তাকিয়ে রইলেন। সেনগুপ্ত উত্তেজনা বজায় রেখে বললেন, 'কলে চাল আর তৈরি হবে না, যা হবে সব ঢেঁকিতে। ধুরন্ধর।'

'ইয়েস স্যার।' একপাশে বসে থাকা ধুরন্ধর মনোযোগী হয়ে উঠল।

'তুমি লিখবে, মায়ের দেওয়া মোটা কাপড় মাথায় তুলে নেরে ভাই।'

'কিন্তু স্যার, হচ্ছে চালের কথা, সেখানে মোটা কাপড় একটু ইরেলেভেণ্ট হয়ে যাবে না?'

'ছি ছি তোমার মত বুদ্ধিমান ছেলে এই কথা বললে। মোটা কাপড় কি শুধু মোটা কাপড়ই মিন করছে, ওর মধ্যে অব্যক্ত রয়েছে মোটা ঢেঁকি ছাঁটা চাল, পুকুরের জ্যান্ত মাছ, মাঠের ব্ল্যাক বেঙ্গল।'

'ব্ল্যাক বেঙ্গলটা কি স্যার?'

'দেশী ছাগলরে বাবা, শোনোনি কচি পাঁঠার গা-মাখা ঝোল? চ্যাটার্জি।'

নিউট্রিশানের চ্যাটার্জি বললেন, 'বলুন স্যার।'

'তুমি এই রিপোর্টে গোটা দুই প্যারা সাপ্লাই করবে অন নিউট্রিশানাল ভ্যালু অফ ঢেঁকি। কি ভাবে কল আমাদের সর্বনাশ করছে। পলিশড রাইস মানেই রাইস মাইনাস ভিটামিন বি। ভিটামিন বি মাইনাস মানেই বেরিবেরি, চোখ খারাপ, পা ফোলা। হার্টের বারোটা। যেমন সাদা ময়দা। যেমন চিনি। ময়দাকল আর চিনির কলও বন্ধ করে দিতে হবে।'

ফুডের ব্যানার্জি বললেন, 'তাহলে তো দেশের মানুষ না খেয়ে মরবে। লক্ষ লক্ষ মণ ধান ঢেঁকিতে ভাঙতে গেলে এই মিনিস্টির দফারফা হয়ে যাবে। দেশে রেভোলিউশান হয়ে যাবে মশাই।'

'আমরা কোটি কোটি ঢেঁকি বসাবো। লক্ষ লক্ষ পায়ের চাপে সেই ঢেঁকি দবারাত্র ধান ভানবে। গ্রামের মানুষের নাইবার খাবার সময় থাকবে না। খালি কাজ আর কাজ। ওঃ মিনিস্টার ঠিক জায়গায় হাত দিয়েছেন। গ্রামের একটা

মানুষও আর বেকার থাকবে না। টোটাল এম্পলয়মেণ্ট।'

অ্যাগ্রিকালচারের দাস বললেন, 'বন বিভাগ টুঁটি চেপে ধরবে। কোটি কোটি ঢেঁকির কাঠের জন্যে বন উজাড় হয়ে যাবে। দেশের ইকোলজিক্যাল ব্যালেন্স নষ্ট হবে। ভূমিক্ষয়, বন্যা কে ঠেকাবে মশাই?'

'সে রকম হলে লোহার ঢেঁকি তৈরি করব।'

'মরচে ধরবে।'

'স্টেনলেস স্টিলের করব।'

ডক্টর ঘোষাল বললেন, 'এক কিলো চালের দাম তখন দশ টাকা হবে। চাল তখন আর চাল থাকবে না, শুধুই ভিটামিন বি। দু চামচে গালে ফেলে এক গেলাস জল।'

'দশ টাকা হবে কেন?'

'স্লো প্রসেস, প্রোডাকশান কমে যাবে, দাম বেড়ে যাবে। ভেরি ন্যাচারাল।'

'ইন দ্যাট কেস ঢেঁকিকে মডার্নাইজ করবো। বল বেয়ারিং লাগিয়ে দেবো। প্রয়োজন হলে, এক হর্সপাওয়ারের ছোট ছোট মোটর ফিট করে দেবো।'

'বিদ্যুৎ?'

'বিদ্যুৎ চাই না। স্টিম কিংবা ডিজেলে চলবে।'

'তাহলে এমপ্লয়মেণ্ট। ঢেঁকি যদি আপনা-আপনিই চলতে থাকে তাহলে বেকারদের কি হবে?'

'তাও তো বটে! মহা মুশকিল দেখছি। জলে কুমির ডাঙায় বাঘ যে রে বাবা। কোন্ দিকে যাই?'

ফুডের ব্যানার্জি হাত নেড়ে নেড়ে বললেন, 'ওসব আইডিয়া ছাড়ুন। আপনার মিনিস্টারের কম্ম নয়। সেণ্ট্রাল পলিসি পাল্টাবার ক্ষমতা আমাদের নেই। আধুনিক চালকল, ময়দাকল সবই রাখতে হবে। ঢেঁকি একটা কিউরিওর মত, ঘর সাজাবার ডেকরেটিভ আইটেমের মত রাখতে পারেন। এগজিবিশানে দেখাতে পারেন। তার বেশি কিছু করতে পারবেন বলে মনে হয় না।'

'কি করি বলুন তো? মিনিস্টার যে একটা রিপোর্ট চাইলেন!' সেনগুপ্ত হাল ভাঙা নাবিকের মত হতাশ গলায় সিলিংয়ের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করলেন।

'লিখে ফেলুন, বেশ গুছিয়ে। আপনার অতসব ভাবার দরকার কি? হি ওয়াণ্টস এ রিপোর্ট, গিভ হিম এ রিপোর্ট।' দাস বেশ কাটা কাটা গলায় বললেন।

'শুধু শুধু খাটবো। জিনিসটা যখন দাঁড়াবেই না।' সেনগুপ্ত প্রায় চুপসেই

গেছেন।

'দাঁড়াবে না কেন? এভাবে না দাঁড়াক আর এক ভাবে দাঁড়াবে। শিল্পে না দাঁড়াক সংস্কৃতিতে দাঁড়াবে। ঢেঁকি ইনডাসট্রি না হয়ে ঢেঁকি কালচার হবে, ঢেঁকি স্পোর্টসও হতে পারে গ্রামীণ মানুষের স্বাস্থ্যরক্ষায়। প্রতিদিন আইন করে প্রত্যেকে ঘণ্টা পাঁচেক ঢেঁকিতে পাড় দেবে, কম্পালসারি। ধান থাকে ভালই, না থাকে হাওয়া কুটবে। দপ্তরটা কেবল পাল্টে যাবে। ঢেঁকি শিল্প থেকে স্বাস্থ্য দপ্তরে চলে যাবে। ঢেঁকি যোগও হতে পারে হঠযোগ। একভাবে, এক জায়গায় এক পদে স্থির থেকে হৃদ্স্পন্দনের সঙ্গে ঢেঁকির স্পন্দন বেঁধে দিয়ে, শ্বাস-প্রশ্বাসের তালে তালে ঢিকুস ঢিকুস, ঢিকুস। ভাবতে পারেন এর চেয়ে বড় যোগ আর কি হতে পাবে? চঞ্চল মন স্থির। অসীম একাগ্রতা। মাসখানেকেই মোক্ষলাভ। প্রতিটি ঢেঁকিশাল এক একটি সাধনপীঠ। আচ্ছা ঢেঁকি যাঁরা চালান তাঁদের কি বলা হবে?' দাস হঠাৎ আবেগে ব্রেক করে কুচকটালে একটা প্রশ্ন তুলে ধরলেন।

'কি বলা হবে মানে?' ভঞ্জ উত্তর দেবার আগে প্রশ্ন করলেন।

'যেমন কুম্ভ করে যে কুম্ভকাব, সেলাই কলে দর্জি, মেশিনে মিস্ত্রি, [illegible]নি ঢেঁকিতে কি?'

[illegible] পরীক্ষার হলের নিস্তব্ধতা নেমে এল। সকলেই ভাবছেন। বেশ একটা প্রতিযোগিতার ভাব। কে আগে জবাব দিতে, কে পারে আগে। দাস কেবল রিল্যাক্সড, কারণ তিনি এগজামিনার।

ভঞ্জ বাজি মাত করলেন, 'ঢেঁকিশালিকা।'

সকলে সমস্বরে উচ্চারণ করলেন, 'ঢেঁকিশালিকা!'

তারপর একটু আগে-পরে সকলেরই এক প্রশ্ন, কেন, কেন?

ভঞ্জ সংস্কৃতে সুপণ্ডিত। তিনি ব্যাখ্যা করলেন, 'ঢেঁকি যেখানে থাকে তাকে বলে ঢেঁকি-[illegible] [illegible]?'

সকলে মাথা নাড়লেন, 'ইয়েস অ্যাপ্রুভড।' ভঞ্জ ঘাড় নাড়া দেখে আর একটু এগোলেন, 'সেই ঢেঁকিশালের [illegible] মালিক, ইক প্রত্যয় [illegible] থটিক। তাহলে কি দাঁড়াচ্ছে, ঢেঁকিশাল প্লাস ইক, ঢে[illegible]। স্ত্রী লিঙ্গে আ ঢেঁকিশালিকা। সংস্কৃত জানা থাকলে নতুন শব্দ বের করতে কতক্ষণ। ম্যাটার অফ সেকেন্ডস।'

নতুন শব্দটা পেয়ে দাস আবার কাটা বক্তৃতা জোড়া লাগালেন, 'সেই

ঢেঁকিপীঠ থেকে বছরে বছরে সিন্ধ ঢেঁকিশালিক-শালিকারা বেরোলেন। তাঁরা আমাদের মত সাধারণ মানুষ নন। তাঁরা ধীর, স্থির, সংযমী জিতেন্দ্রিয়। তাঁদের চাওয়া নেই, পাওয়া নেই, আহার নেই, নিদ্রা নেই। মিনিমাম জৈব প্রয়োজন। সবরকম কনজামসান কমা মানেই, আমাদের সারপ্লাস। সারপ্লাস মানেই চাহিদার চেয়ে যোগান বেশি, তার মানে মূল্য পতন। যে নিজেকে জয় করেছে তার আবার কিসের চাকরি! সে তো রাজার ছেলেরে ভাই! রাজার ছেলের কি মাসোহারার অভাব হয়। দেশের এমত অবস্থায় চাষ বাড়ল কি কমল, শিল্প উৎপাদন হল কি হল না কাঁচকলা। বিক্ষোভ নেই, রাজনীতি নেই, ক্রাইম নেই, পিকপকেট নেই, স্ত্রী নেই, পরিবার নেই। শুধু চিদানন্দ শুধু চিদানন্দ। ফিরে চল বেদের যুগে, বেদান্তের যুগে। আমি চাই না মাগো রাজা হতে, রাজা হবার সাধ নাই মা চিতে। ঢেঁকির গা বেয়ে ধুনোর মত, রবারের মত গড়িয়ে পড়ছে স্বদেশী চেতনা। বল ঢেঁকি আমার মা। নিন আপনার রিপোর্টের ইন্ট্রোডাকসান—ঢেন্কি ইন এ নিউ লাইট। বাকিটা ভেরি ইজি।' দাস হাসি হাসি মুখে সিগারেট ধরালেন।

সেনগুপ্ত অবাক হয়ে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বললেন: 'ব্রিলিয়েন্ট দাস, সিম্পলি ব্রিলিয়েন্ট। ধুরন্ধর লিখে ফেল, তা না হলে হারিয়ে যাবে। উইল বি লস্ট ইন দি ইথার।'

॥ ৪ ॥

ধুরন্ধর তার স্বভাবসিদ্ধ ঢঙে এবং অক্লেশে প্রায় নিমেষে একটি রিপোর্ট তৈরি করে ফেলল। সে যখন রিপোর্ট লেখায় ব্যস্ত তখন বিভিন্ন দপ্তরের অধিকর্তারা বড় বড় ক্লাবে স্যাণ্ডউইচ সহযোগে অনেক টাকা কেজির ভুরভুরে চা খেলেন। নিজেদের মাইনে কি করে আরো বাড়ানো [illegible] জনপ্রিয়[illegible]। ধুরন্ধর এক জায়গায় আটকে গিয়েছিল ঢেঁকির পরিসংখ্যানে। সংখ্যাবিদ্ চৌধুরী সমস্যা সমাধান করে দিলেন। ধুরন্ধরকে [illegible] করলেন, '[illegible] সংখ্যা কত?'

ধুরন্ধর বললে, 'কয়েক কোটি।' সঠিক সংখ্যাটা জানা ছিল না।

'কত পারসেন্ট গ্রামে থাকে?'

'সিক্সটি ফাইভ পারসেন্ট।'

'তাহলে গ্রামবাসীর সংখ্যা কত?'

'কয়েক কোটি।'

'এভারেজ ফ্যামিলি সাইজ পাঁচ হলে ঢেঁকির সংখ্যা কত? ধরুন প্রতি পাঁচজনে একটা ঢেঁকি।'

'কয়েক কোটি ডিভাইডেড বাই পাঁচ ইজ ইকোয়াল টু কয়েক লক্ষ।'

'রাইট। কয়েক লক্ষ ঢেঁকি।'

ধুবন্ধর রিপোর্টটা শেষ করল এই ভাবে:

ঢেঁকি স্বর্গে গেলেও ধান ভানে। ধান ভানার জন্যেই তার জন্ম। ঢেঁকির সেই পবিত্র কর্তব্য থেকে ঢেঁকিকে যাঁরা বিচ্যুত করতে চান তাঁরা শুধু ঢেঁকির শত্রু নন, দেশেরও শত্রু। গ্রামবধূর ঘরে ঘরে ঢেঁকি কেন আলস্যের শয্যায়! তার জঠরে কেন ঘূণ পোকার কর্কশ আর্তনাদ! নিস্তব্ধ মধ্যাহ্নে কোথায় সেই হৃদয়ের শব্দ! চাষ আছে, ধান আছে, কৃষক আছে, কৃষকবধূ আছে, তবু ঢেঁকি কেন কোমল চরণপাতে দামাল ছেলের মত ধুপধাপ করে না! ঢেঁকিকে কারা আজ জরাগ্রস্ত বৃদ্ধার মত দাওয়ার এক-পাশে অবহেলায় বসিয়ে রেখেছে। এমন একটা শক্তিশালী যন্ত্রের চূর্ণ-বিচূর্ণ করার ক্ষমতা হরণ করে কারা তাকে সামান্য একটি কাষ্ঠখণ্ডের উপহাসে পরিণত করেছে! কারণ অনুসন্ধান করতে হবে। অপরাধীদের গাছের ডালে ডালে ঝোলাতে হবে। ডালে ঝোলাই এদের উপযুক্ত শাস্তি। এর জন্যে প্রয়োজন হাইকোর্টের কোনো বিচারককে নিয়ে উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন একটি কমিটি বসাতে হবে, যার বিচার্য বিষয়:

(১) ঢেঁকি, অতীত ও বর্তমান (২) ঢেঁকির উচ্ছেদে রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র (৩) ধনতন্ত্রের চাপ (৪) বেকার সমস্যা সমাধানে ঢেঁকি (৫) ঢেঁকি ও ব্যায়াম (৬) আত্মরক্ষায় ঢেঁকি (৭) ঢেঁকি ও আগামীদিনের আশানন্দ (৮) ঢেঁকি ও মানুষের পদবী (৯) কাব্য ও সাহিত্যে ঢেঁকি (১০) ঢেঁকির ধর্ম (১১) ধর্মের ঢেঁকি (১২) অধার্মিক ঢেঁকি (১৩) ঢেঁকি সংস্কৃতি (১৪) জাতীয় জাগরণের হাতিয়ার ঢেঁকি।

বুধবার। সকাল দশটা তিরিশ মিনিট। চারদিকে ঝলমলে রোদ। আকাশে শরৎ-শরৎ ভাব। ট্রাম বাস মিনিবাস অফিসপাড়ায় লোক উগরে দিয়ে চলে যাচ্ছে। পিল পিল করে পিঁপড়ের সারির মত মানুষ চলেছে।

সবুজ হচ্ছে। মিঃ সেনগুপ্ত ও তাঁর দলবল করিডর ধরে এগিয়ে আসছেন। সবার আগে সেনগুপ্ত। তাঁর হাতে একটি সুদৃশ্য ফাইল ফ্ল্যাপ দিয়ে বাঁধা। সকলেরই বেশ তাজা চেহারা। সবে স্নান বসেছেন। দিনটিও বেশ তাজা। শীতল বাতাস বইছে।

মন্ত্রীর ঘরের বাইরে বাঙলায় লেখা নামের ফলক। ঢিলঢিলে কাটা দরজা। নীল রঙ। ওপরে সুদৃশ্য কাঁচ। মন্ত্রীর ঘরের বাইরে বসেন পি-এস, পি-এ, সি-এ। তুড়ুক তুড়ুক করে টাইপ রাইটার শব্দ করছে। কাটা দরজার সামনে এসে সেনগুপ্ত ঘুরে দাঁড়িয়ে হাত তুলে ইসারায় তাঁর বাহিনীকে বললেন, 'হল্ট।' সকলে দাঁড়িয়ে পড়লেন। সকলের ভিতরে যাবার প্রয়োজন নেই। সেনগুপ্ত একলা যাবেন। ফাইলটাকে বগলে বাগিয়ে ধরে একটা চিতাবাঘের মত কাটা দরজা গলে সেনগুপ্ত ঢুকে পড়লেন। পি-এ টাইপ-রাইটার থেকে মুখ তুলে তাকালেন। সেনগুপ্ত হাসি হাসি মুখে চোখের তারা দুটোকে ওপর নিচে নামিয়ে বোঝাতে চাইলেন মন্ত্রী আছেন কিনা। পি-এ তুড়ুক তুড়ুক করতে করতে ঘাড় নাড়লেন অর্থাৎ আছেন।

সেনগুপ্ত তখন ভীষণ অসুস্থ রুগীর ঘরের দরজা যেভাবে খোলে সেই ভাবে আলতো হাতের চাপে দরজাটা ঈষৎ ফাঁক করে চোখ দুটো রাখলেন। পরক্ষণেই সোজা হয়ে বগলের ফাইলটাকে ঘুরিয়ে বগলে [illegible] ধরলেন। জামাটা [illegible] ঠিক করলেন। বারকতক ঢোক গিললেন। তারপর দরজাটা যতদূর সম্ভব কম ফাঁক করে ঘরে সেঁদিয়ে গেলেন।

ঘোষালের পাইপ ধোঁয়া ছাড়ছে। চৌধুরীর সিগারেট অল্প ধোঁয়া ছাড়ছে। ভঞ্জর পায়ের তলায় নস্যির গুঁড়ো জমছে। ওদিকে ধুরন্ধর ভিড়ের বাসে বাদুড়ের মত ঝুলছে! মিস নিয়োগী ঘড়ি দেখছেন। প্রায় পনের মিনিট হল। টাইপরাইটার অনবরত তড়পাচ্ছে। হঠাৎ ঝড়ের বেগে সেনগুপ্ত বেরিয়ে এলেন। কারুর সঙ্গে কোনো কথা নেই। বগলে সেই সুদৃশ্য ফাইল। যেদিক থেকে এসেছিলেন সেইদিকেই হেঁটে চললেন গটগট করে। মেজর জেনারেলের মত। দলবল পেছনে।

নিজের ঘরে ঢুকেই ফাইলটা ছুড়ে ফেলে দিলেন টেবিলের ওপরে। চেয়ারটা টেবিলের বিপরীত দিকে ঘুরে ছিল। সোজা করে নিয়ে ধপ করে বসেই একসঙ্গে তিনটে বোতাম টিপলেন। পি-এ আর পিওন প্রায় একসঙ্গেই

'কফি। টেক ডাউন। টু অল ডি-এ্যাম। ইমিডিয়েটলি সেণ্ট রিপোর্টস অন পোলট্রি এণ্ড ডেয়ারী। অ্যাসেস দি ম্যাকসিমাম অ্যাভেলেবিলিটি অফ গ্রীন গ্রাস। মার্ক আউট গ্রেজিং গ্রাউন্ড উইথ আমিনস। কিপ রেডি অল দি বার্ড ক্যাচারস ফর ক্যাচিং ওয়াইলড ফাউলস। কিল অল ফকসেস এণ্ড জ্যাকলস। টপ প্রায়রিটি ইমিডিয়েট থ্রি টাইমস আরজেণ্ট। টেলেকস।'

সেকসন অফিসার ঢুকলেন। সেনগুপ্ত কোন রকম ভূমিকা না করেই বললেন, 'অ্যাগ্রির দাস অ্যানিম্যাল হাজবেণ্ড্রির বোস ফুডের ব্যানার্জি ফরেস্টের কাণ্ডসারি। যে যে অবস্থায় আছেন এখুনি আসতে বলুন। ইয়েস ধুরন্ধর, মিনিস্টারস অর্ডার। সেকসান অফিসার প্রায় দৌড়ে বেরিয়ে গেলেন। সেনগুপ্ত কফির কাপে চুমুক দিয়ে বললেন, 'ইউ আর অল ট্রেটারস। বিভীষণ। আপনাদের পয়েন্ট আউট করা উচিত ছিল, ঢেঁকি ধান ছাড়াও কুঁড়ো কুটতে পারে, ঘাস থেঁতো করতে পারে, এনিথিং চূর্ণ-বিচূর্ণ করতে পারে। আই সে এগেন এণ্ড এগেন, ইউ আর অল সিলি টু দি পাওয়ার ইনফিনিটি।'

পাইপ মুখে ঘোষাল উঠে দাঁড়ালেন।

সেনগুপ্ত বললেনঃ 'নো মোর ওয়াক আউট। ওসব চালাকি আর চলবে না। দোজ ডেজ আর গন। মন্ত্রী বলেছেন, গ্রামে গ্রামে পোলট্রি আর ডেয়ারী করতে হবে। এ পোলট্রি সে পোলট্রি নয় স্যার। লেগহর্ন, রোড আইল্যান্ড, নো সাহেব মুরগী। নির্ভেজাল বনমুরগী ধরে আনতে হবে। ঢেঁকিছাঁটা কুঁড়ো বোনমিল, ভিটামিন ট্যাবলেট হ্যানাত্যানা দিয়ে ঘরে ঘরে ফিড তৈরি হবে। মুরগী দিয়ে গরু দিয়ে, ডিম দিয়ে দুধ দিয়ে গ্রাম জাগাতে হবে। এ ভোলানাথ সে ভোলানাথ নয় রে বাবা। চুপ করে বসুন। লেট ধুরন্ধর কাম। সুন্দর করে রিপোর্টটা লিখে ফেলি।'

পি.এ.

উচ্চতায় মাঝারি।
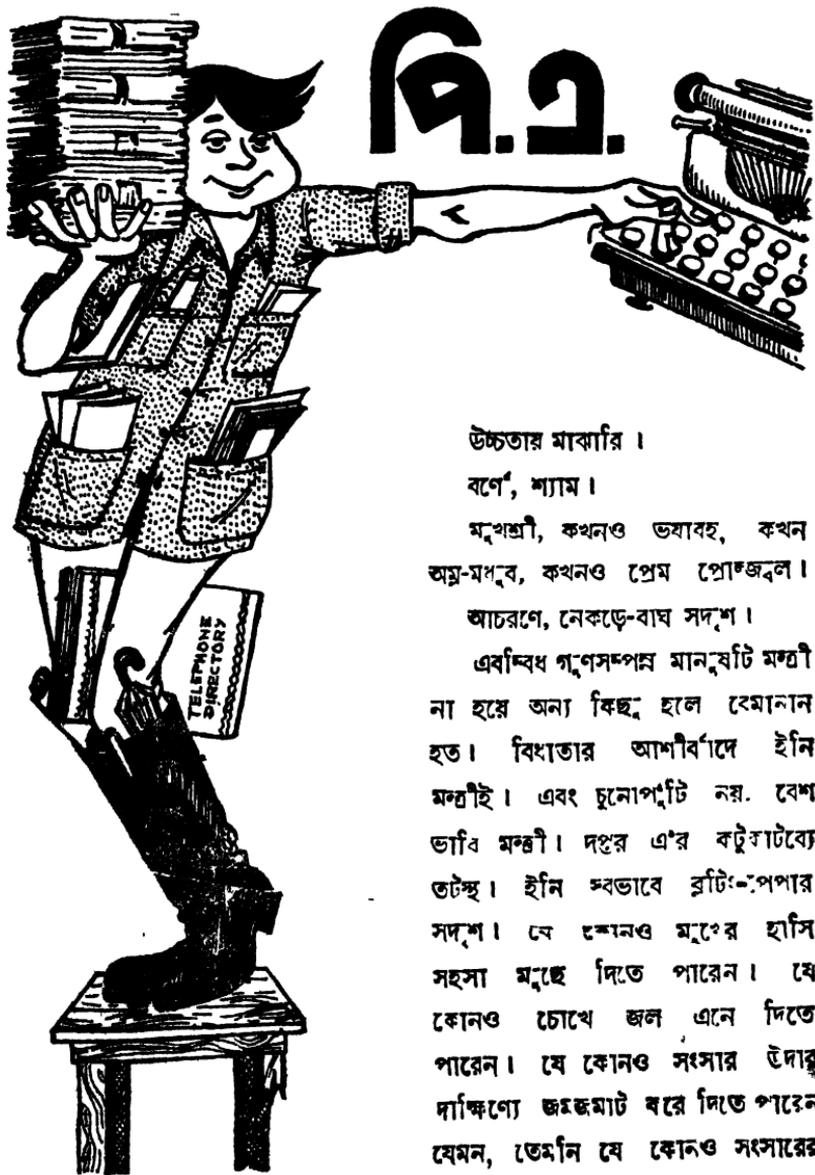
বর্ণে, শ্যাম।

মুখশ্রী, কখনও ভয়াবহ, কখন অম্ল-মধুর, কখনও প্রেম প্রোজ্জ্বল।

আচরণে, নেকড়ে-বাঘ সদৃশ।

এবম্বিধ গুণসম্পন্ন মানুষটি মন্ত্রী না হয়ে অন্য কিছু হলে বেমানান হত। বিধাতার আশীর্বাদে ইনি মন্ত্রীই। এবং চুনোপুঁটি নয়. বেশ ভারি মন্ত্রী। দপ্তর এঁর কটুকাটব্যে তটস্থ। ইনি স্বভাবে ব্লটিং-পেপার সদৃশ। যে কোনও মুখের হাসি সহসা মুছে দিতে পারেন। যে কোনও চোখে জল এনে দিতে পারেন। যে কোনও সংসার উদার দাক্ষিণ্যে জমজমাট করে দিতে পারেন যেমন, তেমনি যে কোনও সংসারের

ভিটের জোড়া বন্ধুও চাঁরয়ে দিতে পারেন। ইনি কখনও বরা কখনও খরা।

'আমায় ভয় পায়'। এই ভেবেই তাঁর আনন্দ। 'আমি টেরিবল'। এই প্রসাদগুণেই ইনি সুখ্যাত। এ হেন একজন দুরন্ত মন্ত্রীর দপ্তরে শ্যামাচরণ পি-এ হবার সৌভাগ্য নিয়ে আদি সপ্তগ্রামে জন্মগ্রহণ করেছিল উনিশশো ছত্রিশ সালের কোনও এক মাসে। তখন সে জানত না তার ভাগ্যে কি লেখা আছে। যখন জানল তখন আর পালাবার পথ নেই। বঙ্কিমবাবু বি-এ পাশ করে ডেপুটি হয়েছিলেন। শ্যামাচরণ বিশ্ব-বিদ্যালয় গুলে খেয়ে এ দপ্তর সে দপ্তরে হাত ফেরতা হতে হতে খোদ মন্ত্রীর দপ্তরে পি-এ হয়ে বসেছে। সিনিয়ররা [illegible]লেন, বরাত তোমার ভাল শ্যামাচরণ। হলে খুব হবে না হলে হেলে [illegible]। জিনিসটা বেশ ভালই। ট্যাকল করতে পারলেই টাকা। না [illegible] সেই ফাঁকা। সার্কাসের সেই তন্বী মহিলাটিকে স্মরণ কর, যে ব[illegible] সিংহের গলা জড়িয়ে ধরে গোঁফে চুমু খায়। এও সেই একই পন্থ[illegible] —টোমং এ লিও।

সার্কাসের সিংহ [illegible]র মৌতাতে থাকে। মন্ত্রী থাকেন ক্ষমতার টাটে। বিলিতি ক[illegible]র ঘূর্ণায়মান ক্যাচোর ক্যাঁচোর চেয়ারে। গদির ওপর গদি [illegible]দেশ বড়ই স্পর্শকাতর)। সামনে অশ্বখুরাকৃতি ডবল ডেকার টেবিল। ঝকঝকে চকচকে। ব্র্যাসো দিয়ে মাজা পেতলের পেপারওয়েট মুণ্ডিতোলা সারি সারি। যেন ক্ষমতার বোতাম। মেজাজের মুরগী ঘড়ি। ঠকাস ঠকাস করে ঠুকে কাগজে চাপা দিলে অরডারলি পিওন বুঝতে পারে মালিক কাপুরের মেজাজ চড়ে আছে। টুকুস টুকুস করে নাড়াচাড়া করলে বুঝতে পারে মন্ত্রী-মহোদয় এখন খেলোয়াড়ী মেজাজে আছেন। ঘরজোড়া নরম কার্পেট। পা ডুবে যায়। প্রিয়দর্শিনী টেলিফোনের সারি। কখনও একটা বাজে কখনও সবকটা [illegible]লের শিশুর মত কঁকিয়ে ওঠে। ফোন বাজার দাপট দেখলে দেশের [illegible]রিস্থিতি বোঝা যায়। যখন মৃদু মৃদু একটি কি দুটি রিং রিং রিরিং রং করে, তখন বুঝতে হবে বিরোধীরা শান্ত, লাশটাশ তেমন পড়ছে না, ঝাণ্ডা তেমন উড়ছে না, মিছিল রাজপথে তেমন পাক মেরে মেরে ঘরমুখো অফিস যাত্রীদের পাক-দণ্ডীতে বেঁধে ফেলছে না, বিধানসভায় জুতো ঝাঁটা লাথি চলছে না। শিবিরে শিবিরে বিরাজ করছে সমঝোতার শান্তি। ফোনে তখন প্যানপেনে প্রেমের বুলি। কিন্তু লাল, গোলাপী, নীল সবকটাই যখন তেড়েফুঁড়ে বাজতে থাকে, যখন এ কানে একটা ও কানে একটা, দু কাঁধে দুটো সরব সপ্তগ্রামে, তখন বুঝতে হবে গেল গেল অবস্থা। গদি করে টলমল পসরাতে ওঠে জল।

আজ সেইরকম একটা দিন। মন্ত্রীর কানে লাল টেলিফোন। তিনি খ্যাসে-খ্যাসে গলায় ওপ্রান্তের মানুষটিকে বেজায় ধমকাচ্ছেন। কথায় সামান্য গ্রাম্য টান। সেই টানটাকে সযত্নে ধরে রেখেছেন কারণ তিনি মনে করেন—তিনি জনতার প্রতিনিধি। ঠাণ্ডা ঘরে কাঁচ মোড়া টেবিলে টাট সাজিয়ে বসে থাকলেও তিনি আছেন মৃত্তিকার কাছাকাছি, তাঁদের সেবক দাসানুদাস হয়ে।

মন্ত্রী বলছেন—দাঁত মেলছো মনে হচ্ছে। (ও প্রান্তে যিনি তিনি বোধহয় হে হে করে হাসির ভাব এনেছিলেন কথায়। ডাক্তারী ভাষায় এ ব্যাধিকে বলে ম্যান প্রকসিমিটি রিফ্লেকস। অনেকের যেমন বাইরে যাবার নাম শুনলেই নিম্নবেগ । বড় মানুষের সামনা সামনি হলেই অনেকে অজান্তেই হাত কচলাতে থাকেন অ। দিয়ে হেং হেং করে বিচিত্র শব্দ ক্ষেপণ করতে থাকেন। মুখের চেহারা হয় কুমোরের র কাঁচা মুখ মাটিতে জোর করে থেবড়ে বসিয়ে দিলে যেরকম হবে, সেই রকম) ওই আমি একটা করে খুলে স্যাপারেট পার্সেল করে তোমার বউয়ের কাছে পাঠিয়ে ট বামজাদা। মালা করে পরবে। মানকে। মানকে বড় না আমি বড় শুয়োর ? সেই ভদ্রসন্তানকে শুয়োর বলে ঝপাং করে ফোন ফেলে দিয়ে পায়ের কাছে বোতামে চা ।

শ্যামাচরণের মাথার ওপর লাল আলো দুরুদুরু করে জ্বলে উঠল। শ্যামা-চরণ স্টেনোর সঙ্গে হেসে হেসে কথা বলছিল হাসি ফিউজ হয়ে গেল। পেটে মৌরলা মাছের ঝোল পাক খেয়ে উঠল অ্যাকোয়ারিয়ামের মাছের মত (শ্যামাচরণ হালে বিয়ে করেছে। নতুন বউ স্মৃতিশক্তি বাড়াবার জন্যে ইদানীং বঙ্গসন্তান-টিকে মৌরলা মাছের ঝোল সেবন করাচ্ছেন। মন্ত্রীর পি-এ। ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে স্মৃতি আর শ্রুতির ওপর। মন্ত্রীর নেকনজরে হয় প্রোমোশান না হয় লিকুইডেশান। এখন স্বামী আমার রং চটা পতপতে তেরপল ঢাকা জিপে অফিস যায়। মই বেয়ে আর একটু উঠতে পারলেই মোটর গাড়ি। ফোন হবে। [illegible] হবে, ট্যুর হবে, টি-এ হবে।)

শ্যামাচরণ হিলহিলে ঠাণ্ডাঘরে ঢুকল। মন্ত্রী তখন দু দাঁতের মাঝে একটা টুথপিক ধরে তিরতির করে নাচাচ্ছেন। টেবিলের ওপর হাতের চেটো আঙুল নিয়ে খেলছে। শ্যামাচরণ ঢুকতেই মন্ত্রী টেনে টেনে বললেন—শুয়োরের বাচ্চা।

শ্যামাচরণ বলল—ইয়েস স্যার (কেরিয়ার গাইড বলছে—ডোণ্ট প্রোটেস্ট এ মিনিস্টার। অ্যাকসেপ্ট এভরিথিং অ্যাজ অমৃতং কালমন্ত্রী ভাষিতং।)

মন্ত্রী বললেন—বাঁশ দেবো। আছোলা বাঁশ।

শ্যামাচরণ ঃ ইয়েস স্যার।

মন্ত্রী ঃ দিল্লী থেকে বাঁশ আনব।

শ্যামাচরণ ঃ ইয়েস স্যার।

মন্ত্রী ঃ ইউ আর এ ফুল।

শ্যামাচরণ ঃ ইয়েস স্যার!

মন্ত্রী ঃ আজই আমি দিল্লী যাব।

শ্যামাচরণ ঃ ইয়েস স্যার (কেরিয়ার গাইড বলছে, ট্যাকল এ মিনিস্টার উইথ লিমিটেড ভোকাবুলারি। প্লে ক্লেভারলি উইথ টু ওয়ারডস—ইয়েস অ্যান্ড স্যার। প্লেস ইট বিফোর প্লেস ইট আফটার, পাঞ্চ ইট হিযার পাঞ্চ ইট দেয়ার অ্যাজ অফন অ্যাজ ইউ গেট ইওর চানস। হোয়েন ইউ লিভ দেয়ার শুড বিমেন নাথিং বাট ইয়েস অ্যান্ড স্যার।)

মন্ত্রী ঃ কিসে যাব?

শ্যামাচরণ ঃ প্লেনে নয় স্যার ট্রেনে।

মন্ত্রী ঃ কেন ট্রেনে?

শ্যামাচরণ ঃ অ্যাস্ট্রলজার অ্যাডভাইস দিয়েছেন স্যার প্লেনে স্যার গেলে স্যার অ্যাকসিডেন্ট হবে স্যার।

মন্ত্রী ঃ রাজধানীর টিকিট চাই। দাঁড়িয়ে আছ কেন? যাও এখুনি যোগাড় কর। (সুর করে) ইডিয়েট।

শ্যামাচরণ ঃ ইয়েস স্যার।

প্যান্টটাকে ভুঁড়িতে বেল্ট ধরে টাইট করে শ্যামাচরণ চুকিত কিত করে ছুটল রাজধানীর টিকিট যোগাড়ে। ভি আই পি কোটা বললেই তো হল না, ভি আই পি-র সংখ্যা কম নাকি? একটা ট্রেন অনেক ভি আই পি। শ্যামাচরণের মন্ত্রী, অন্যের তো তিনি মন্ত্রী নন। হু বেয়ারস হুম? তোমার মন্ত্রী তুমি মাথায় করে দিল্লী নিয়ে যাও। এ যেন তোমার বউ তুমি ম্যাও সামলাও। শ্যামাচরণ অতি কষ্টে কান ধরে ওঠ বোস করে পাঁচটা সিমেন্টের টোপ ফেলে একটা টিকিট ম্যানেজ করল। কেরিয়ার গাইড বলছে, স্ত্রীকে এবং মন্ত্রীকে জীবন দিয়েও সন্তুষ্ট রাখবে। আর প্রমিস? প্রমিস ইজ এ থিং হুইচ ইউ আর নেভার এক্সপেক্টেড টু ফুলফিল। মন্ত্রীদের কেরিয়ার তো অঙ্গীকারের শত শত স্তূপের ওপরেই। হাসছে, খেলছে,

ভাঙছে, জুড়ছে।

মন্ত্রী বললেন, টিকিট পেয়েছ?

শ্যামাচরণ: পেয়েছি স্যার।

মন্ত্রী: সিকিউরিটিকে জানিয়ে রাখ। আমার ব্যাগেজ রেডি কর।

জনতার সেবক হলেও জনতা মন্ত্রীর সেবক নাও হতে পারে। হাতের কাছে হ্যান্ডি কিছু পেয়ে ছুঁড়ে মেরে দিতেও পারে। তখন? ক্ষতি তো দেশেরই হবে। মন্ত্রীর আর কি? তিনি মরে ভূত হবেন। কে বলে মন্ত্রীর উপদ্রবের চেয়ে ভূতের উপদ্রব ভাল। তাদের কোনও ধারণা নেই। শ্যামাচরণের আছে। সে দেখেছে কোনও মন্ত্রী তাঁর পি এ-কে মনে মনে অথবা সশব্দে একশো আটবার মনুষ্যেতর প্রাণীতে সম্বোধন করলেই একটি প্রোমোশান। তার অর্থ কি তাহলে দুধ মেরে যেমন ক্ষীর পশুত্ব ঘন হলেই একটি উচ্চপদ। শ্যামাচরণ চা খেয়ে চেয়ারে চিতিয়ে পড়ল। ভুঁড়িটা এগিয়ে গেল সামনের দিকে।

এদিকে বেলা বাড়ছে। আকাশে ঘন মেঘ। এল বুঝি বৃষ্টি। লাঞ্চের সময় শুরু হল শহর ভাসান বৃষ্টি। মন্ত্রী আর পি-এ যখন রাস্তায় নামলেন তখন রাজপথের যা অবস্থা, তাতে আর মোটর নয় স্পিডবোট চলতে পারে।

মন্ত্রী তাল ঠুকে বললেন, তোমাদের ষড়যন্ত্র।

শ্যামাচরণ ইয়েস স্যার বলতে গিয়েও সামলে নিল। নো স্যার।

মন্ত্রী: তোমরা জানতে আমি আজ দিল্লী যাব।

শ্যামাচরণ: ইয়েস স্যার।

মন্ত্রী: তবে নো স্যার বললে কোন আক্কেলে অ্যাঁ। খোদার খাসি।

শ্যামাচরণ: ইয়েস স্যার।

মন্ত্রী: তোমরা আমাকে স্টেশনে পৌঁছে দেবে যেভাবেই হোক। আই মাস্ট ক্যাচ দি ট্রেন।

মন্ত্রী উঠলেন গাড়িতে। পেছনের আসনে তিনি। সামনে সিকিউরিটি আর পি এ শ্যামাচরণ। গাড়ি চলছে স্টেশনের দিকে। মন্ত্রী ড্রাইভারকে ধমকাচ্ছেন, ট্রেন যদি ধরাতে না পারিস তোকে আমি বিরোধী বলে বরখাস্ত করবো। ষড়যন্ত্র। আই নো হু আর বিহাইন্ড দিস। এর পেছনে আমার দলের ফ্যাকসান আছে আর আছে অপোজিশান। ড্রাইভার মনে মনে বললে, অপোজিশান হল ঈশ্বর স্যার। মন্ত্রী শুয়োরের বাচ্চা, শুয়োরের বাচ্চা জপ

করতে করতে প্রমন্ত্রীর মুণ্ডপাত করতে লাগলেন। জপাৎ সিদ্ধি। কিছুক্ষণের মধ্যেই তাঁর মনে হল সারা শহরে এক হাঁটু নোঙরা জলে থই থই করছে পালপাল শুয়োর। একটা দাড়িঅলা শুয়োর একটা লরি চালিয়ে তার গাড়ির সামনে পথরোধ করে দাঁড়িয়েছে।

মন্ত্রী ড্রাইভারকে বললেন, সাইরেন লাগাও। হঠাৎ তাঁর মনে হল গাড়ির সামনে পতাকা লাগান হয়নি। হোয়াট? ষড়যন্ত্র! শ্যামাচরণ! গো। গেট দি ফ্ল্যাগ। রাসকেল।

ভগবান বাঁচালেন। ফ্ল্যাগ গাড়িতেই ছিল। এক কোমর জলে নেমে শ্যামাচরণ পতাকাদণ্ডে পতাকা পরাল! ঘন ঘন সাইরেন, দণ্ডে জলে ভেজা পতাকা, মন্ত্রীর শুকরোক্তি, সিকিউরিটির চড়চাপড় কোনও কিছুতেই জ্যাম খুলল না। মন্ত্রী মনে মনে তিনজন ব্যক্তিকে বরখাস্ত করে ফেললেন। তার মধ্যে সাদা বর্ষাতি মোড়া ট্রাফিক পুলিশটিও পড়ল। প্রমন্ত্রী যে তার অ্যাণ্টি গ্রুপে সে সত্যটিও জলমগ্ন রাস্তায় গাড়িতে বসে তাঁর খেয়াল হল। মনে মনে বললেন, আই উইল সি। সি শব্দটি মনে আসতেই হাত ঘুরিয়ে ঘড়ি দেখলেন। আর মাত্র পঁচিশ মিনিট। শ্যামাচরণ।

ইয়েস স্যার।

নেমে পড়।

শ্যামাচরণ জলে নামল। নেমেই বুঝল চাকরির জল কত ঘোলা।

মন্ত্রী—দৌড়ও। তুমি গিয়ে ট্রেন ধরে রাখো। গার্ডকে বল মিনিস্টার আসছেন। গোও।

শ্যামাচরণ সেই হাঁটু জলে হাঁচর পাঁচর করে দৌড়তে শুরু করল। উঃ ভুঁড়িটাই এখন দেখছি কাল হল। লরির ফাঁক গলে, ট্রামের পাশ দিয়ে, রিকশার কোল, গলি খানাখন্দ পেরিয়ে পি-এ ছুটছে।

হাওড়া স্টেশান। গার্ড সায়েব বাঁশি মেরেছেন। পতাকা ঝটাপট করছে। ট্রেন ছাড়ল বলে। কাকভেজা একটি লোক ইঞ্জিনের চেয়েও বেশি হাঁপাতে হাঁপাতে সটান তাঁর পায়ে এসে পড়ল।

শ্যামাচরণঃ স্টপ, স্টপ, মিনিস্টার ইজ কামিং।

গার্ডসায়েব তলায় পড়ে থাকা মানুষটিকে দেখলেন। প্ল্যাটফর্মেও পুলিসের আয়োজন ছিল, যেহেতু মন্ত্রী যাবেন। শ্যামাচরণ জ্ঞান হারাবার আগে পরিষ্কার বাংলায় বলল, বাঁচান, গাড়ি থামান, মন্ত্রী আসছেন। আমি তাঁর পি-এ।

গাড়ি লেগে রইল। পুলিশ তৎপর হল। আসছেন, তিনি আসছেন। কামরায় কামরায় অসন্তুষ্ট যাত্রী। কে হরিদাস পাল। অবশ্য তাঁরা জানতেই পারলেন না, কেন ট্রেন ছাড়ছে না। গার্ডসাহেব বললেন, টেকনিক্যাল প্রবলেম।

হঠাৎ পুলিশবাহিনী সজাগ হয়ে অ্যাটেনসানের ভঙ্গিতে দাঁড়াল। একটি মাঝারি উচ্চতার পাজামা পাঞ্জাবী পরা মানুষ গটগট করে এগিয়ে এসে প্ল্যাটফর্মে ঢুকলেন। পি-এ শ্যামাচরণ সবে তখন জ্ঞান ফিরে পেয়েছে। শীতে কাঁপতে কাঁপতে ফাইলে নোট লেখার ভাষায় বললে—ডান স্যার, অ্যাজ ডাইরেকটেড।

মন্ত্রী চলমান গাড়ির জানালা থেকে স্নেহের গলায় বললেন, আই উইল সি।

উপসংহারঃ সত্যিই তিনি দেখেছিলেন। শ্যামাচরণ মাছের মত জল কাটতে পারে। হি হ্যাজ প্রুভড ইট। শ্যামাচরণকে মৎস্য বিভাগের উচ্চ-পদে রেখে মন্ত্রী আই উইল সি করলেন। শ্যামাচরণ দম্পতি সেই প্রবাদ-বাক্যের বিপরীত উদাহরণের মত লেখাপড়া শিখেও মৎস্য ধরিতে লাগিলেন এবং সুখে খাইতে লাগিলেন দীর্ঘকাল। অরে মন্ত্রী মহোদয় নির্বাচনে গভীর জলে তলাইয়া গেলেন।

প্যান্টের বোতাম

বঙ্কিম পড়ি-কি-মরি করে দৌড়ে সাড়ে ন'টার বাসটা ধরে ফেলল। সামনের দরজা দিয়ে সে পারতপক্ষে উঠতে চায় না, পড়লেই অবধারিত মৃত্যু। পেছনের দরজায় তবু হাড়গোড় ভেঙেও বেঁচে থাকার সম্ভাবনা থেকে যায়। ঝুঁকি নিয়ে সামনের দরজাতেই উঠল। ফুটবোর্ডে মিনিট খানেক লাট খেল তারপর বলম্ বলম্ বাহুবলম্ করে সামনের লেডিজ সিটের কাছে একটু দাঁড়াবার জায়গা করে নিল। দুহাত দিয়ে মাথার ওপরের রড শক্ত করে ধরেছে। পা দুটো যথাসম্ভব ফাঁক। তা না হলে ব্যালেন্স রাখতে পারবে না। বাস চলেছে ঊর্ধ্বশ্বাসে! যখন থামছে পেছন থেকে সামনে পর্যন্ত

একটা ঢেউ খেলে যাচ্ছে। যখন ছাড়ছে তখন সামনে থেকে পেছনে। ঢেউয়ের দোলায় বঙ্কিম কখন বামে, কখন ডানে অল্প একটু হেলে যাচ্ছে। ভেতরে তিনটে লাইন হয়েছে। পেছন থেকে যখন চাপ আসছে বঙ্কিমের ভুঁড়িটা সামনে এগিয়ে যাচ্ছে।

বঙ্কিম সাধারণত চোখ বুজিয়ে কোনো একটা ভাবনা বা একাধিক ভাবনা লোফালুফি করতে করতে, আধঘণ্টার পথ পার করে দেয়। আজও চোখ বুজিয়ে ছিল। ভাবছিল সকালেই মিটিং আছে। অফিসে পেঁছে মিনিট দশেক মাত্র সময় পাবে। তার মধ্যে ফাইল-টাইল ঠিকঠাক করে নিতে হবে। অ্যাজেণ্ডা পয়েন্টস, মান্থলি রিপোর্ট। আজকে ঠেলাঠেলিটা বড় বেশি। ওঃ ধনুক করে ছেড়ে দিলে। কানের কাছে কে যেন ফিসফিস করে বললে —'দাদা'। বঙ্কিম গ্রাহ্য করল না। আবার—'দাদা'। বঙ্কিম চোখ খুলে বাঁ পাশে তাকাল। একটি অমায়িক মুখ। ভদ্রলোক ফিসফিস করে বললেন —'পোস্ট অফিস থেকে আণ্ডারওয়্যারের দড়ি ডেলিভারি হয়ে সামনে পেণ্ডু-লামের মত ঝুলছে! বারকতক ভদ্রমহিলার নাকে টুসকি মেরেছে। গলার টাইটার সঙ্গে ব্যালেন্স করেই কি নিচের এই ব্যবস্থা!' বঙ্কিম সঙ্গে সঙ্গে নিচের দিকে তাকাল, সর্বনাশ, আধহাতের মত পুরুষ্টু একটি শাড়ির পাড় ডগায় আবার একটা গেরো, প্যান্টের ফাঁক দিয়ে সামনে ড্যাং ড্যাং করে দুলছে। বঙ্কিমের বিলম্বিত সেই ফ্রণ্ট লাঙুলের সামনেই একটি সুন্দর মুখ ভুরুটুরু কুঁচকে বসে আছেন। দড়ি একবার করে তাঁর দিকে যাচ্ছে আর ছুঁই ছুঁই করে কখন ছুঁয়ে অথবা ছোঁবার ভয় দেখিয়ে বঙ্কিমের দু' পায়ের ফাঁকে মুখ লুকিয়ে ফেলছে।

ভদ্রলোক বললেন, 'ওটাকে অ্যারেস্ট করে সেফ কাস্টডিতে চালান করুন, তা না হলে অভূতপূর্ব অশান্তির সম্ভাবনা।'

যে জায়গায় ঝোলায়মান দড়িটাকে অদৃশ্য করাতে হবে, সে জায়গাটা শরীরের একটা ভাইটাল এরিয়া হলেও সর্বসমক্ষে সেটি রেডলাইট এলাকা। হঠাৎ আঙুল ঠেকানো যায় না। বিশেষত ভদ্রমহিলাদের সামনে। একটু ঘুরে বা আড়াল করে যে ঢোকাবে, তারও উপায় নেই। ঘুরবে কি করে! কুলফি মালাইয়ের মত সবাই খাপে সেট। ঠিক হ্যায়! বঙ্কিম নিজেই চোখ বুজলো। যে দেখে দেখুক, সে নিজে দেখতে রাজি নয়। সামনের দিকে মাঝের একটা বোতাম মিসিং। দড়িটা অবোধ শিশুর মত সেই ফাঁক

দিয়ে বেরিয়ে এসে সামনেই সুন্দরী মহিলা দেখে প্রভুভক্ত কুকুরের মত গদগদ আনন্দে ল্যাজ নাড়তে শুরু করেছে।

বাড়িতে প্যান্টটা যখন পরেছিল তখনও বোতামটা ছিল। বাসে ওঠার কসরতেই বোধহয় কেন্দ্রচ্যুত হয়েছে। বঙ্কিমের সমস্ত রাগ গিয়ে পড়ল স্ত্রী প্রতিমার উপর। মানুষের একটা সামান্য কমনসেন্স থাকা উচিত। মেয়েমানুষ কি মানুষ নয়! কেউ আন্ডারওয়্যারে অতবড় একটা চিত্র-বিচিত্র পাড় লাগায়। কয়েকদিন আগেও একটা মাপেরসই গেঞ্জির দড়ি লাগান ছিল। রোজই সকালে কাচা আন্ডারওয়্যার পরতে গিয়ে দেখা যেত দড়ির যে কোন একটা মাথা ফোল্ডের মধ্যে ঢুকে পলাতক প্রাণীর মত বসে আছে। তাড়াতাড়ির সময় মহাবিবক্তি। রাঁধতে রাঁধতে প্রতিমাকে আসতে হত মাথার কাঁটা কিংবা বোনার কাঠি দিয়ে খুঁচিয়ে বের করে আনার জন্যে। উভয় পক্ষেরই অসুবিধে। বেরোবার সময় কেউই প্রকৃতিস্থ থাকে না। অফিসের দিনের সকাল সাত সতেরো ঝামেলায় ভরা। তখন এইসব ছ্যাঁচড়ামি একেবারেই ভাল লাগে না সত্যি। কিন্তু তা বলে কেউ এতবড় একটা দড়ি লাগায়। এ যেন রথের রশি।

বাস এগোচ্ছে, প্রতিমার সঙ্গে বঙ্কিমের মনে মনে ঝগড়াও তত জমে উঠেছে। একবাস লোকের সামনে তুমি আমায় প্রায় বিবস্ত্র করে ছেড়েছো। বিবস্ত্র নয়তো কি! এমন সুন্দর একটা গরম প্যান্টের তলাতেও যে একটা অন্তর্বাস থাকে, সেই অপ্রিয় সত্য, হাটের মাঝে হাঁড়ি ভাঙার মত প্রকাশিত হয়ে পড়েছে। দীর্ঘ ব্যবহারে সেই পরিধেয় লাল এবং সেটি কোমরের সঙ্গে বাঁধা শাড়ির পাড় দিয়ে। এ যেন দীনবন্ধুর মাথা কামানো অবস্থা। দীনবন্ধু ছিল তাদের পাড়ার অ্যাপোলো। সেই দীনবন্ধু প্রেমপত্র লিখেছিল তার মার বয়সী এক কুমারী মেয়েকে। পঞ্চায়েতী সাজা হয়েছিল, মাথা মুড়িয়ে গলায় জুতোর মালা পরিয়ে রাস্তায় প্যারেড। তুমি আমায় দীনবন্ধু করে ছেড়েছো।

যে মহিলার নাকের ডগায় বঙ্কিমের দড়ি পেয়ার করতে গিয়েছিল তিনি হঠাৎ উঠে পড়লেন। স্টপেজ এসে গেছে তাঁর। বঙ্কিমকে এমনভাবে 'সরুন' বললেন, বঙ্কিম যেন ছোঁয়াচে কোনো অসুখে ভুগছে। বঙ্কিম জানে ভদ্র-মহিলার গিয়ে প্রথম কাজই হবে নাকের ডগা ধোয়া। মেকআপ চটকে যাবে। বঙ্কিমের উদ্দেশে তখন আর একপ্রস্থ গালাগাল ছুটবে। সামনে জায়গাটা খালি হল। অন্যদিন হলে বঙ্কিম ঝপ করে বসে পড়তো, আজ আর বসার

সাহস পেল না। সামনের বোতাম নেই। বসলেই লালচে আণ্ডারওয়্যার উঁকি দেবে স্লেট রঙের প্যান্টের জানালা দিয়ে। কেউ হয়তো লক্ষ্য করবে না কিন্তু বঙ্কিম এখন সচেতনতায় ভুগছে। 'আপনি বসবেন না!' বলে আর একজন বসে পড়লেন। বঙ্কিমবাবু দুলতে দুলতে, মনে মনে ঝগড়া করতে করতে ক্রমশই অফিসপাড়ার দিকে এগোতে লাগলেন।

অফিসে পেঁৗছেই তার প্রথম সমস্যা হল উদার প্যান্টকে কি করে একটু অনুদার করা যায়। মোটা কুশন লাগানো ঘূর্ণায়মান চেয়ারে বসলেই অন্তর্বাসের চোরাচাহনি শুরু হবে। স্টেনো মিস মিত্র অনবরতই পাশে এসে দাঁড়ান নানা কাজে। চোখে পড়বে। একটু পরেই ডিরেকটারের ঘরে মিটিং। গোল করে নিচু হাইটের সোফা পাতা। মধ্যে সেণ্টার টেবিল। বসা মাত্রই প্যান্টের ঠোঁট ফাঁক হয়ে যবে। মহিলা পি-এরা এই স্ফুরিত অংরের জঘনা ব্যাখ্যা করে নিতে পারেন। কাণ্ডজ্ঞানশূন্য স্ত্রী নিয়ে ঘর করলে মানুষকে এইভাবেই ভুগতে হবে। চেয়ারের পেছন থেকে তোয়ালে টেনে নিয়ে বঙ্কিম কোলের উপর রাখল। কাজ করতে হলে বসতেই হবে। বসতে হলে চাপা দিতেই হবে। বঙ্কিমের যেন ছেলে হয়েছে। কোলে শুইয়ে রেখেছে সযত্নে।

মিস মিত্র এলেন, একঝলক গন্ধ আর খুশি নিয়ে। বঙ্কিম আসন্ন মিটিং এর জন্যে প্রস্তুত হতে লাগল। মিত্রর হঠাৎ চোখ পড়ল কোলের তোয়ালের ওপর।

'দিন স্যার তুলে রাখি।'

বঙ্কিম একটু বিব্রত হল। এতটা সজাগ দৃষ্টি ভদ্রমহিলা যদি না দিতেন, প্রোমোশন, ইনক্রিমেণ্ট আটকাতো কি? বঙ্কিম বললে, 'না থাক, হাত দুটো বড় ঘামচে, আমার একটু লিভার হয়েছে।'

মিস মিত্র ধনুক ভুরু করে বললেন, 'খুব ভাল ওষুধ আছে আমার মার কাছে, একেবারে অব্যর্থ, কাল এনে দেবো।'

বঙ্কিম বললে, 'থ্যাঙ্ক ইউ।' মিত্র সুইং দরজা দুলিয়ে চলে গেলেন।

একটা আলপিন লাগালে কেমন হয়? বঙ্কিম তেমন উৎসাহ পেল না, জায়গাটা বিশেষ সুবিধের নয়। কোনো ঝুঁকি নিলেই হসপিটাল। পরিবেশনের সময় যেমন করে কোমরে তোয়ালে জড়ায়, সেইভাবে জড়িয়ে ডিরেকটারের ঘরে যাওয়া যায় না! তোয়ালেটা যথাস্থানে ঝুলিয়ে রেখে বঙ্কিম বাথরুমে গেল। দরজাটা লক করে প্যান্টের কোমরের বোতাম খুলে ফেলল। হ্যাঁ দড়ি বটে! দেখবার মত। লাউডগার মত লটপট করে ঝুলছে। দড়ির

প্রান্ত দুটো ভাল করে গুঁজে নিল কোমরে। দেখি এবার তুমি কোন ফাঁকে বেরোও। বড় অপদস্থ করেছো আজ। সাহেবী অহংকারের বেলুন পাংচার করে দিয়েছো। টাই ঠিক করে, চুলে চিরুনি বুলিয়ে বঙ্কিম নিষ্ক্রান্ত হল। রেডি ফর দি মিটিং।

কোলের উপর একটা ফাইল রেখে মিটিংরুমে বঙ্কিম কাউকেই বুঝতে দিল না যে তার ভাইটাল জায়গায় একটা বোতাম নেই। সারাটা দিন অশান্তি নিয়ে কাটল। বাড়ি ফিরে যতক্ষণ না বৌকে ধাতাতে পারছে ততক্ষণ মনের কোষ্ঠ-কাঠিন্য কাটবে না। একসময় মনে হল প্রতিমার কি দোষ? বোতাম তো বাসে খুলে পড়ে গেছে! তাহলেও প্রতিমার তো উচিত ছিল একটু চেক করা। প্লেন আকাশে ওড়ার আগে গ্রাউন্ড ইঞ্জিনিয়ারদের কি ডিউটি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সব দেখা। প্রতিমার গাফিলতিতেই তার এই বেলি ল্যান্ডিং।

বাড়ি ফিরে বঙ্কিমকে আর কলিং বেল বাজাতে হল না। সামনেই হাসি হাসি মুখে প্রতিমা দাঁড়িয়ে। বঙ্কিম বলতে যাচ্ছিল শাট আপ রাসকেল। তারপর মনে হল, রাসকেল শব্দটার যথার্থ অর্থটা কি! এতকাল বলে আসছে, মানেটা জানা নেই। অক্সফোর্ড কিংবা চেম্বার্স খুলে আগে মানেটা দেখা দরকার। খামোখা দেড়টা টাকা খরচ হয়েছে আসার সময়। একটা বৃহৎ সাইজের সচিত্র ইংরেজী সাপ্তাহিক কিনে, সারাটা রাস্তা কোলে রাখতে হয়েছে। তাপ্পি মেরে ছাদের ফুটো বন্ধ করার কায়দায়। পাশের ভদ্রলোক একবার দেখতে চেয়েছিলেন, বঙ্কিম বলেছিল, এটা দেখার নয়, কোলে পেতে রাখার, আই অ্যাম সরি। ভদ্রলোক বলেছিলেন, ঠিক আছে পয়সা থাকে কিনে পড়ব, আপনার মত শিক্ষিত ছোটলোকের কাছে কখনো চাইব না। বঙ্কিম বলেছিল, হুঁ। ভদ্রলোক কিন্তু থামলেন না—আমিও বইপত্তর কিনি মশাই, গত মাসে ষাট টাকা দিয়ে গীতার ব্যাখ্যা কিনেছি, বিশ্বাস না হয় আমার বাড়িতে গিয়ে দেখে আসুন। বাস চলেছে ভদ্রলোকের আক্রমণও চলেছে অপ্রতিহত—এই সব চিপ ম্যাগাজিন আমি পড়ি না মশাই, একমাত্র বাসে আর ট্রামে এর-তার কাছে চেয়ে একটু পাতা ওল্টাই। বঙ্কিম বলেছিল—হুঁ। ভদ্রলোক ফোঁ করে নস্যি টেনে বলেছিলেন, অত অহংকার ভাল না। ঠিক আছে আপনিই তা হলে পড়ুন। ম্যাগাজিন কেউ মুর্খের মত কোলের শিশু করে রাখে না। এত করেও বঙ্কিম যখন পাতা ওল্টালো না, ভদ্রলোক হাল ছেড়ে বললেন, অক্ষর জ্ঞান হয়েছে তো।

শহরে ড্রেস দেখে মানুষ চেনা দায়।

রাসকেল শব্দটা উদ্গত ঢেঁকুরের মত চেপে রেখে বঙ্কিম স্ত্রীকে বলল—'তুমি কী? তোমার কোন কাণ্ডাকাণ্ডজ্ঞান নেই! খাচ্ছোদাচ্ছো আর ভুঁড়ি ফুলিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছো। তোমার কি কোন কর্তব্যবোধ, কৃতজ্ঞতাবোধ কিছুই নেই। এটা বাড়ি না জিমখানা।' হোসপাইপে জল দেবার মত করে বঙ্কিম বিষোদ্গার করে প্রতিমাকে পাশ কাটিয়ে ঘরে ঢুকে গেল। আকস্মিক আক্রমণে প্রতিমা অবাক। সে পেছন পেছন ঘরে ঢুকে জিগ্যেস করল, 'হল কি তোমার?' বঙ্কিম ঘুরে দাঁড়িয়ে এতক্ষণের ঢেকে রাখা জিনিসটা উন্মুক্ত করল—'এটা কি। এটা?' সমস্ত শরীরটাকে পেছনদিকে আর্চ করে, সামনের দিকটা প্রতিমার দিকে ঠেলে দিয়ে, প্যান্টের ফ্ল্যাপটা দেখালো। 'জানো এক বাস লোকের মাঝে এই গর্ত দিয়ে কি বেরিয়েছে?' প্রতিমার হাসি রোগ, একটুতেই হেসে ফেলে, কুঁক কুঁক শব্দ করে বলল, 'কি বেরিয়েছে? সাপ!' বঙ্কিম দক্ষযজ্ঞের মহাদেবের মত ঘরের কার্পেটে ধিতিং ধিতিং করে নেচে প্যান্টটা কোমরচ্যুত করে, আণ্ডারওয়্যারের পাড়ের একটা মাথা টেনে বের করে বলল, 'এইটা, এইটা, কোন একটা সেন্স অফ ডিসেন্সি নেই। নিজেও যেমন বেহুঁশ, অন্যকেও নিজের অগোছালো ধারায় আনতে চাও। নিজের ব্রেসিয়ারের স্ট্র্যাপ তো জীবনে ব্লাউজের আড়ালে গেল না। বেল্লিক কাঁহাকা।' বঙ্কিম যেন একটু হালকা হল। বেশ বলেছে। প্রথম কিস্তি ভালই নামিয়েছে। প্রতিমা এতক্ষণ ব্যাপারটাকে লঘু করে নিয়ে ছিল, বেল্লিক-টেল্লিক বলায় তারও রক্তের চাপ এইবার বেড়ে গেল—'মুখ সামলে। বাড়িতে ঢুকেই ঝগড়া কোরো না বলে দিচ্ছি। কার সঙ্গে কী করতে গিয়ে বোতাম ছিঁড়ে এসে এখন বেঁড়ে শালাকে ধর। আমি কি হাত গুনবো না খড়ি করবো। না বললে জানবো কি করে যে বাবুর বোতাম ছিঁড়েছে।'

'জানতে হবে না।' বঙ্কিম আণ্ডারওয়্যার খুলতে খুলতে তিরিক্ষি মেজাজে বলল, 'তুমি তোমার ফষ্টিনষ্টি নিয়ে থাকো, আমার ব্যাপারে নাক গলাতে হবে না। চা খাবো না যাও!' প্রতিমা বুড়ো আঙুল দেখিয়ে বলল—'খেতে হবে না। আমার ভারী বয়ে গেল।' এদিকে দড়িতে মোক্ষম গিঁট পড়ে গেছে, কিছুতেই খুলতে পারছে না। প্রকৃতির ডাকও আর চেপে রাখা যাচ্ছে না! আলমারির মাথার উপর থেকে একটা খোলা ছুরি নিয়ে বঙ্কিম বললে—'কেটেই ফেলবো, যস্মিন দেশে যদাচার।' প্রতিমা হৈ হৈ

করে উঠল, 'চালাকি পেয়েছো। পাড় অত সস্তা না। কাল সকালবেলা যখন হুকুম হবে পাড় পরিয়ে দাও, তখন আমি পাব কোথায়! আর আমার স্টকে নেই।' বঙ্কিম ছুরিটা ভুঁড়িতে ঢুকিয়ে কাটতে যাচ্ছে, প্রতিমা এসে হাত চেপে ধরল। ভুঁড়ি ফেঁসে যাবার ভয়ে বঙ্কিম ছুরিটা ছেড়ে দিতে বাধ্য হল। 'না কাটলে খুলবো কি করে? এটা কি আমি ততদিন পরে বসে থাকবো যতদিন না গলে গলে বেরিয়ে যাচ্ছে। চালাকি পেয়েছো?' প্রতিমা নির্বিকার মুখে বলল—'আমি কি জানি! গিঁট পড়ে কেন?' বঙ্কিম বললে, ঠিক আছে আগুন দিয়ে পুড়িয়ে খুলবো।' মহা বেকায়দায় পড়েছে বঙ্কিম, নিম্নচাপ আর ধরে রাখা যায় না। দেশলাই দিয়ে পোড়াবে কি! আগুন লেগে যাবার ভয় আছে। বাধ্য হয়েই বঙ্কিম সুর পাল্টালো—'খুলে দাও তাহলে!' প্রতিমার ব্যঙ্গের হাসি—'পথে এস বাছাধন।' অ্যামিবিক লোকের স্ত্রীর সঙ্গে সদ্ভাব রেখেই চলা উচিত। গেরোটি খুলে দিতেই বঙ্কিম চেন ছাড়া কুকুরের মত অন্তর্বাস মুক্ত হয়ে, সোজা বাথরুমে গিয়ে ঢুকলো।

রাত দশটা নাগাদ বঙ্কিম আবিষ্কার করল, তার নির্লজ্জ স্ত্রী প্যান্টের বোতাম বসাবার কোনো চেষ্টাই করে নি। ইজিচেয়ারে গা এলিয়ে মৌজ করে উপন্যাস পড়ছে। বঙ্কিম বললে, 'উচিত ছিল।' প্রতিমা বইয়ের মধ্যে থেকেই বললে—'হুঁ।' বঙ্কিম আর এক পর্দা গলা চড়াল—'উচিত ছিল।' আবার প্রতিমার—হুঁ। এইবার বঙ্কিমের ফেটে পড়ার সময়—'উচিত ছিল ওই রাবিশ বই না পড়ে, বোতামটা বসানো, কাল সকালেই তো পরে বেরোতে হবে।' প্রতিমার সেই এক উত্তর—হুঁ। বঙ্কিম ঝড়ের বেগে বইটা কেড়ে নিয়ে রকেট করে ঘরের সিলিংয়ের দিকে উড়িয়ে দিল। পাখাভাঙা জটায়ুর মত বইটা পাতাটাতা মুড়ে ঘরের এককোণে পড়ল। বঙ্কিমের চেপে রাখা রাসকেলটা এতক্ষণে বেরোলো—'রাসকেল, রাসকেলিয়ান বাগার। যার শিল যার নোড়া তারই ভাঙো দাঁতের গোড়া। তাই না?' প্রতিমা মেঝে থেকে বইটা কুড়োতে কুড়োতে বললে—'তুমি ডবল রাসকেল'? বঙ্কিমের খুব ইচ্ছে করছিল নিটোল নিতম্বে একটি পদাঘাত করে। মনের ইচ্ছে মনে চেপে বঙ্কিম বৌয়ের ঘাড় ধরে বলল—'আগে বোতাম বসাবে পরে অন্য কাজ।' প্রতিমা বললে, 'তোমার মত ছোটলোকের প্যান্টে আমার হাত ঠেকাতে ঘেন্না করে।' বঙ্কিম বৌকে ছেড়ে দিল। এত বড় কথা যে বলতে পারে তার সঙ্গে কিসের সম্পর্ক। বালির চরে

ঘর বেঁধেছে। সংসারে কে কার! এসেছি একলা, যাবোও একলা ম্যান। প্রতিমা বিছানায় মুখ গুঁজে শুয়ে পড়ল। বঙ্কিম বসল প্যাণ্টে বোতাম বসাতে।

চোখের কি আর সেই জ্যোতি আছে। ছুঁচের ফুটো তাক করে সুতো চালায়, একটুর জন্যে পাশ দিয়ে বেরিয়ে যায়। প্রথম ছুঁচের দিকে সুতো, পরে সুতোর দিকে ছুঁচ, কোনো ভাবেই কায়দা করতে পারলো না। একে রেগে আছে। রাতের খাওয়া ডকে উঠেছে। প্রতিমার অভিমান সে জানে। নিম্নচাপের বৃষ্টির মত মিনিমাম তিন দিন। তার উপর ছুঁচের এই ছলনা। একটা চাপা গর্জন শোনা গেল—'শালা, তেরি আঁড়র্দোন, পাঁড়র্দোন। ছুঁচ আর মেয়েমানুষ একজাত। ছলনাময়ী।' বঙ্কিম ছুঁচটাকে মেঝেতে রেখে, দু' হাত জোড় করে বলল—'পায়ে ধরছি মাইরি, আর বেইজ্জত কর না।'

ছুঁচের বোধ হয় দয়া হল। হঠাৎ সুতোটা ঢুকে গেল ছুঁচের গর্তে। বোতামও একটা জোগাড় হয়েছে। রঙে প্রায় রঙ মেলে। আগের বোতামটা যাবার সময় একটু ফেঁসো সুতোর স্মৃতি রেখে গেছে। বঙ্কিম বোতামটাকে দাগে দাগ মিলিয়ে বসালো। এইবার তলা থেকে ছুঁচ গলিয়ে প্যাণ্টের ওপিঠ থেকে এপিঠে আসতে হবে, বোতামের চারটে গর্তের যে কোনো একটা ভেদ করে। তলা থেকে ছুঁচের মাথা গলিয়ে গলিয়ে সুতোর পথ করে দেবার প্রয়াস। কেবলই ঠেকে যাচ্ছে। ছিদ্র ছলনাময়ী। প্যাট, প্যাট। কার্ডিয়োগ্রাফের ছুঁচের মত বোতামের উল্টো পিঠে ছুঁচের লাফালাফি। করতে করতে ফ্যাঁস করে ছুঁচটা বেরিয়ে এল। শালা, কালঘাম ছুটে গেল। সুতোটা টেনে ওপরের দিকে তুলতে লাগল বঙ্কিম। এরপর কোণাকুণি একটা ফুটোয় ঢুকতে হবে ওপর থেকে নীচে, তারপর আবার নীচে থেকে হাতড়ে হাতড়ে ওপরে। এইভাবে চারটে ফুটো। যাঃ শালা, সমস্ত সুতোটাই বেরিয়ে চলে এল, বোতামটা কোল বেয়ে, প্যাণ্ট বেয়ে গড়িয়ে খাটের তলায় চলে গেল। ওঃ হরি। সুতোয় যে গিঁট দিতে হয়, তা না হলে আটকাবে কিসে! ধুত্তোর বাপু।

বোতাম খুঁজতে বঙ্কিম হামাগুড়ি দিয়ে খাটের তলায় ঢুকলো। লো হাইটের খাট। একে অন্ধকার অন্ধকার জায়গা, তার ওপর কালো বোতাম। অত সহজে পাওয়া যাবে! বঙ্কিম দেখেছে, পয়সা, বোতাম, আংটির পাথর, কানের দুল পড়ে গেলেই ফোর্থ ডাইমেনসানে চলে যায়। অন্তত মিনিট পাঁচেক ইঞ্চি ইঞ্চি করে ৪২ বর্গফুট জায়গা অনুসন্ধানের পর বোতামটা তার হাতে এল। বেরিয়ে আসার সময় হিসাবের ভুলের ফলে খাটে মাথা ঠুকে গেল।

ছুঁচটা আবার কোথায় গেল? বঙ্কিমের ল্যাজে-গোবরে অবস্থা। বোতাম পেল তো ছুঁচ হারালো। ছুঁচের ধর্মই হল হারিয়ে যাওয়া। বুঝেছি, তুমি শালা পাছায় না ফুটে উঠবে না। থ্যাপ থ্যাপ করে বার কতক এখানে-ওখানে বসল। ছুঁচ শেষে বেরোলো প্যাণ্টের ফোল্ড থেকে। সুতোর ল্যাজে বেশ জুত-সই করে একটা গিঁট দিল। আবার শুরু হল, তলা থেকে ছুঁচের বোতামের ফুটো খোঁজার পালা। সমস্তটাই চান্সের খেলা, আর বঙ্কিম ভাবতেও পারে নি যে এবার এক চান্সেই লক্ষ্যভেদ হবে। বঙ্কিম সাবধান হবার সময়ই পেল না। ফ্যাঁস করে ছুঁচ বিঁধে গেল আঙুলের মাথায়। প্যাণ্ট, ছুঁচ, সুতো, বোতাম, একটান মেরে তালগোল পাকিয়ে পাঠিয়ে দিল খাটের তলায়।

রক্তের বিন্দু আঙুলের মাথায়। রক্তটা মুখ দিয়ে শুষে নিল। নোনতা। আবার এক বিন্দু। বুঝেছি ভগবান, বৌয়ের কারসাজিতে অভুক্ত তাই রক্তের ডিনার। সব কাজ সকলকে দিয়ে হয় না। দু'পাতা নোট লিখতে পার, ডবল এন্ট্রি বুককিপিং পার, তাবলে কি সেলাইফোঁড়াই পারবে! ওটা মেয়েদের ব্যাপার। পারবে! মনে নেই শৈশবে একবার ইঁটের গর্তে আঙুল ঢুকিয়ে বিছের কামড় খেয়েছিলে। যাও শুয়ে পড়, কাল সকালে দেখা যাবে।

বঙ্কিম শুয়ে শুয়ে আঙুল চুষতে চুষতে ঘুমিয়ে পড়ল। খাটের তলায় মুখ গুঁজড়ে পড়ে রইল বঙ্কিমের সাধের গরম প্যাণ্ট, একটি আলগা বোতাম, সুতো পরানো একটা পাতি ছুঁচ। মাঝরাতে হালকা পায়ে কোনো সহৃদয় পরী এসে বঙ্কিমের বোতামটা বসিয়ে দিয়ে যায় কিনা দেখা যাক! রাতউপোসী বঙ্কিমের মুখে ছুঁচ ফোঁটা আঙুলের ললিপপ। অনেক রাতে প্রতিমার একবার ঘুম ভেঙেছিল। ঘরের চাপা আলোয় আঙুল চোষা ঘুমন্ত বঙ্কিমকে দেখে, মনে মনে বলল—আহা রে, কোলের খোকা আমার, প্যাণ্টের আর দরকার কি! এবার ঘুনসি বেঁধে কপনি পরলেই হয়। হাড় বজ্জাত! বিয়ের পর থেকে জ্বালাচ্ছে। সারাটা জীবন জ্বালাবে। 'হাড় জ্বালানে' বলে প্রতিমা পাশ ফিরে ঘুমের টানেল দিয়ে নাকের ইঞ্জিন চালিয়ে দিল ভোরের স্টেশনের দিকে।

জোর আলোটা কমিয়ে দাও। যে সুইচের মুখটা নিচু ছিল হীরেন ফট করে সেটাকে দড়ি ধরে উঁচু করে দিতেই সারা ঘর অন্ধকার হয়ে গেল। বেশ স্নিগ্ধ অন্ধকার! এই ঘরের ফ্লোরেসেণ্ট আলোর স্টার্টারটা সব সময় চিন্ করে ঝিঁঝিঁ পোকার মত একটানা শব্দ করে। বহু ইলেকট্রিসিয়ান এসেছেন নানা চেষ্টা হয়েছে। অসুখ দুরারোগ্য সারে নি। হীরেনের বাবা বীরেনের শব্দটা সহ্য হয়ে গেছে। আসলে তাঁর বয়স যত বাড়ছে শ্রবণশক্তিও সেই অনুপাতে কমছে। যে কোন কথা এখন দুবার না বললে শুনতে পান না। প্রথমবার স্বাভাবিক গলায়, দ্বিতীয়বার জোরে। ঘরটা শুধু অন্ধকার হল না, শান্ত স্তব্ধ হল। বাইরের কিছু শব্দটব্দও শোনা যেতে লাগল। অধীরবাবুর আইবুড়ো ছেলে বেহালা শিখছে। তিন মাস নাগাড়ে চেষ্টা করেও সেই একই চেরা সুর। চড়া পর্দায় উঠে সুর যেন বলছে—ছেড়ে দে মাইরি এটা তোর সাবজেক্ট নয়। বিয়ে করে পাড়ার লোককে শান্তি দে। ব্যাচেলার-এর অনেক জ্বালা।

বীরেনবাবু জানলার ধারে রাতে খাওয়া-দাওয়ার পর আরাম-চেয়ারে বসে

দুধ খাচ্ছিলেন। বিরক্ত হয়ে বললেন—আলোটা নেভালে কেন?

—আপনি তো নেভাতেই বললেন।

—নো স্যার আমি বলেছি কমাতে। তোমার চরিত্রের একটা মেন ডিফেক্ট কি জান, কে কি বলছে পুরোটা কেয়ারফুলি শুনতে চাও না। ছাত্রজীবনেও এই এক দোষের জন্যে কখনই তুমি ডিজায়ার্ড রেজাল্ট পাওনি।

—আমি শুনেছি আপনি কমাতে বলেছেন, তবে এ আলো তো সেজ কিংবা হারিকেন নয় যে কমবে, তাই নিভিয়ে দিয়েছি।

অন্ধকারে দুধে চুমুক দেবার সামান্য শব্দ হল। বীরেনবাবু অল্প একটু কেসে বললেন, ওটাও তোমার চরিত্রের আর একটা মস্ত দোষ, আগে থেকেই সব কিছু ধরে নাও। চলতি ধারণার বাইরে যেতে যেও না। ইনোভেসান বলে ইংরেজীতে একটা কথা আছে, শুনেছো?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—তাহলে জেনে রাখ এ আলোও কমাতে জানলে কমে। আলোটা জ্বালো আবার। হীরেন অন্ধকারে বেশ কয়েকবার ঠুসঠাস শব্দ করার পর আলোটা তিড়িং বিড়িং করে জ্বলে উঠল। আলোটার নিচেই বসে আছেন বীরেন। একটা হাত দিয়ে চোখ আড়াল করে বললেন—

এইবার পাখার রেগুলেটারটা দেখতে পাচ্ছ? ওটাকে ঘুরিয়ে তিনে নিয়ে এস। দুই নয়, তিন। দুইতে নিয়ে এলে আর জ্বলবেই না।

হীরেন রেগুলেটারটাকে তিনে আনতেই চার ফুট টিউবলাইটটা অস্বচ্ছ একটা মার্বেলের ডাণ্ডার মত হয়ে গেল। কায়দাটা মন্দ নয় তো! বেশ একটা চাপা চাঁদের আলো গোছের ব্যাপার। বীরেনের ঘরে পাখাও ছিল, রেগুলেটারও ছিল। সাবেক আমলের ছাপান্ন ইঞ্চি পাখা। ঢ্যাকস ঢ্যাকস করে ঘুরত। জগৎবাবু এসে বললেন—করেছেন কি? যৌবনে কারুর কথা কানে নিলেন না, লাখখানেক হাঁসের ডিম খেয়ে বাত ডেকে আনলেন, এখন আবার পাখার হাওয়া দিয়ে সেই বাতের ডিমে তা মারছেন! উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব, পশ্চিম চারদিকে এত বড় বড় ডবল জানলা, টোয়েণ্টিফোর আওয়ার্স ঝড় বইছে, ন্যাচারাল হাওয়া, সানসাইন, ভিটামিন, ভ্রমণ, ফ্রণ্ট বেণ্ডিং, সাইড বেণ্ডিং এইসব চালান। নেচারোপ্যাথি ইজ দি বেস্ট প্যাথি। সকালে উঠে দুকোয়া রসুন কচরমচর, কচরমচর। ঈষদুষ্ণ জলে নুন ফেলে চান। আর মনটাকে করে রাখুন পাখির মত, সারাদিন চিরাপ, চিরাপ।

জগৎবাবুর পরামর্শে পাখা হয়ত বিদায় হত না। পাখাটা নিজে নিজেই চলে গেল। শব্দটাই রইল। তখন পাখা গেল অয়েলিং হতে। একেবারে অগস্ত্য যাত্রা। ফিরে আসবে বলে মনে হয় না। ইতিমধ্যে বীরেনবাবু রেগুলেটারটাকে কাজে লাগিয়ে ফেলেছেন।

বীরেন ছেলেকে বললেন—এইবার চেয়ারটা টেনে এনে একটু কাছাকাছি বস। খুব সিরিয়াস কথা আছে। ভেরি সিরিয়াস। দেয়ালের দিকে হাতলহীন সাবেক কালের একটা চেয়ার ছিল, বীরেন স্থির দৃষ্টিতে ছেলে হীরেনকে একবার দেখলেন। হীরেন একটু ভয় পেয়ে গেল—কিছু হল?

—হল বৈকি। চেয়ার সরিয়ে আনারও একটা নিয়ম আছে হে। তুমি যেভাবে চেয়ারটা টেনে নিয়ে এলে ওটা হল অনার্য পদ্ধতি। হিড়হিড়, হিড়হিড়। সারা পাড়ার লোক জানতে পারল হীরেনবাবু চেয়ারে বসছেন। আমি হলে কি করতুম জান, চেয়ারটাকে সশরীরে তুলে কোন শব্দ না করে এখানে নিয়ে আসতুম। যাক, ম্যান লিভস টু লার্ন। যতদিন বাঁচব ততদিনই কিছু না কিছু শিখব।

বীরেন হাসলেন। বিদ্রূপের হাসি। হীরেন চেয়ারে ভয়ে ভয়ে বসল। হয় মেঝেটা অসমান ছিল না হয় চেয়ারের পায়ায় কিছু গোলমাল ছিল, বসতেই চেয়ারটা খটাখট করে দুলে উঠল। হীরেন সাবধান হতে গিয়ে আবার একবার শব্দ হল।—আমি করিনি, একটু নাড়াচড়া করলে আপনিই ওই রকম করছে। আমি বরং নিচে নেমে বসি।

—অন্য কোন উপায় ভাবতে পারলে না। নেগেটিভ অ্যাপ্রোচ। চেয়ারটা একটু সরিয়ে দ্যাখ তো কি হয়! হীরেন চেয়ারটা দু হাতে তুলে সাবধানে একটু সরাল, যেন কাঁচের চেয়ার, তেমনি ভারি। বসে একটু নড়েচড়ে দেখল।

—একটু বেড়ে গেল মনে হচ্ছে?

—আবার একটু সরাও।

হীরেন আগের কায়দায় চেয়ারটাকে আবার একটু সরিয়ে বসল। আবার সেই ঢকাঢক। বলতেও সাহস হচ্ছে না। তা না হলে বলত, এটা বোধ হয় রকিং চেয়ার। তার বদলে করুণ মুখে বলল—আমার পিছনে বোধ হয় কোনও ডিফেক্ট আছে। অনেকের থাকে না! প্যাণ্টের মাপ দিতে গিয়ে দেখেছি তো বাঁ দিকের চেয়ে ডান দিকের পাছাটা ভারি। আমি বরং বাঁ দিকে কিছু খবরের কাগজ গুঁজে বসি।

বীরেন অবাক হয়ে ছেলের দিকে তাকালেন। একটু শান দেওয়া হাসি হেসে বললেন—রিসার্চ করে দেখার মত ব্রেন হে তোমার। নিচু হয়ে চেয়ারের পায়া চারটে একটু চেক করত ! দেয়ার মাস্ট বি সামথিং।

হীরেন উবু হয়ে বসে চেয়ারের পায়া পরীক্ষা করছে। কোন কারুকার্য নেই। চৌকো, চৌকো গোদা গোদা পায়া। বহুকাল পালিশ টালিশ পড়েনি। কালচে ছ্যাতলা রঙ। একটা পায়ায় ছোট মত একটা ফুটো হয়েছে।

—একটা ফুটো হয়েছে। হীরেন বীরেনকে খবরটা জানিয়ে দিল।

শেষ চুমুকে দুধের গেলাসটা খালি করে জানলার গবরেটে রাখতে রাখতে বীরেন লাফিয়ে উঠলেন—আই সি ! তাই বলি সারা রাত কি একটা কটর কটর করে। ঘুণ পোকা। কই দেখি, দেখতে পাব কিনা জানি না। যাও আলোটা বাড়াও। ফুল করে দাও। বীরেন মেঝের ওপর হুমড়ি খেয়ে বসলেন। হীরেন আলোটা জোর করে দিল।

বাঃ, বাঃ। বীরেন তারিফ করলেন। হীরেন ভেবেছিল তিনি বোধ হয় তার আলো জোর করার ভূমিকাকে তারিফ করলেন। তা নয়, বেশ পছন্দসই ফুটো হয়েছে—দেখি একটা কাঠি নিয়ে এস ত।

—দেশলাই কাঠি ?

—এনি কাঠি। ওই তো বাইরের বারান্দায় চলে যাও ঝাঁটাকাঠি পাবে। ছড়িয়ে ছত্রাকার। ও আমি পারলুম না।

— কি পারলেন না ?

—ওই একটা জায়গায় আমি ডিফিটেড। ডগেড টেনাসিটি ? একটা জাত বটে। যা ধরবে তা ছাড়বে না। কাদের কথা বলছেন বুঝতে না পেরে হীরেন দরজার কাছ থেকে প্রশ্ন করলেন—কাদের কথা বলছেন, ইংরেজদের ? জার্মানদের ? পূর্ববঙ্গীয়দের ? সেনগুপ্তদের ?

—আরে না না, কাক, কাক, কাকের কথা বলছি।

একটা খ্যাংরা নিয়ে বছরের এই সময়টায় কাকে আর বীরেনে খুব টানাহেঁচড়া চলে। সারা বারান্দায় কাঠি ছড়িয়ে আছে। বীরেন বলছেন—এই সময়টা ওদের মেটিং সিজন। বাসা বাঁধার সময়। রোজ একবার করে ঝাঁটাটা বাঁধছি, রোজ খুলে ফেলে দিচ্ছে। কি ভীষণ শক্তি, কাঠের গোঁজ দিয়ে তার দিয়ে বাঁধা, ঠোঁট দিয়ে টেনে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। একে কি বলে জান, স্ট্যামিনা। মানুষের বুদ্ধি আর কাকের স্ট্যামিনা বাঙালীদের মধ্যে যদি এক...

—এনেছো ? দেখি দাও। আর একটু মোটা পেলে না ?

—আনব ? অন্ধকার ত, আন্দাজে এনেছি।

—থাক, আমি কেবল দেখব গর্তটা কতটা অবধি নেমেছে।

হাঁটুর ওপর দু হাত রেখে সামনে ঝুঁকে হীরেন দেখছে। বীরেন চেষ্টা করছেন লিকলিকে কাঠিটা গর্তের মুখ দিয়ে ভেতরে ঢোকাবার। হীরেন বললে— বেড়ে হয়েছে, আগ্নেয়গিরির মুখের মত। দাঁতের বেশ জোর।

ইঞ্চি ছয়েক লম্বা কাঠি সবটাই প্রায় ঢুকে গেল। বীরেন বললেন - দেখ মজা, সাতদিনে প্রগ্রেসটা একবার দেখ। তোমার মনে আছে, আমাদের সেই পাতকো খোঁড়া। খুঁড়ছে ত খুঁড়ছেই, ফুকফুক বিড়ি খাচ্ছে, গল্প চলছে, দু ঘণ্টার কাজ আট ঘণ্টায় তুলে, কার্নিট মলে দুশো টাকা নিয়ে গেল। বিশটা ঘুণ পোকা ছেড়ে দাও, ম্যাটার অফ সেকেণ্ডস। যাক এ আর কিছু করা যাবে না। ফিনিশড। কাঠের গুঁড়ো বেরোচ্ছে দেখছো। ট্যালকাম পাউডারকে হার মানায়। মানুষ করে বিজ্ঞানের বড়াই, হ্যাঃ। টু হাণ্ড্রেড মেশের ফাইন ডাস্ট বের করে ছেড়ে দিলে সামান্য একটা পোকা।

— বুঝেছি !

—কি বুঝেছো ?

—ওই পায়াটা একটু ছোট হয়ে গেছে বলেই চেয়ারটা ঢকঢক করছে। ধরুন প্রায় ছ ইঞ্চি মত খেয়ে ফেলেছে ত !

—এটা তুমি সিরিয়াসলি বললে, না বুড়োর সঙ্গে ইয়ারকি করলে !

হীরেন ঘাবড়ে গেল—আজ্ঞে ইয়ারকি করব কেন ! আমার মনে হল তাই...

—জেনেটিকস বোঝো ?

—সামান্য।

• —ওই প্রবাদটাও নিশ্চয় শুনেছ—বাপকো বেটা—

হীরেন পরম উৎসাহে বলল—সিপাহীকো ঘোড়া কুছ নেহি হ্যায় তো থোড়া থোড়া। বীরেন হাত তুলে হীরেনের উচ্ছ্বাস থামিয়ে দিয়ে বললেন —আমার ছেলে তুমি, আমার পুরোটা না হলেও থোড়া থোড়া তোমার পাওয়া উচিত ছিল, একমাত্র লিভারের ট্রাবল ছাড়া আর কিছু পেলে না। এইবার এস তোমার ছেলেতে, তোমার থোড়া থোড়া তার পাওয়া উচিত ছিল, তা থোড়া কেন সেণ্ট পারসেণ্ট তো পেয়েইছে আরও অ্যাডিশানাল এই নাও।

একটা পায়ার তলা থেকে পাতলা চৌকো মত একটা ইংরেজার বের করে

বীরেন হীরেনের হাতে দিলেন—ঢকঢকের কারণটা বুঝলে? নাও এবার বস। বীরেন নিজের জায়গায় বসে আগের কথার খেই ধরলেন—

—ঘুড়ি পেয়েছে, লাট্টু পেয়েছে, বল পেয়েছে. ইয়ার পেয়েছে, ইয়ারকি পেয়েছে, অংকের বোদা মাথা পেয়েছে, হাতে কাঁচা পয়সা পেয়েছে, আলস্য পেয়েছে, কথায় কথায় মিথ্যে কথা পেয়েছে, অমনোযোগিতা পেয়েছে, ফাঁকি-বাজী পেয়েছে। এখন বল তুমি একে কি করবে, কি করে সামলাবে! বসে বসে চোখের সামনে এই গোল্লায় যাওয়া আমার পক্ষে দেখা সম্ভব নয়। তোমার পাঁঠা তুমি সামলাও। আমার ওপর আর ফেলে রেখ না। এরপর তোমরা বলবে বুড়োটাই দাযী। এই নাও নিজেই দেখ।

বীরেনে হীরেনের দিকে নীল মত একখন্ড মোটা কাগজ এগিয়ে দিলেন। ষান্মাসিক পরীক্ষার ফল। শ্রীমৃগেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। ষষ্ঠ শ্রেণী। রামকৃষ্ণ মিশন উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়। ইংরেজী ২৩, বাংলা ৩৩, অংক ১৭। মন্তব্য ব্যক্তিগত তত্ত্বাবধানে রেখে এই শোচনীর অবস্থা সামলাবার চেষ্টা করুন নচেৎ...প্রধান শিক্ষক। রেজাল্টটা দেবার আগে বীরেন হীরেনকে অ্যায়সা পাম্প করেছেন, হীরেনের মনে হচ্ছে সেই-ই ছাত্র। নিজের রেজাল্টটা হাতে ধরে মুখ চুন করে বসে আছে।

—কি বুঝলে?

—আজ্ঞে মিজারেবল।

—শুধু মিজারেবল নয়, ভেরি, ভেরি, ভেরি মিজারেবল। ক্লাস সিক্স যদি এই হয় আর একটু ওপর দিকে উঠলে কি হবে বুঝতে পার!

—আর উঠবে কি করে। আমার ত মনে হচ্ছে ও একই জায়গায় থেকে যাবে।

—রাইট ইউ আর। জীবনে তোমার এই একটা অ্যাসেসমেণ্ট কারেক্ট হবে। হেডমাস্টার মশাইয়ের কমেণ্টসটা পড়েছ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ পার্সোন্যাল কেয়ার।

—কেয়ার অফ দাদু করে রাখলে চলবে না। নিজেকে দেখতে হবে। তুমি কি কর!

—আজ্ঞে চাকরি করি।

—হ্যাঁ চাকরি কর, সে আমি জানি। এমন চাকরি সংসার চলে না।

ছেলেটাকে একটা ভাল ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে দিতে পারলে না! ওকে নিজে নিয়ে কখনও বস, না সে সবের বালাই নেই।

—কেন, সকালে ঘণ্টাখানেক বসি!

—সেটা কখন?

—ওই তো সকালবেলা বাজার থেকে এসেই বসে যাই।

—তুমি ত ঘুম থেকেই ওঠ সকাল সাতটায়। অফিসে বেরোও নটায়, এর মধ্যে তোমার ঘণ্টাখানেক আসছে কোথা থেকে। সকালে তোমার তেল-মাথাই ত ঘণ্টাখানেক, তারপর চান আর সাবান, সাবান আর চান। তারপর তোমার চুল, চুলের কেয়ারী!

—আপনিই ত বলেছিলেন, বাঙালীর শরীর তেলে আর জলে। এখন তেলের নেশা ধরে গেছে। আর চুল? আপনি বলেছিলেন ছেলে বড় হচ্ছে হীরু, তোমার ওই রমণীমোহন কেশদাম একটু ছোট করে ফেল, তা এই দেখুন।

হীরেন সামনের একটা চুল টেনে কপাল অবধি নিয়ে এল—আগে ছিল দাড়ি পর্যন্ত, এই দেখুন উঠে এসেছে কপাল পর্যন্ত, যে চুল কাটছিল সে পর্যন্ত হায় হায় করে উঠেছিল। আপনি বলছেন—আপনি আচরি ধর্ম। প্যাণ্টের পায়ের দিকের ঘের কাটিয়ে ছোট করে নিয়েছি।

বীরেন বললেন—তা হলে এটা কি? হোয়াট ইজ দিস!

চেয়ারের পাশ থেকে এক প্যাকেট তাস নিয়ে ছেলের কোলে ছুঁড়ে দিলেন। প্যাকেটের ওপর অর্ধউলঙ্গ মেম সাহেবের ছবি। হীরেন লজ্জায় চোখ বুজিয়ে ফেলেছিল। অবাক কাণ্ড। তাসের প্যাকেটটা কি করে বীরেনের হাতে এসে পড়ল? এটা ত তার বৌয়ের সম্পত্তি। এরকম কাছাকোঁচা খোলা মহিলার সঙ্গে ঘর সংসার করা যায়!

তাস নিয়ে এস, তাস নিয়ে এস, মাঝে মাঝে এক আধ চাল খেলা যাবে! ভাল, পালিশ করা তাস চাই মহারাণীর। ন্যাতা ন্যাতা এনো না মাইরি। সোহাগের সময় অপর্ণার মুখে তুমি মাইরি শুনবে, শালা শুনবে! গায়ের ওপর ঢলে পড়া দেখবে। দুহাত তুলে খোঁপা ঠিক করা দেখবে। হীরেন এখনও ভেবে পায় না তার ব্রীফকেস থেকে থ্রি নাইটস কনট্রাসেপটিভের খালি কৌটো কি করে বীরনের জোয়ানের কৌটো হয়ে গিয়েছিল! বীরেন একটু করে জোয়ান খেতেন আর হীরেন ভয়ে সিঁটিয়ে থাকত। যদি একবার পড়ে

ফেলতেন—সেলফ লুব্রিকেটিং...। নেহাত ঘোড়ার ছবিটা আড়াল করে রেখেছে কথাগুলো! সেই কৌটো ফের চুরি করে সরিয়ে নিতে হীরেনের জান কয়লা হয়ে গেছে।

বীরেন বলছেন—ঠিক এইরকম জিনিস কোথায় থাকে জান—বেশ্যালয়ে, জুয়ার আড্ডায়। ভদ্রবাড়িতে এসব থাকে না। তুমি আমাকে কখনো তাস খেলতে দেখেছ?

হীরেন ভয়ে ভয়ে বলল—না স্যার। স্যার শব্দটা বলেই বুঝতে পারল নিজের ভুল এটা অফিস নয়, কলেজ নয়, বসে আছে নিজের বাবার সামনে। উত্তরটা দ্বিতীয়বার ঠিক করে বলল—আজ্ঞে না।

—তোমার মনে আছে নিশ্চয় তুমি যখন ফার্স্ট ক্লাসে পড় তখন তোমাকে তাসে ধরেছিল। কিছু বখাছেলে জুটিয়ে খুব চলত সারাদিন। পালের গোদা ছিল সত্য ঘোষের ছেলে। সত্য ছিল মদের দোকানের ম্যানেজার। ন্যায়, নীতি, নিষ্ঠা, চরিত্র, আদর্শ এসব ওয়াটারে ইনসলুবল হলেও ডিজলভস ইন এলকোহল। সেই শালা মদ কোম্পানীর তাস দিয়ে নিজের ছেলের মাথাটি খেয়ে আমার ছেলের মাথাটি খাবার তালে ছিল। কিন্তু

কিন্তু ভগবান যে দেখে রেটি সত্যকেও ছাড়িয়ে গেলে। সেই তাস শুধু ফিরে এল না, যে একেই তাকাও উলঙ্গিনী—বীরেন হঠাৎ গান গেয়ে উঠলেন—কে মা তুমি উলঙ্গিনী, হাসিছ খেলিছ আপন মনে সুখের গৃহ শ্মশান করে।

হীরেন দেখলে একটা কিছু উত্তর দিতেই হবে। দিতে হয় অপরাধ নীরবে মেনে নেওয়া হয়—আজ্ঞে ওটা বিলিতি তাস। আমার এক বন্ধু প্রেজেন্ট করেছিল। তাস ত আমি খেলি না। ওই মাঝেমাঝে। একটু পেসেনস...আপনি বলেছিলেন না পেসেনসে মেমোরি বাড়ে, একাগ্রতা আসে

- তাহলে এটা কি?

হীরেনের কোলে রঙীন একটা ফিল্ম ম্যাগাজিন এসে পড়ল। মলাটে জাঙ্গিয়া পরা এক মহিলা বুক-টুক বের করে, ঠ্যাং উঁচু করে কি যে সব করছে, যোগাসন-টোগাসন হতে পারে। হীরেন বইটা তাড়াতাড়ি উপুড় করে ফেলল। মেয়েটা বীরেনের দিকে হীরেনের কোলে পড়ে পড়ে পা-টা ছুঁড়াছিল। এটা কি করে বীরেনের হাতে এল! বইটা তো নিচের ঘরে তার বিছানার তলায়

ছিল। ভেতরে আরও সব সাংঘাতিক সাংঘাতিক ছবি আছে। শোবার আগে একটু দেখলে টেখলে মন্দ লাগে না, ঘুমটা বেশ জমে ভাল। বইটা কি ভাবে ওপরে এল! ইচ্ছে করছে নিচে নেমে গিয়ে সেই ইডিয়েট মহিলাটির গালে ঠাস ঠাস করে...

বীরেন বললেন—এটাও নিশ্চয় এয়াবমেলে বিলেত থেকে এসেছে! চাপা দিলে কেন? মলাটটা ওলটাও। গোঁফটা কি তোমার আঁকা?

—গোঁফ।

—ইয়েস গোঁফ। লজ্জা কিসের? সোজা কর। সোজা কর না।

হীরেন ম্যাগাজিনটা বাধ্য হয়ে সোজা করল। অন্য সময় হলে এই এক মলাটেই সে কাত হয়ে যেত। অপর্ণার সঙ্গে সেনব অনেক রকম হৃদয়বিদারক ব্যাপার-স্যাপার করার জন্যে আপ্রাণ খুঁতখুঁত করত। এখন সে শুধু ভোঁদার মত তাকিয়ে রইল। মহিলার ঠোঁট নব কার্তিকের মত ফাইন গোঁফ গজিয়েছে, নীল রঙের গোঁফ।

—মেয়েছেলেটি কে?

—আজ্ঞে ফরিয়াল।

—হরিয়াল? তা এনার পেশা কি?

—ফিল্ম স্টার, বম্বের ফিল্ম স্টার।

—বেশ বেশ তোমার নিজস্ব সংসার বেশ জমে উঠেছে কি বল? এ ভাবে চলবে না বাপু। আজ সারা দুপুর তোমার ছেলে এই দুটো জিনিস নিয়ে বড়ই ব্যস্ত হয়ে পড়েছিল। বিভিন্ন জায়গায় গোঁফ দাড়ি বসিয়েছে। দু একটাকে একটু জামা কাপড় পরাবারও চেষ্টা করেছে। ন্যুডিটি খারাপ জিনিস নয় তবে কি জান, আমরা ত সাবেক কালের মানুষ, মা কালী অবধি সহ্য হয়, মা বোম্বাইওয়ালীদের প্রতিষ্ঠিত করার মত রুচি বিকৃতি সহ্য করতে পারি না। বয়স থাকলে ও দুটোকেই এই মুহূর্তে অগ্নি-সংকার করে ফেলতুম। এখন বীরেন প্রোপোজেস হীরেন ডিসপোজেস উইথ ডিভাইন লাফটার।

—আমি তাহলে যাই? হীরেন ভয়ে ভয়ে বলল। তার মনে হচ্ছিল, উপায় থাকলে এখনি পাতালে প্রবেশ করে।

—না না যাবে কোথায়। এখনও আর একটু বাকি আছে যে বাবা হীরেন।

বীরেন চেয়ার সরিয়ে উঠে দাঁড়ালেন। ধীরে ধীরে এগিয়ে গেলেন ঘরের কোণে একটা টেবিলের দিকে। টেবিলটা কলকাতা শহরের মতই কনজেস্টেড হয়ে উঠেছে। ছোট জলের কুঁজো, গেলাস, ওষুধের শিশি, বাক্স, বইয়ের পর বই, কাত বই, চিৎপাত বই। টেবিলটার অবস্থা মহাভারতের মত। কি নেই! সেই মহাভারত থেকে বীরেন প্রয়োজনীয় বস্তুটি তুলে নিলেন। পেট চ্যাপ্টা একটা বোতল। বোতলটা হাতে নিয়ে হীরেনের সামনে এসে দাঁড়ালেন।

—দেখ ত এটাতে মানিপ্ল্যান্ট কি রকম হবে!

হীরেনের চোখের সামনে সেই বোতল। কাল লেবেলের গায়ে তিনটে এক্স চোখের সামনে একশোটা এক্স হয়ে নাচছে—এক্স, এক্স, এক্স, এক্স রাম। হীরেন শুকনো গলায় বলল—ভালই হবে।

—বেশ, বোতল যখন এনেছো, প্ল্যান্টের দায়িত্বটাও তোমার নেওয়া উচিত। খালি এনেছিলে না ভর্তি? তোমার স্টকে এই সুন্দর বস্তু আর কটা আছে?

কি উত্তর দেবে হীরেন। তার প্রাইভেট ওয়ার্লড বেরিয়ে পড়েছে বিশ্রীভাবে। মলাটের মেয়েটার চেয়েও সে এখন উলঙ্গ! হীরেন তবু জিজ্ঞেস না করে পারলো না—এ সব আপনার কাছে কি করে এল?

—ও তুমি বুঝি সেই নীতিবাক্যটা ভুলে গেছ—পাপ কখনও চাপা থাকে না। হীরেন্দ্র, পাপ একপ্রকার এক্জিমা!

অঘায়ুরিন্দ্রিয়ারামো মোঘং পার্থ স জীবতঃ। যে ব্যক্তি শুধু নিজের ইন্দ্রিয়-সুখ-ভোগ ও স্বার্থ লইয়া আছে পাপময়-জীবন ইন্দ্রিয়-পরায়ণ সে ব্যক্তি বৃথা জীবিত থাকে। ভুঞ্জতে তে ত্বঘং পাপা যে পচন্ত্যাত্মকারণাৎ। যাহারা কেবল আপনার জন্যই পাক করে সেই পাপিষ্ঠগণ পাপই ভোজন করে। ছেলে যদি মানুষ করতে চাও হীরেন, তাহলে জেনে রাখ বাপু ফাঁকি দিয়ে হবে না! কিঞ্চিৎ সংযম, কিঞ্চিৎ ত্যাগ, অল্প একটু আদর্শ নিষ্ঠার প্রয়োজন হবে। আর যদি মনে করে থাক জন্ম দিয়েই তোমাদের কর্তব্য শেষ তাহলে.. বীরেন সুর করে গাইলেন—শেষের সেদিন অতি ভয়ংকর। তোমাকে বলা বৃথা তবু বলি, অজ্ঞশ্চাশ্রদ্দধানশ্চ সংশয়াত্মা বিনশ্যতি। নায়ং লোকহস্তি ন পরো ন সুখং সংশয়াত্মনঃ। অজ্ঞ, শ্রদ্ধাহীন, সংশয়াকুল ব্যক্তি বিনষ্ট হয়। সংশয়াত্মার ইহলোক ও নাই, পরলোকও নাই, সুখও নাই।

হীরেন আর বসে থাকতে পারছিল না। একই সঙ্গে তার গোটা তিনেক ব্যাপার অবিলম্বে করার প্রচণ্ড ইচ্ছে হচ্ছিল। বৌয়ের সঙ্গে বেশ খোলসা করে একটা ঝগড়া, ঘুমন্ত ছেলেকে কান ধরে টেনে তুলে ঠাস ঠাস করে গোটকতক চড়, তাস আর কিছু বই পুড়িয়ে ফেলা। কিন্তু অনুমতি না পেলে ওঠে কি করে।

—শেষ গোটাকতক কথা তোমার ভালর জন্যেই বলছি—বীরেন চেয়ারে বসলেন—তোমার মুখ দেখে মনে হচ্ছে ভেতরে ভেতরে খুব অসন্তুষ্ট হচ্ছ, হবেই—ক্রোধাদ্ভবতি সম্মোহঃ সম্মোহাৎ স্মৃতিবিভ্রমঃ। স্মৃতিভ্রংশাদ বুদ্ধিনাশো বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি। ক্রোধ থেকে তোমার মোহ হবে, তোমার স্মৃতির ওপর চেপে বসে বুদ্ধির টুঁটি চেপে ধরবে, আর বুদ্ধি গেল ত রইল কি। বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি। বাড়িতে তিনটে রেডিও ঢুকিয়েছ, একটা ওপরে দুটো নিচে। পার তো দুটোকে বিদায় কর। ছেলে যদি মানুষ করতে চাও—ইট ইজ এ মাস্ট। হ্যাঁ বাধা আসবে, তোমার বউ আঁচড়ে কামড়েও দিতে পারে। শুনলুম তিনি নাকি টি-ভি র জন্যে সত্যাগ্রহ করেছেন গোদের ওপর বিষফোঁড়া।

—আমি ক্যাটিগোরিক্যালি—না বলে দিয়েছি, বলেছি ওসব হবে না, পাঁচজনে করে যাহা তুমিও করিবে তাহা, ওসব চলবে না। এ বাড়িতে আপনার নীতি, আমি করিব যাহা অন্যে শ্রেষ্ঠ উদাহরণ বলিয়া অনুসরণ করিবে তাহা।

—যাক জীবনে একটা না বলতে পেরেছ জেনে বড় খুশী হলুম হে! তবে তোমার না, হ্যাঁ হয়ে যেতে বেশি সময় নেয় না। তোমার দোষ কি জান, তুমি বেশিক্ষণ আদর্শ ধরে থাকতে পার না। খাঁচা খুলে ফুড়ুত করে উড়ে যায়। আচ্ছা, তা দেখা যাক, যারা পারে চেষ্টা করতে করতে একদিন হয়তো হয়ে যাবে। ইয়েস ম্যান থেকে নো-ম্যান। তোমার মধ্যে এম-এল-এ কি এম-পি হবার সমস্ত গুণ ছিল।

—আজ্ঞে হ্যাঁ। বলেই হীরেনের খেয়াল হল এটা তো তার প্রশংসা নয়, নিন্দা, সঙ্গে সঙ্গে শুধরে নিয়ে বললে, আজ্ঞে না।

বীরেন ধারাল হেসে বললেন—দেখেছ, তোমার না আর হ্যাঁর মধ্যে কোন চৌকাঠ নেই। দু নৌকোয় দুটো পা, এই না, এই হ্যাঁ। রেডিওর সঙ্গে বিদায় কর ওই সর্বনেশে জিনিসটা—অ্যাকোয়ারিয়াম। পড়াশোনা কাজকর্ম সব কিছু ভণ্ডুল করার শ্রেষ্ঠ অস্ত্র। সারা দিন বসে বসে মাছের

খেলা দেখ, এদিকে পেছন দিয়ে সময় জীবনের খেলা খেলতে খেলতে সরে পড়ুক। সারাদিন একটা ছাঁকনি দিয়ে ছেঁকে ছেঁকে মাছের বাচ্চা তুলে একটা জারে রাখ। এরকম মাছও দেখিনি, ফাইটার না ব্ল্যাক মলি, ঘণ্টায় পঞ্চাশটা করে বাচ্চা পাড়ছে। মানুষকেও হার মানিয়েছে। ছেলে যদি মানুষ করতে চাও হীরেন অবিলম্বে ওই বস্তুটিও দূর কর। তাস, পাশা, দাবা, মাছ সব কটাই কর্মনাশা। যাও তাহলে, হাই উঠছে, তোমার। দেখি কটা বাজল। ও মোটে এগারটা তেমন কিছু রাত হয়নি।

হীরেন সিঁড়ি দিয়ে ধাপে ধাপে নামছে। একটা হাতে তাস, ম্যাগাজিন, অন্য হাতে বোতল। এক কানকাটা গ্রামের বাইরে দিয়ে যায়, দু কানকাটা যায় গ্রামের ভেতর দিয়ে। এখন তার আর সেই লজ্জা নেই! মনে মনে বেপরোয়া হয়ে উঠেছে। আর তার লজ্জা কিসের। তার গুপ্তজীবন আজ চিচিংফাঁক হয়ে গেছে।

বীরেন সিঁড়ির ওপর থেকে অবশিষ্ট উপদেশটুকু ঝুলিয়ে দিলেন— সংসার করতে হলে একটা জিনিস জেনে রাখো, বাইরেটাকে করতে হবে বজ্রের মত কঠোর, ভেতরটা কুসুমের মত কোমল হোক, ক্ষতি নেই। ম্যাদামারা হলেই ভুগতে হবে।

—আজ্ঞে হ্যাঁ, বলে হীরেন শেষের দুটো ধাপ হিসেবের গোলমালে এক সঙ্গে টপকে ফেলল। আর একটু হলেই পা-টা মচকে যেত। খুব জোর সামলে নিয়েছে। বোতলটাও হাত থেকে পড়ে যেত। খুব জোর সামলে নিয়েছে। মোটা হবার জন্যে রাম কিনেছিলে রাসকেল! হীরেন নিজেকেই নিজে গালাগাল দিল—মোটা হবে মোটা! এইবার রামের ঠেলা বোঝো!

বাঁদিকে ঘাড় ফিরিয়ে বসার ঘরটা দেখল। নিচেটা একেবারেই নির্জন। অনুচ্চ একটা ছোট টেবিলের ওপর আলোকিত অ্যাকোয়ারিয়াম। অন্ধকার ঘরে শুধুমাত্র অ্যাকোয়ারিয়ামের আলো ভারি সুন্দর একটা মায়া তৈরি করেছে। সাদা সাদা কোরাল আর সবুজ শ্যাওলা পাকিয়ে পাকিয়ে ওপর দিকে উঠেছে। বালির বিছানানার ওপর থেবড়ে বসে আছে চীনেমাটির হাঁ করা ব্যাঙ, মাঝে মাঝে ভুরভুর করে মুখ দিয়ে বুদবুদ ছুঁড়ছে। ছোট্ট একটা স্বপ্নের দেশ যেন! মুক্তোর মত রঙের একটা মাছ, রাজকীয় চালে কোরালের ডালপালার পাশ দিয়ে ওপর দিকে উঠছে। একটি কিশোরের সযত্ন পরিচর্যায় গড়ে তোলা রঙীন মাছের জগৎ।

হীরেন আলো না জেবলেই একটা চেয়ারে বসে পড়ল। হাতের জিনিসগুলো সাজিয়ে রাখল পাশের সেণ্টার টেবিলে। জল থেকে স্নিগ্ধ চাপা আলো অ্যাকোয়ারিয়ামের তিন পাশের কাঁচ ভেদ করে চারপাশে ক্ষুদ্র একটা জ্যোৎস্নার বলয় তৈরি করেছে। সেই আলোতে তাসের সুন্দরী, ম্যাগাজিনের মলাটের পা ছোঁড়া নর্তকী, রামের বোতলের কালো লেবেল সব কিছুর যেন অন্য অর্থ! অদ্ভুত একটা সুখের গন্ধ উঠছে। হীরেন তার শোবার ঘরটাও দেখতে পাচ্ছে। নীল নাইট ল্যাম্প জ্বলছে। পাখার হাওয়ায় দরজার পর্দা কাঁপছে। নাইলনের মশারির মধ্যে আর এক নীলাভ অ্যাকোয়ারিয়াম। সেখানে নিদ্রিত মাছ আর মাছের মা। বসার ঘরে বসে বসেই হীরেন শোবার ঘরের দৃশ্যটা দেখতে পাচ্ছে। হলদে শাড়ি পরে এক যুবতী, না-চিৎ না-উবুড়, হয়ে, নিজের কানকোর ওপর একপেশে হয়ে এংকেবেংকে শুয়ে আছে, মাছের, মত, মারমেডের মত। তার পাশেই কাতলার মত মোটা মাথা আর একটি মাছ। যার ষাণ্মাষিক পরীক্ষার ফলাফল সংবলিত মেটো কাগজটি এখন বোম্বাই চিত্রতারকার পশ্চাদ্দেশে চাপা পড়ে আছে।

গালে হাত রেখে হীরেন অ্যাকোয়ারিয়ামটার দিকে তাকিয়ে অনেকক্ষণ বসে রইল! বসে বসে মাছেদের খেলা দেখল। ব্ল্যাক মলি, ফাইটার, এঞ্জেল, গোল্ড ফিশ। কখনও ওপর দিকে উঠছে, কখনও নিচে নামছে। একটা মাছের পেছন দিকে সরু সুতোর মত কি একটা বেরিয়েছে। মাঝে-মাঝে এক একটা মাছ আর একটাকে তাড়া করছে। ওলটানো একটা কাপ থেকে সরু সরু কেঁচো বেরোচ্ছে। বড় মাছটা হাঁ করে খেতে আসছে। হাঁ-মুখ মাছটাকে দেখে হীরেনের মনে হচ্ছে সে যেন নিজেকেই দেখছে—হীরেন হাঁ করে তেড়ে যাচ্ছে অপর্ণাকে চুমু খেতে।

*

তছনছ করে দেবো। সব কিছু তছনছ করে দেবো। হীরেন মনে মনে বললে। অ্যাকোয়ারিয়ামের সংসার আমি তছনছ করে দেবো! আমি বজ্রের মত কঠোর। হীরেন মনে মনে যখন খুব উত্তেজিত হয়ে উঠছে অ্যাকোয়ারিয়ামের ব্যাঙটা তখন মুখ দিয়ে খুব বুদবুদ ছাড়ছে। হীরেন বললে, জীবন ভাল তবে মানুষের জীবন আদৌ ভাল নয়। না, তাই বা কেন, মানুষ হয়ে জন্মানো খুব খারাপ নয়, খারাপ হল বিবাহিত মানুষ হওয়া। বিবাহে কিছু সুখ যে নেই তা নয় তবে সন্তানে বড়ই অসুখ।

গোল্ড ফিশটা হঠাৎ লাফিয়ে উঠল। ভারি সুন্দর একটা শব্দ হল। সমস্ত জলে গুঁড়ো গুঁড়ো শ্যাওলা। বালির কণা চিকচিক করছে। না বেশিক্ষণ বসলে দুর্বল হয়ে পড়ব। হীরেন আগে কখনও এত মনোযোগ দিয়ে মাছের খেলা দেখেনি। বৌ, ছেলে, রঙ্গীন মাছ সবই এক ধরনের দুর্বলতা। বন্ধুর বেশে পরম শত্রু। পরস্পর পরস্পরকে বাঁশ দিয়ে চলেছে। তুই আমার ছেলে! শ্রীকৃষ্ণের পুত্র শাম্ব, তস্যপুত্র ঘোর একটি লৌহমুষল। হীরেন আপন মনেই হাসল। বীরেন হলেন কৃষ্ণ, হীরেন হল শাম্ব, 'ইয়েস ম্যান' ব্যক্তিত্বহীন। ওই, মুষল এই তাসের প্যাকেট, ম্যাগাজিন, সব টেনেটুনে ওপরে তুলেছে আর আমার স্ত্রী, যাঁকে আমি দুধ-কলা দিয়ে পুষেছি তিনি হ্যা, হ্যা করে এই ত্রিবিধ অশ্লীল বস্তুর পদযাত্রা হাঁ করে দেখেছেন। সারা দিন, অত বকবক করলে গুছিয়ে সংসার হয়! যার শাড়ি অনবরতই সায়ার তলায় নেমে যায়, যার ব্লাউজের কাঁধের ফাঁক দিয়ে অনবরতই চিকটিকির ন্যাজ বেরিয়ে পড়ে যার পিঠের দিকে, কোমরের ওপর প্রায়ই ছত্রিশ নম্বর টিকিট ঝোলে, তাকে বিশ্বাস করে হরিদাসের গুপ্ত কথা বাড়িতে ঢোকানই অন্যায় হয়েছে। আমি একটি মূর্খ! পুংশ্চলী পঞ্চচূড়া দেবর্ষি নারদকে সেই কবে বলে গিয়েছিলেন—যম পবন মৃত্যু পাতাল বড়বানল ক্ষুরধারা বিষ সর্প ও অগ্নি—এই সমস্তই একাধারে নারীতে বর্তমান। শাস্ত্রবাক্য না শুনলে দুঃখ তো পেতেই হবে মানিক। গুফো ফরিয়াল ম্যাগাজিনের মলাট থেকে হীরেনের দিকে মিটিমিটি তাকিয়ে আছে।

শেষ থেকেই তবে শুরু হোক। প্রথম অ্যাকোয়ারিয়াম। দ্বিতীয় রেডিও। সচল রেডিও অচল করা কয়েক মিনিটের ব্যাপার। ঝামেলা এই আলোকিত মায়া। এরই মধ্যে দুর্বল করে ফেলেছে। তার চেয়েও শক্ত কাজ নিজের চরিত্র সংশোধন। সাধন করনা চাহিরে মনুয়া ভজন করনা চাহি। আচ্ছা সে হবেখন। চরিত্র ছেলেখেলার জিনিস নয়।

হীরেন উঠে পড়ল। দুটো ঝঞ্ঝাটে প্রাণী ও-ঘরে পরমানন্দে ঘুমোচ্ছে। এই তো সময়। অপারেশন অ্যাকোয়ারিয়াম। সকালে উঠে দেখবে, ফক্কা ফাঁক। সাজান বাগান শুকিয়ে গেছে। হীরেন জানে তার ছেলের যন্ত্রপাতি কোথায় থাকে। বিশাল একটা কার্ডবোর্ডের বাক্সে। বাইরে থেকে প্রথমে বারকতক টোকা মারতে হবে। আরশোলা, ইঁদুর, বিছে, মাকড়সা যাবতীয় রোমহর্ষক বস্তুরা হীরেনের আঙুলের মাথায় কামড় বসবার জন্যে উন্মুখ

হয়ে আছে। সে সুযোগ তোদের দেবো না শয়তান। নিজের চরিত্রের ব্যাপারে অসাবধানী হলেও নিজের নিরাপত্তার প্রশ্ন। অত ক্যাবলাকান্ত নই স্যার। না তেমন কিছু নেই। বাচ্চা একটা টিকটিকি তিড়িক করে লাফিয়ে মেঝেতে পড়ল। সেটাও একটা চমকে দেবার মত ঘটনা। সরীসৃপ মাত্রেই ভীতিপ্রদ।

কত কি যে আছে বাক্সটার ভেতর। একটি শিশুর কল্পনার রাজত্ব। ঝাড়-লণ্ঠনের কাচ, খানিকটা ফ্লেক্সিবল তার। একটা অচল টেবল ক্লক। খানিকটা মোম, দুটো ছাতার সিক, একটা কাঁচি, প্ল্যাস্টিক ব্যাগ, গোটাকতক চোপসান বেলুন, ওষুধ খাবার প্ল্যাস্টিকের চামচে, এক পুরিয়া প্ল্যাস্টার অফ প্যারিস, গোটাকতক রঙীন পেনসিলের টুকরো, একটা চশমার কাঁচ, ভাঙা পুতুল, রঙের বাক্স, মরচেধরা ছুরি। হীরেন যে বস্তুটি খুঁজছিল সেটি পেয়ে গেল একেবারে তলায়। গোল করে সাপের মত গোটান। ফুটকতক সরু অ্যালকাথিন-পাইপ প্ল্যাস্টিকের ছোট বালতিটাও পাওয়া গেল। সব কিছু এত সহজে পেয়ে যাবে সে ভাবেনি।

হীরেন যখন বসার ঘরে ফিরে এল রাত তখন আরও একটু বেড়েছে। মুক্তো রঙের মাছটা স্থির হয়ে ভাসছে। বাকি মাছগুলো তলার দিকে চিতিয়ে আছে। বড় ক্লান্ত সব। জলের জগতেও রাত বাড়ে। টিউবটা হাতে নিয়ে মৎস্যাধারের সামনে হীরেন আরও কিছুক্ষণ বসে রইল। বড় দ্বন্দ্ব চলেছে মনে। হৃদকমলে বড় ধুম লেগেছে, মজা দেখিছে আমার মনপাগলে। করব কী করব না? হীরেনের মনে হল সে একটা ড্রাকুলা। রক্ত শুষে নেবার জন্যে প্রস্তুত হয়েছে। মাছের জীবন জল। বড় সহজ উপায় মাথায় এসেছে। না একটু শক্ত হতে হবে! একটি ছেলের ভবিষ্যৎ বড় না মাছ বড়!

হীরেন অ্যালকাথিন পাইপটা জলের মধ্যে নামিয়ে দিল, অন্যমুখটা ঝুলিয়ে দিল নিচের বালতিতে। জলের উচ্চতা ক্রমশই কমছে। মাছেদের মধ্যে হুড়োহুড়ি, পড়ে গেছে। মধ্যরাতে এ কী দুর্যোগ। বড় মাছটা কাঁচের জানালায় চোখ রেখে যেন বলছে—এ কি করছিস তুই ঘাতক! তিনের চার ভাগ জল পড়ে গেছে! সিকিভাগ মাত্র জলে সমস্ত মাছের সে কি আতঙ্ক! গায়ে গা লাগিয়ে ঘাড়ে ঘাড়ে চেপে সেই সামান্য জলে বেঁচে থাকার কি প্রাণপণ চেষ্টা! হীরেন নলটা হঠাৎ তুলে নিল। না অসম্ভব? এ তো একপ্রকার হত্যা। বালতির জলটা সে আবার ফিরিয়ে দিল।

আবার শুরু হয়ে গেল মাছেদের উল্লাস। জলটা একটু ঘুলিয়ে উঠেছে। চীনে মাটির ব্যাঙ মুখ দিয়ে বুদবুদ ছুঁড়ছে। হীরেন আবার বসে পড়েছে। খুব রাগতে না পারলে কঠিন কাজ করা যায় না। অসম্ভব কিছু একটা করার জন্যে ভয় পেতে হবে কিংবা রাগতে হবে। রাসকেল ছেলে তুমি সারা দিন বসে বসে মাছের চাষ করছ আর ফরিয়ালের গোঁফ তৈরি করছ। ভেবেছ এই ভাবেই তোমার দিন কাটবে তাই না! মাছের ব্রেন নেই। মাছের আবার জীবন মৃত্যুর বোধ! কত মানুষ মরে ভূত হয়ে গেল সামান্য কয়েকটা মাছ! সকালে জেলেদের জালে মাছ দেখনি, ষোল টাকা কিলো! মাংসের দোকানে ছাল ছাড়ান পাঁঠা দেখনি, বিশ টাকা কিলো! লাগাও নল, চালাও নল!

হীরেন আবার পাইপটা চালিয়ে দিল। হাসপাতালের মত দৃশ্য— সেখানে বাঁচাবার জন্যে স্যালাইন দেওয়া হয়, এখানের আয়োজন বিপরীত। ধীরে ধীরে জল টেনে নিয়ে উঁচু ডাঙা তৈরি করে দাও। সমস্ত স্ফূর্তি শুকিয়ে দাও। বালতিতে ফোঁটা ফোঁটা জল পড়ার শব্দ হচ্ছে। মাছেদের মৃত্যুর পদধ্বনি। আর তো আমি তাকিয়ে দেখব না। হীরেন অন্যদিকে তাকিয়ে আছে। মাছেদের ছটফটানি দেখলেই সে দুর্বল হয়ে যাবে। আবার তাকে জলটা ফিরিয়ে দিতে হবে। সারা রাত এই খেলাই চলবে না কি? কি এমন অপরাধ? আমার বৌ জিয়ানো সিঙ্গি কি মাগুরমাছ সকালে নুন দিয়ে বঁটির পেছন দিয়ে থেঁতো করে মারে না? সারা রাত যে মাছ একটা কাপড় ঢাকা বাথটাবে একটু মুক্তির জন্যে, জলের সংসারে ফিরে যাবার জন্যে অনবরতই খলবল করে। বাজারে সে দেখেনি? রুপোর মত ঝকঝকে ফলুই মাছ মাঝে মাঝেই জলের গামলা ছেড়ে আকাশ সমান লাফিয়ে উঠে আবার জলেই ফিরে আসছে, ওজন দরে তারই মত মৃত্যুভীত খদ্দেরের ব্যাগে? তবে? তবে? সংস্কৃতে সেই নীতিবাক্যটা ত এই মুহূর্তেই স্মরণ করা যেতে পারে—একটি গ্রামের মঙ্গলের জন্যে একটি জনপদ, একটি শহরের জন্যে একটি গ্রাম, একটি দেহের জন্যে একটি অঙ্গ সহজেই ত্যাগ করা চলে। সো হোয়াট?

॥ ২ ॥

সকাল ছটা নাগাদ বাথরুমে জল আসে। কাল রাতে কলটা কেউ খুলেই রেখেছিল। তোড়ে জল পড়ছে। সেই শব্দে হীরেনের ঘুম ভেঙে গেল।

রোজকার মতই অজস্র পাখি ডাকছে। কানে আসছে পিতা বীরেনের স্তোত্র-পাঠের শব্দ। সেই একই রকম প্রভাত। কোনও ব্যতিক্রম নেই। সাঁইত্রিশ বছর ধরে এই একই ভাবে সকাল আসে। দিন যায়, রাত আসে। হীরেনের হঠাৎ মনে হল—না, আজকের প্রভাতের একটা নতুনত্ব আছে। সাঁইত্রিশ বছরের পুরোনো গুটি কেটে হীরেন আজ নতুন প্রজাপতির মত মশারির ভেতর থেকে উড়ে আসবে। একটু সাহস করে বেরোতে হবে এই যা। বাইরে অপেক্ষা করে আছে আহত সন্তান, যার দলে সব সময়েই আছে এক নারী। সন্তানের ডাকে মা সব সময়েই সাড়া দিয়ে থাকেন। জীবন্ত মা আর জগন্মাতায় তফাৎ এই—হীরেন শুয়ে শুয়ে মিনিট পনের ডাকা-ডাকি করেও অন্তরে তাঁর সাড়াশব্দ পেল না। এখন একমাত্র ভরসা সেই গানটা, ছাত্রজীবনে যে গানটা সে খালি-জলের ড্রামের ওপর ঘুষি মারতে মারতে গাইত—হও করমেতে বীর, হও ধরমেতে ধীর, হও উন্নত শির নাহি ভয়।

মশারির ভেতর থেকে মাথাটা বের করে বাইরের জগৎটা হীরেন একবার দেখে নিল। অন্য বিছানাটা খালি। যদিও মশারিটা এলোমেলো ঝুলছে এখনও। তার মানে, দি ক্যাট ইজ আউট অফ দি ব্যাগ। ঝুলির বাইরেই বেড়াল। মিঞাও করল বলে। এতক্ষণে জল শুকনো মৎস্য-শ্মশান নিশ্চয় চোখে পড়েছে। চোখে পড়েছে দেয়ালের গায়ে লটকান তার লেখা নোটিস—ফেল্টপেনের বড় বড় অক্ষরে—পাপের বেতন মৃত্যু। 'লেখাপাপড়ায় অবহেলা করার প্রথম শাস্তি।' সাবধান! সাবধান!

এখন মনে হচ্ছে আজকের ভোরটা না হলেই বোধ হয় ভাল হত। কী কাণ্ডই যে হবে রে বাবা। বিছানা থেকে নেমে চটি পায়ে দরজার দিকে এগোতে এগোতে মনে হল যেন ফ্রন্টিয়ারের দিকে এগোচ্ছে। মাথা নীচু করে বসে থাকলে ত চলবে না। পরিস্থিতির মুখোমুখি হতেই হবে। হীরেন পর্দা সরিয়ে দরজার বাইরে আসতেই কানে এল ছেলের গলা—ওই যে নড়ছে দাদি, নড়ছে দাদি।

—নড়বেই তো দাদু, নড়বেই, একে কি বলে জানো উইল ফোর্স। উইল ফোর্স মানে কি দাদু?

—ইচ্ছাশক্তি।

—ভেরি গুড। সবই তোমার আছে, একটু ছাই চাপা। দেখি বৌমা বাকি জলটা আস্তে আস্তে ঢাল ত।

এক সঙ্গে অনেক চুড়ির রিনিঠিনি শব্দ হল। হীরেন বসার ঘরের দরজার পাশ থেকে উঁকি মেরে দেখতে গিয়েছিল ঘরের ভেতর কি ঘটছে। লক্ষ্য করেনি দরজার পাশে ঠেসান ছিল বীরেনের বেড়াতে যাবার ছড়িটা। মেঝেতে পড়ে ঠাস করে একটা শব্দ হল। হীরেন তাড়াতাড়ি নিচু হয়ে ছড়িটা তুলছিল। বীরেন বললেন—এস স্কাউণ্ডেল! তোমার দশ বছর সশ্রম কারাদণ্ড হওয়া উচিত। নৃশংসতায় তুমি দেখি গ্রেট ডিক্টেটারদেরও হারিয়ে দিলে। তুমি আমার দাদুর চোখের জল ফেলিয়েছো এমন সুন্দর ভোরে।

ছড়িটাকে খাড়া করে হীরেন পায়ে পায়ে ঘরে এসে ঢুকল। অ্যাকোয়ারিয়ামের চার-পাশে হীরেনের ছেলে, বৌ বাবার ভীষণ কেরামতি চলেছে। অপর্ণার মাথায় সামান্য ঘোমটাটাও নেই। ঘাড়ের কাছে থলথলে খোঁপা। প্লাস্টিকের বালতিটা নিয়ে পরবর্তী নির্দেশের অপেক্ষায় হাঁ করে দাঁড়িয়ে আছে। অ্যাকো-য়্যারিয়াম জলে টইটম্বুর। অধিকাংশ মাছই যথারীতি সাঁতার কাটছে। দু একটা বড় মাছ কেবল কাবু হয়ে ওপরদিকে ভাসছে।

—দাদি, আমার পার্ল গোরামিটাকে আগে বাঁচান। ওটা একদম নড়ছে না। নাতির কথায় বীরেনের দৃষ্টি হীরেনের দিক থেকে মাছের দিকে ঘুরে গেল।

—সেটা আবার কোনটা? এই তো একটাকে বাঁচিয়ে দিলুম।

—ওই যে যেটার মুক্তোর মত রঙ।

—বৌমা, তোল'ত মাছটাকে।

—তুললে আরও মরে যাবে বাবা।

—আরে তুমিও যেমন, মরেছে আর মরতে কি? তোল!

অর্পণা মাছটা তুলে বীরেনের হাতে দিল। হাতের তালুতে মাছটাকে কিছুক্ষণ রেখে, বীরেন চুক্‌চুক করে উঠলেন—ইট ইজ ডেড বৌমা, ইট হ্যাজ বিন কিল্‌ড। কী সুন্দর! ভগবানের কী ক্রিয়েশান দেখেছো? ওয়াণ্ডার-ফুল। যে ভগবান হীরেনকে সৃষ্টি করেছেন, সেই ভগবানই এই মাছ সৃষ্টি করেছেন, বিশ্বাসই হয় না, কি বল বৌমা?

—আজ্ঞে ঠিক বলেছেন।

—বোতল ধরেছে?

—বোতল!

—নাঃ তোমার আই কিউ কমে গেছে। হীরেন ড্রিঙ্ক করে?

—ড্রিংক ? ড্রিংক করলে পে'...সরি ! অপর্ণা আধ হাত জিভ বের করে মাথা নিচু করল।

—ঠিক বলেছো ! লজ্জা কিসের। বুঝেছি, বুঝেছি, ওই শব্দটা তুমি আমার কাছ থেকেই শিখেছো। আমি খুব পছন্দ করি ওয়ার্ডটা। অমন ফোর্সফুল শব্দ আর দ্বিতীয় নেই। অ্যান্ড হি ডিজার্ভস ইট। রাসকেল ! তোমাকে ধরে আনতে বললে বেঁধে আন। শিশু মনস্তত্ত্ব বোঝো কিছু ? তুমি আমাকে কপি করতে গেছ মূর্খ।

হীরেন বললে—আপনিই তো কাল রাতে বললেন রেডিও, অ্যাকোয়ারিয়াম প্রভৃতি বিদায় করতে।

—তুমি একটি মার্জার। নরম মাটিতেই তোমার প্রথম আঁচড়। রেডিও দিয়ে শুরু করলে না কেন ? সেখানে তোমার পার্সোন্যাল ইন্টারেস্ট আছে ?

—দাদি আমার স্প্যাট ?

বীরেন নাতির দিকে ঘুরে দাঁড়িয়ে বললেন—সেটা আবার কি ?

—ওই যে বাঘের মত ডোরাকাটা মাছটা।

—কাঁদবে না। বৌমা যে কটা ভেসে উঠেছে সব কটা তুলে ফেল। দাদু তোমার বাবাকে একটা লিস্ট করে দাও ! আজই সব কটা কিনে আনবে। আর শোন, চিকেন হার্টেড হলে শখ-শৌখিনতা চলে না। অ্যাকোয়ারিয়ামটাকে তুমি বড় কর। স্পেসটা বাড়াও। আমি আগে এত ভাল করে দেখিনি। তন্ময় করে দেয় হে। ইট ইজ এ নাইস হবি !

হীরেন ব্যাপারটাকে পরিষ্কার করার জন্যে জিজ্ঞেস করল—তাহলে এটা থাকবে ?

—অফ কোর্স ! শুধু থাকবে না, বহাল তবিয়তে থাকবে, বড়সড় হয়ে থাকবে। কিন্তু দাদু তোমার প্রতিজ্ঞা ভুলবে না ত ?

—না দাদি, অঙ্কে আশি, ইংরেজীতে সত্তর।

—মিনিমাম সত্তর, বাংলায় সত্তর মিনিমাম, অন্যান্য সাবজেকটে মিনিমাম আশি।

বাইরে থেকে তারকবাবুর ডাক এল—কই হে বীরেন, আজ এখনও বেরোও-নি, আর কখন বেরোবে, সূর্য যে টাকে উঠল।

বীরেন ব্যস্ত হলেন—দাও, দাও ছড়িটা দাও। যাচ্ছি হে।

—কী করছ কী ?

বীরেন বেরোতে বেরোতে বললেন—সংসারের চাঁদোয়ায় তালি মারছি।

দুই বৃদ্ধ পাশাপাশি হাঁটছেন। তারকবাবু বলছেন—বেশ আছ।

—কেন থাকবো না। তুমি যে আছ সেটা সংসারকে মাঝে মাঝে জানান দিতে হয় বুঝেছ, তা না হলে থাকা আর না-থাকা দুটোই সমান। সংসারের স্থির জলে মাছের মত মাঝে মাঝে ঘাই মেরে উঠতে হয়---হাম হায়, হাম হায়।

দুই বৃদ্ধের বগলে ছড়ি। প্রয়োজন নেই তবু প্রথা। ক্যাম্বিসের জুতো পায়ে জোরে জোরে হাঁটছেন। কখনও হাত নড়ছে, কখনও ঘাড় নড়ছে। মাঝে মাঝে বগলের ছড়ি হাত ধরে রাস্তায় নামছে।

সেই দিন সন্ধ্যায় নিউ মার্কেটের সামনে উদভ্রান্ত একটি মানুষকে দেখা গেল। নিচু হয়ে ফুটপাথে বসে থাকা একটি লোককে জিজ্ঞেস করছে---পার্ল গোরামি হায়?—হায়।

লোকটি একটা শিশি উঁচু করে দেখাল।—স্পাট?

---হায়। টাইগার বার—হায়।

হীরেন গোটা তিরিশ টাকার মাছ কিনে বাড়ি ফিরছে। কোলের ওপর থলথলে জলভর্তি প্লাস্টিকের ব্যাগ।

হীরেনের পাশে বসেছেন এক ভদ্র-মহিলা। কোলে একটি মাঝারি মাপের দুর্দান্ত শিশু। হীরেন আর শিশুটিতে থাবার লড়াই চলেছে। হীরেন একটু অন্যমনস্ক হলেই শিশুটি যে কোনও একটা ব্যাগে থাবা মেরে দিচ্ছে। হীরেনও সঙ্গে সঙ্গে পাল্টা থাবা মেরে সরিয়ে দিচ্ছে। মহিলাটি উদাসী ধবনের। কোনও গ্রাহ্যই নেই। হাঁ করে জানালার বাইরে তাকিয়ে আছেন।

নিঃশব্দে থাবার লড়াই চলেছে। মিনিবাস চলেছে, লাফাতে লাফাতে। ছেলেটি হঠাৎ হীরেনের কান মলে দিল। হাতে খিমচি কেটে দিল। হীরেনের সঙ্গে কিছুতেই সুবিধে করতে না পেরে, উদাসী মায়ের মুখটা কচি কচি হাত দিয়ে প্রাণপণে নিজের দিকে ঘোরাবার চেষ্টা করতে করতে চিল চেঁচান চেঁচাতে লাগল---মা, মাছ, মাছ, মা, মা, মাছ, মাছ, মা।

সাত মাইল পথ হীরেন এইভাবে এল। সমস্ত যাত্রীর চোখে কঠোর দৃষ্টি।

হীরেনের কানে তালা লেগে গেছে। সে কিছুই শুনতে পাচ্ছে না। বাড়ি ঢুকছে তালে তালে পা ফেলে---মা, মাছ, মাছ, মা, মা, মাছ, মাছ, মাছ, মা।

বড় অ্যাকোয়ারিয়ামের দরজা খুলে গেল। অপর্ণাই খুলেছে। পেছনে একটি শিশুর মুখে উৎসুক বড় বড় চোখ। হীরেন মন্ত্রের মত বলছে—মা, মাছ, মাছ, মা, তালে তালে গতি তার বসার ঘরের দিকে।

অপর্ণা হঠাৎ চিৎকার করে বলল---দেখি, কি খেয়েচো, হাঁ করত।

হীরেন অপর্ণার নাকের সামনে হাঁ করতেই তার কানের তালা খুলে গেল আর শুনতে পেল তার ছেলের সোল্লাস চিৎকার, মা-মাছ। মাছ-মা।

এ ব্লেড হ্যাজ ফোর সাইডস্। তিন দিন মোটে কামিয়েছে। তার মানে একটা দিক এখনো অব্যবহৃত। কিন্তু কোন্ দিকটা? রোজই মনে রাখার চেষ্টা করে। রোজই ভুলে যায়। সামান্য একটা হিসেব। এক, দুই, তিন, চার। তাও খেয়াল থাকে না! কি যে তোর মাথা বংকু! সকাল ন'টার সাইরেন অনেকক্ষণ বেজে গেছে। সাত মাইল দূরে অফিস। অনেক বাধা ঠেলে সাড়ে দশটার মধ্যে যেমন করেই হোক পৌঁছোতে হবে। এদিকে চারটে আসল কাজ বাকি। ক্ষৌরী খাজানা, নাহানা, খানা, পরনা। প্রথম কাজটাই আটকে গেছে। ব্লেডের হিসেব গোলমাল করে ফেলেছে।

সকাল থেকেই আজ সব ট্রেন লেটে চলেছে। গতকাল বঙ্কিমের এক সম্বন্ধীর বিয়ে ছিল। বিয়ে হয়েই ছিল। গতকাল গেছে বৌ-ভাত। এক পেট আবর্জনা নিয়ে শুতে শুতেই একটা বেজেছে। সারা রাত প্রায় ঘুম নেই। জঠরে বিভিন্ন সুখাদ্যের লাঠালাঠি। পরিপাক যন্ত্রের নির্দেশ কেউই মানতে চাইছে না। আটখণ্ড মাছ জোড়া লেগে বিশাল কালবোস হয়ে এ পাশ থেকে ওপাশ খেলে খেলে বেড়াতে চাইছে। কয়েক টুকরো মাংস বিগত জীবনের শোক ভুলতে পারছে না। মাঝে মাঝে ব্যা ব্যা করে উঠছে।

ফ্রায়েড রাইস সমস্ত স্নেহবস্তু ত্যাগ করে সুইড পালিউশানের দায়ে এক কোণে আলো চাল মেরে বসে আছে। এই হট্টগোলে দধি বেচারা পশু চর্বির ভার মুক্ত করে সমস্যা আরো সাংঘাতিক করে তুলেছে। গোটা কতক কমলাভোগ ক্রিকেট বলের মত কেবলই বোল্ড আউট করার চেষ্টা করছে। পাকযন্ত্র হাল ছেড়ে দিয়ে বসে আছে। আমি হলুম গিয়ে ঝোলভাতের যন্ত্র, তুমি ঠুসেছো মোগলাই খানা! আই হ্যাভ নো রেসপনসিবিলিটি, তোমার মাল তুমি বুঝে নাও। মাঝ রাতে বিনিদ্র বঙ্কিম জোয়ানের আরক খেতে খেতে সার বুঝেছে, অনুরোধে হয়তো ঢেঁকি গেলা যায় কিন্তু হজম করা যায় না। আর একটা জিনিস বুঝেছে, আড়াইশো টাকা এখনো এই বাজারেও খেয়ে উসুল করা যায় না।

কড়কড়ে টু হাণ্ড্রেড এণ্ড ফিফটি রুপীজ। সামান্য একটি সোনার বালা। নতুন বৌয়ের গোল গোল শ্যামলা হাতে মানিয়েছে জবর। ওমা! দেখি দেখি বড় জামাই কি দিয়েছে? বাঃ বেশ দিয়েছে। এই বাজারে বেশ দিয়েছে। মেয়ে মহলের প্রশংসায় বঙ্কিমের বুক দশ হাত না হলেও বঙ্কিমের স্ত্রী প্রতিমার চলার ঠমক খুলেছে। কোমরে কাপড় জড়িয়ে সে কি দেমাক! জ্যালজেলে শাড়ি নয়, অপাঠ্য বই নয়, ডিফেক্টিভ টেবিল ল্যাম্প নয়, প্লাস্টার অফ প্যারিসের বিদঘুটে কোন মূর্তি নয়, আস্ত একটা সোনার বালা ঝেড়ে সব শালাকে কুপোকাত করে দিয়েছে। অবশ্য এই বালা নিয়ে তার আগে বঙ্কিমের সঙ্গে অনেক চুলোচুলি হয়ে গেছে। তিন রাত দুজনে এক খরে ঘুমোয় নি। দুদিন নির্জলা উপবাস। সাতদিন কথা বন্ধ। বঙ্কিম বলার মধ্যে বলেছিল, একটা দুটো শালা শালী হলে লোকে দামী কিছু দেবার কথা ভাবতে পারে। মা ষষ্ঠীর কৃপায় সংখ্যায় তো নেহাত কম নয়। আগের তিন শ্যালক আর এক শ্যালিকাকে সাড়ে তিন পয়সা সোনার কানের ঠিকরে দুল দিয়ে জামাইকৃত্য করেছে, তখন সোনার দাম কম ছিল, নিজের সংসার ছোট ছিল। এখন দুটোই বেড়েছে। অতএব বাড়াবাড়ি করাটা ঠিক হবে না। তাছাড়া আরো দু'জন লাইন দিয়ে আছে। বছর না ঘুরতেই টোপর পরার জন্যে মুখিয়ে আছে। এদিকে শালাজরা একটি করে আণ্ডা পাড়ছেন আর অন্নপ্রাশনের স্টেনলেস স্টিলের থালাবাটি কিনতে কিনতে বঙ্কিম ক্রমশই বোম মেরে যাচ্ছে। কাকে সামলাবে! বড়র মেয়ে হল, তো মেজো একটি ছেলে দিলেন। অমনি বড় কোমর বেঁধে লাগলেন।

ছেলের জন্য। মেজো টেক্কা দিয়ে যাবে সহ্য হবে কেন? রেজাল্ট আবার মেয়ে। এদিকে সেজো সকলকে টেক্কা দিয়ে একসঙ্গে দুটি ছাড়লেন। প্রবল প্রতিযোগিতা। ঘরদোর বাড়ি উঠোন নবজাতকে ছয়লাপ। অনবরতই চ্যাঁ ভ্যাঁ।

বঙ্কিম বলতে চেয়েছিল, সোনার এখন প্রচণ্ড দাম, একটা ভাল শাড়ি দিয়ে ছেড়ে দাও। তা কি করে হয়? এই ভাই আমার সবচেয়ে আদরের ভাই। ট্যাঁকে করে মানুষ করেছি। একটা ভারি কিছু না দিলে প্রেসটিজ থাকে না। আরে ম্যান তুমি এত রোজগার করছ? বিয়ে ত একবারই করে লোকে। এর পরের কাজ তো অনেক পরে। বঙ্কিম খুঁত খুঁত করে বলেছিল, তাহলে সেই পেটেন্ট দুল। তিন পয়সার সোনা।

'না না দুল নয়।' প্রতিমার ঘোরতর আপত্তি। 'দুল একঘেয়ে হয়ে গেছে। প্রতি কাজেই দুল গেছে। এবার অন্য কিছু।'

'অন্য কিছুটা কি? হীরের আংটি!' বঙ্কিম খিঁচিয়ে উঠেছিল।

'হীরের আংটি দেবার মুরোদ আছে তোমার?' প্রতিমা একটু মোচড় মেরেছিল।

'কেন নেই। তুমি চাইলেই আছে। বাড়িটা বেচে দিয়ে তোমার পেয়ারের ভাইয়ের বৌয়ের আঙ্গুলে হীরের আংটি তুলে দি।' বঙ্কিম ইসুটাকে আরো একটু ঘোরালো করে তুলল, 'আমার বিয়েতে তোমার বাপের বাড়ি থেকে যা দিয়েছিল সবই তো প্রায় উসুল করে নিয়েছো আর গোটা বত্রিশ টাকা হয়তো পাওনা আছে।'

এরপর প্রতিমা আর কথা বাড়ায় নি। মুখ তোলা হাঁড়ি করে সংসারের কাজে লেগেছিল। বঙ্কিমও বিশেষ আমল দিতে চায়নি। তোমরা সব বিয়ে করে, খাট, বালিশ, বিছানা, ফার্নিচারে বাড়ি ঠেসে ফেললে। মোটা মোটা বৌ। মোটা মোটা নগদ। ভাল ভাল তত্ত্ব। টেরিলিন, টেরিকটন, ঝকঝকে জুতো, চকচকে চেহারা। এদিকে বঙ্কিম বেচারার হাঁড়ির হাল। তার বেলায় এক কাঁদুনি, কে করবে। শ্বশুরমশাই গত হয়েছেন। তিনি থাকলে সবই হতো। ছেলেরা যে যার সে তার। না করলে জোর তো করা যায় না। প্রতিমার যুক্তি, তুমি ভিখারি না কি? তুমি আমার রাজা। পরের ধনে পোদ্দারি করবে কেন? নিজের রোজগারে লড়ে যাও ম্যান।

[illegible] হয়েছে। রেডের যে কোনো এক দিক ঘুরে চাপাও। গালে

পড়লেই ধার বোঝা যাবে। বঙ্কিম আর হিসেবের ঝামেলায় যেতে চাইল না। কোন্ হিসেবটা সে শেষ পর্যন্ত রাখতে পেরেছে! মধ্য মাসেই মাইনের টাকা ফৌত। বাকি ক'টা দিন, এটা ধরে টান, ওটা ধরে টান। তখন সে খেচর, ভূচর, জলচর। দাড়িতে একটা টান মেরেই বঙ্কিমের মালুম হল ব্লেডের হিসেব মেলেনি। হে' হে' বাবা, অতই সোজা! এক চান্সে মিলে যাবে। জীবনে মেলেনি। আজ মিলবে। ছাত্রজীবনে এক-দিনের জন্যেও হাজার চেষ্টা করে 'সরল কর'র উত্তর শূন্য কিম্বা এক হয়নি। সব সময় একটা বিদঘুটে ভগ্নাংশ পূর্ণ-ফূর্ণ নিয়ে তলায় এসে থিতোতো। দেখলেই চক্ষুস্থির। বঙ্কিমের শিক্ষকরা বলতেন, 'ছোকরার এলেম আছে। কোথা দিয়ে যে কি করে বসল। উত্তর দেখছো এক পূর্ণ দুশো তেত্রিশের ন' হাজার তিন; বলিহারি বাবা।' শেষে বঙ্কিমের এক বন্ধু পথ বাতলে দিলে। ট্রাই ইয়োর লাক। হয় শূন্য, না হয় এক। এক কাজ করবি, ধর, দুশো বত্রিশের পাঁচশো তের হয়েছে। ঘাবড়াও মাৎ। পাঁচশো তেরর দুশো বত্রিশ দিয়ে গুণ করে দে। ইজিকোয়ালটু ওয়ান! উত্তর যদি শূন্য না হয় ফুলমার্ক। আর যদি শূন্য করতে চাও যা হয়েছে সেই সংখ্যাটাই মাইনাস করে দাও। শূন্য কি এক? এক কি শূন্য? এইটা ঠিক করার মধ্যেই একটু ফটকাবাজী রয়ে গেল। ওটুকু রিসক্ তোমাকে নিতেই হবে। নো রিসক্ নো গেন।

ব্লেডটাকে আবার উল্টে লাগালে বঙ্কিম। ভাবলে রিসক্টাই নিলুম সারা জীবন গেনটা ছাই হল কি। শূন্য আর একের ঘোরপ্যাঁচে পড়ে ফুলমার্ক আর ভাগ্যে জুটলো না। গালের সাবান শুকিয়ে খুসকির মত উড়তে শুরু করেছে। অন্যদিন আটটার মধ্যেই দ্বিতীয় পক্ষের চা এসে যায়। আজ প্রায় সাড়ে ন'টা বাজতে চলেছে। সম্বন্ধীর বিয়েতে বঙ্কিমের বাড়ির অবস্থা দেখলে মনে হবে মড়ক লেগেছে। সব কিছুই এলোমেলো। দেরীতে সব ঘুম থেকে উঠেছে। ঘরে ঘরে দোমড়ানো চটকানো বিছানা। প্রতিমার নীলাম্বরী আলনায় জড়ভরত। ব্লাউজ মাটিতে লুটোচ্ছে। উঁচু গোড়ালির জুতো যথাস্থানে নেই। সকালের শুঁড়িখানার মতো লণ্ডভণ্ড অবস্থা। শরীর যখন নিচ্ছে না বিয়ে বাড়িতে নাচতে কুঁদতে যাওয়া কেন? সকালে একবারই প্রতিমাকে খুব কাছ থেকে দেখার সৌভাগ্য হয়েছিল। বাসী নায়িকার মত চেহারা। চোখে অস্পষ্ট কাজল। মুখের এখানে-ওখানে প্রাচীন দেয়ালের মত চটা ওঠা মেকআপ। পরিপাটি খোঁপা যেন থ্যাতলানো গোলাপের কুঁড়ি। উপরন্তু ভোরের ঝোঁকে যে

এত অশ্লীল দেখায়, বঙ্কিমের ধারণা ছিল না। ঠোঁটে আবার ফাটা ফাটা পানের রসের ছোপ। লাখ টাকা দিলেও ও ঠোঁট চুম্বনের অযোগ্য।

জুলপির কাছে ব্লেডের কোপ বসিয়ে বঙ্কিম নিজে নিজেই বললে, চায়ের সেকেণ্ড এডিশানের আশা ছাড়ো মানিক। সকাল থেকেই তো দফায় দফায় ইণ্টারভিউ। প্রতিবেশীদের, ভায়ের বৌভাতের ফিরিস্তি দেবে না, চা তৈরির মত একটা তুচ্ছ কাজে সময় নষ্ট করবে। ওঃ, খুব করেছে ভাই এই বাজারে। মাছ? এই চাকা চাকা দাগা। যত পারো খাও। এক হাজার কমলাভোগ এখনো ভাড়ারে গড়াগড়ি যাচ্ছে। সাত হাঁড়ি দৈ, হাত পড়ে নি। হিসেব নেই তো! সব ভাইয়ের দিলই তো হাওদাখানা!

তোমার মুখেই শুনলাম হাওদাখানা। বঙ্কুবাবুর বেলাতেই যত কৃপণতা। জামাই ষষ্ঠীতে একবারই তোমার কোনো এক দিলদার ভাই একটা দিশী কাপড় কিনেছিল। কেনার সময় মনেই ছিল না বড়-জামাই প্রমাণ সাইজের একটা লোক। কিনে নিয়ে এল একটা খোকা-কাপড়। বহর বোধ হয় আটত্রিশ ইঞ্চি, লম্বা আট-হাত, বড় জোর ন-হাত। বেহিসেবী ঠিকই। তবে জামাইয়ের ব্যাপারে অলওয়েজ অন দি মাইনাস সাইড। তবু প্রতিমা ভায়েদের ডিফেণ্ড করে গেল। খাটো ঝুলই তো ভাল গো। কত কনসিডারেট। পাছে বোন বিধবা হয় সেই ভয়ে ছোটো কাপড় দিয়েছে। বাসে ট্রামে ওঠার সময় অসাবধানে পায়ে জড়িয়ে যাবার নো চান্স! একেই বলে সেফটি ধুতি।

বঙ্কিম বলেছিল, 'রোড'সেফটি উইকে পরে বি-বা-দী বাগে সাদা দাগের ওপর দিয়ে হেলেদুলে রাস্তা পার হব, কি বল?'

দাড়িতে ব্লেডেতে যখন কিছুতেই বনিবনা হচ্ছে না, প্রতিমা তখন দুধের সর ভাসা এক কাপ চা নিয়ে প্রবেশ করল। মেঝেতে থেবড়ে বসে বঙ্কিম দাড়ি-মুক্তো হবার চেষ্টা করছিল।

'ধরো ধরো।'

'রাখো না।'

নিচু হবার কষ্টটাও মহিলা স্বীকার করতে চায় না। পারলে বঙ্কিমের চাঁদিতেই কাপটা বসিয়ে দিয়ে যায়। এমন কিছু ভুঁড়ি নেই। বয়সও তত নয় যে কোমরে আথ্রাইটিস হয়েছে বলে বিশ্বাস করতে হবে। হাপরের মত একটা

শব্দ করে প্রতিমা জলভর্তি প্লাস্টিকের মগের পাশে চায়ের কাপটা নামিয়ে রেখে সোজা হয়ে দাঁড়াল। একটু চা ছলকে ডিশে পড়ল। বঙ্কিম একবার আড়চোখে তাকাল। চায়ের কাপ, জলের মগ, দাড়ি কামাবার বুরুশ, সেভিং ক্রিমের টিউব, চাকা, কৌটো, সেফটি রেজারের খাপ, ছোটো তোয়ালে, ব্লেডের কাগজ, ফুটখানেক দূরে প্রতিমার ফুলো ফুলো পা। সায়ার ফ্রিল। পায়ের পাতায় জলের ছিটে। প্রতিমা অবাক হয়ে জিগ্যেস করলে, 'তুমি বেরোবে নাকি?'

'হুঁম।'

'নাই বা বেরোলে আজ!'

'অফিসটা আমার মামার বাড়ি নয়।' গলার নিচে থেকে ওপর দিকে ব্লেড চালাতে চালাতে সংক্ষিপ্ত উত্তরে বঙ্কিম তার মনের ভাব জানিয়ে দিলে।

'মামার বাড়ি নয় সে আমিও জানি। এমনি হাজার দিন কামাই করছ। আজকে যেতে হবে না। এই বলছিলে হজম হয় নি, রাতে ঘুম হয় নি। চানটান করে একটু শুয়ে পড়।'

'হজম হয় নি বলে চাকরিটা তো আর হজম করতে পারি না। চাকরি ইজ চাকরি। এরপর একবারেই শুইয়ে দেবে। তখন সংসার সামলাবে কে? তুমি না তোমার ভায়েরা?'

'ভায়েরা কোন্ দুঃখে সামলাবে! তাদের সংসার নেই! তোমার সংসার তুমি সামলাবে।'

'তবে আমার ব্যাপারে নাক গলাতে এস না দয়া করে।'

'সকাল থেকেই বাবুর মেজাজ একেবারে সপ্তমে। বাপ বললে শালা বলতে আসছে।'

'হ্যাঁ আসছে। যার ছত্রিশটা শালা তার গলা দিয়ে অষ্টপ্রহর হরিনামের মত শালা শালাই বেরোবে।' বঙ্কিম উত্তেজনায় সাবানমাখা বুরুশটা জলের মগের বদলে চায়ের কাপেই ডুবিয়ে দিলে। 'যাঃ শালা। চা-টাই গেল। সেই ফুল পড়ার মত তাকিয়ে থেকে থেকে যদিও এক কাপ ছ্যাকরা চা জুটলো, কানের কাছে তোমার বকবকানির চোটে তাও গেল।'

'আমি আর করে দিতে পারবো না। খেতে হয় ওই চা-ই খাবে না হয় ফেলে দেবে।'

'সে আমি জানি। কাজের সময় কাজি, কাজ ফুরোলেই পাজি। যতদিন,

বালাটা আদায়ের প্রয়োজন ছিল, ততদিন না চাইতেই চা, না চাইতেই জল। কাল সন্ধ্যে থেকেই তোমার অন্য মূর্তি। সব শালাকেই আমার চেনা আছে শালা। চায়ের ভয় দেখিও না। দোকান আছে, পয়সা ফেলবো কাপ কাপ চা খাবো, মিনিটে মিনিটে খাবো। তোমার পরোয়া করি।'

'কে কার পরোয়া করে। আজকাল কেউ কারুর পরোয়া করে না বুঝলে দোস্ত। দোকানে শুধু চা-ই জুটবে, অন্য কিছু জুটবে না!'

'সব জুটবে, সব জুটবে। পয়সা ফেললে সব জুটবে। মাসে একটা করে সোনার বালা ছাড়লে আরও অনেক কিছু জুটবে, বুঝেছো? মোনোপলির যুগ শেষ হয়ে গেছে।'

'তাই জোটাও। জুটিয়ে যে রাখনি তাই বা কে জানছে। তোমার প্রাইভেট লাইফের খবর কতটুকু জানি? অফিস অফিস করে কেন এত পাগল? বুঝি না ভাবো? কাজ তো যা কর জানাই আছে! তুমি একদিন না গেলে অফিস উল্টে যাবে না! ওই কাঁধ-কাটা, পেট-কাটা, পিঠ-কাটা মেয়েছেলের ধান্দা! সারা দিন বিনা পয়সার ফষ্টি-নষ্টি!'

'হ্যাঁ অফিসটাতো কুঞ্জবন, সেখানে সব রাধিকারা সেজেগুজে এই বুড়ো কেষ্টর জন্যে কদমতলায় বসে আছে। মোস্ট লাইবেলাস রিমার্ক। কোর্টে মান-হানির মামলা ঠুকে দেওয়া যায়।'

'বুড়ো কেষ্টদের তো সবচেয়ে বেশী ভয়। খাচ্ছ মাল। ডুবে ডুবে জল খায় শিবের বাবাও টের পায় না।'

বঙ্কিম সেফটি রেজার থেকে গম্ভীর মুখে ব্লেড খুলতে খুলতে বললে, 'প্লিজ, প্লিজ, মেছুনীদের মত তর্ক কোরো না। বালা হয়ে গেছে, এখন আর আমার সঙ্গে নো রিলেশান। আবার অন্নপ্রাশন আসছে। ভয় নেই, তখন সংসারের ডালে বসে আবার তোমার কোকিলকণ্ঠ শোনা যাবে। তোমাকে আমার স্টাডি করা হয়ে গেছে। স্বার্থপরতা ইনকারনেট।'

'বালা বালা করে দেখছি পাগল হয়ে যাবে। ঠিক আছে, আজই আমি নতুন বৌয়ের হাত থেকে বালা খুলে এনে তোমার নাকের ডগায় ছুঁড়ে ফেলে দেব। কঞ্জুস কাঁহাকা।'

'মুখ সামলে। ডোণ্ট ফরগেট, আই অ্যাম ইওর হাজব্যাণ্ড। গুরুজন। তুমি হিন্দু নারী। পতি পরমগুরু।'

'সে রকম পতি হলে গুরু বলে মান্য করা যায়। তোমার মত পতির পত্নী

হয়েছি এই তোমার সাত পুরুষের ভাগ্য।'

'তাই নাকি? বেশ বুলি ফুটেছে তো। আর যে বাড়ির মেয়ে, কথাবার্তায় এর থেকে ভাল ছিরি অবশ্য এক্সপেক্ট করা যায় না। মোস্ট আনসিভিলাইজড ব্রুট।'

'আমাকে বলছো বল, খবরদার বাড়ি তুলবে না। বাড়ি তোলা মানেই বাপ তোলা। জেনেশুনেই তো বিয়ে করেছিলে। কে বলেছিল বিয়ে করতে, না করলেই পারতে।'

'তাই নাকি? মনে নেই. তোমার মা যখন হাতে ধরে, কান্নাকাটি করেছিলেন, বাবা আমার মেয়েটাকে নাও বড় ভাল মেয়ে, তোমাকে একটু ইয়েও করে।'

'মার বয়ে গেছে তোমার হাতে ধরতে, আমারও বয়ে গেছে তোমাকে ইয়ে করতে। কত ইঞ্জিনীয়ার, ডাক্তার, ব্যারিস্টার ছিল। আচ্ছা আচ্ছা সব ছেলে ছিল।'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ জানা আছে। হাজার টাকায় ব্যারিস্টার জুটতো?'

'হাজার কেন, দরকার হলে বাবা পঞ্চাশ হাজার খরচ করতেন। টাকার অভাব ছিল না কি?'

'ও'! টাকার অভাব ছিল না? তাহলে আমার বেলায় দায়সারা করলেন কেন চাঁদু?'

'তোমার মত বস্তুর জন্যে যে দাম দেওয়া উচিত তাই দিয়েছেন।' প্রতিমা শেষ তোপটা দেগে দিয়ে উত্তরের অপেক্ষা না করেই ফরফর করে ঘর ছেড়ে চলে গেল। সাবান গোলা এককাপ চা নিয়ে ক্রেস্টফলন বঙ্কিম ছড়ানো দাড়ি কামাবার সামগ্রীর মধ্যে কিছুক্ষণ গুম হয়ে বসে রইল। পেটে শ্বশুরবাড়ির বদহজমের মাল। মনে প্রতিমার খোঁচা। চিবুকে অস্পষ্ট দাড়ি খিচখিচ করছে অন্যাদিনের মত ভেলভেট সফট্ হয়নি।

আয়নায় নিজের মুখের প্রতিফলন-এর দিকে বঙ্কিম ফ্যাল ফ্যাল করে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল। আয়নার মুখ যেন বলছেঃ হায় বঙ্কিম, কা তব কান্তা, কস্তে পুত্র, সংসারোহমতীব বিচিত্র কস্য ত্বং বা কুত আয়ত। চোখের কোণে কালি পড়েছে বাপি, দৃষ্টি ক্রমশ সরে আসছে। আর কেন? জয় শিবা শম্ভু, উধার দে মকান লাগা দে তাম্বু। চলো ব্যেটা, গঙ্গা যমুনা তীর। আশার ছলনে ভুলি কি ফল লভিলে মানিক। ছিলে এক, হয়েছো তিন। আর কিছুকাল পরে হবে চার, তার পর হয়তো পাঁচ। নিউম্যাব্রিক্যালি তুমি

বাড়তেই থাকবে। উত্তাপে বীজ তাড়াতাড়ি অঙ্কুরিত হয়। এখনো সময় আছে, বি কেয়ারফুল ম্যান।

'কি ভাবে গুরু?' আসল বঙ্কিম প্রশ্ন করল প্রতিফলিত বঙ্কিমকে।

'তবে শোন একটা কাহিনী। বরাহ অবতাররূপী নারায়ণ হিরণ্যাক্ষকে বধ করে নিজের স্বরূপে ভুলে গেলেন। কমপ্লিট ওবলিভিয়ান। ছানাপোনা নিয়ে সংসার পেতে বসলেন। এটাকে দুধ খাওয়াচ্ছেন। ওটার গা চেটে দিচ্ছেন। কেলেঙ্কারি কান্ড! দেবতাদের মাথা ঘুরে গেল। হায় নারায়ণ। হিরুকে মারতে গিয়ে একি ফ্যাসাদ বাধালে প্রভু। ল্যাজারাস গোবেরাস অবস্থা। তুমি তো রিয়েল বরাহ নয়। বরাহ হয়েছিলে ফর এ গ্রেট কজ। এ দেখছি প্লে বিকেম এ টাস্ক। উঠে এস প্রভু। স্বর্গে তোমার সোনার পালঙ্ক, নারায়ণী সেজেগুজে সালঙ্কারা। অপ্সরারা নৃত্যগীত করছে। আতর ছড়াচ্ছে। আর তুমি কিনা আস্তাকুড়ে ছানাপোনা নিয়ে ঘোঁত ঘোঁত করছ। এ কি সাংঘাতিক আত্মবিস্মৃতি। বুড়ো বুড়ো দেবতাদের দিকে আঙুল তুলে নারায়ণী বললেন, 'দিস ইজ ফর ইউ। বয়োজ্যেষ্ঠ আপনারা। অনবরত একটা না একটা উপদ্রব তৈরি করে, আজ বরাহ, কাল নৃসিংহ, পরশু কুর্ম করে আমার ঘরসংসারের বারোটা বাজালেন। এবার সবকটার মুখে নুড়ো জেবলে, খেংরে বিষ ঝেড়ে দেবো। মাতাল, লম্পটের দল।

দেবতাদের মুখ চুন। নারায়ণটার কি বুড়ো বয়েসে ভীমরতি হল। তুই দেবতা জন্ম ভুলে শূকর সেজে শূকরীর সঙ্গে সংসার পাতলি। ইডিয়েট!

শেষকালে দেবতাদের সভায় শেষ রাতে স্থির হল, নারদকো বোলাও।

নারদ চোখ রগড়াতে রগড়াতে রাগ রাগ মুখে এসে ঢুকলো। তার শরীরটা ভালো না।

দেবরাজ বললেন, 'নাড়ু, নারায়ণকে যে সেভ করতে হবে। বেচারা মর্তে গিয়ে বেহেড হয়ে গেছে।'

নারদ বলল, 'আমি স্যার এখন মর্তে যেতে পারবো না, আমার শরীর খারাপ।'

দেবরাজ বললেন, 'তোমাকে যে একবার বরাহরূপী নারায়ণের কাছে যেতেই হচ্ছে।'

এই ভয়টাই নারদ করেছিল। কিন্তু কী আর করা, দেবরাজের হুকুম। শেষে নারদ ঢেঁকিতে করে বরাহ অবতারের কাছে গিয়ে ল্যান্ড করল।

বললে, 'এই যে গুরু, মেমোরিটা একবারে গুলে খেয়ে বসে আছ যে। এটা তো তোমার আসল রূপ নয়।'

বরাহ প্রথমে অ্যাটাক করতে এল। নারদ প্রস্তুত ছিল। 'নারায়ণ নারায়ণ' বলে বার কতক খোঁচাখুঁচি করতেই, শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্মধারী বেরিয়ে এলেন। নারদকে জড়িয়ে ধরে বললেন, 'দোস্ত! মাই সেভিয়ার! কিন্তু মন্দ ছিলুম না হে। আহার নিদ্রা, বেড়ে লাগছিল। বাট পাস্ট ইজ পাস্ট। চলো কেটে পড়ি।'

আয়নার বঙ্কিমকে বঙ্কিম বললে, 'ধান ভানতে শিবের গীত গাইলে কেন? হোয়াট ইজ দি মিনিং? তুমি বলতে চাইছো, পঞ্চভূতের ফাঁদে পড়ে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ কাঁদে তাই তো?'

'এগজ্যাক্টলি!'

'তা মাঝখানে ওইসব ভ্যানতারা করার কি দরকার ছিল? ছোট্টো দু'লাইনের স্টোরি উইথ এ বোল্ড সারমন। নিজের আসল সত্তাটাকে হারিয়ে ফেলো না। বি এ কর্মযোগী, দ্যাটস অল। জড়িয়ে পোড়ো না। সেই সার কথা, পাঁকাল মাছটি হয়ে পিছলে বেড়াও, সব সময় ওপর দিকে ওঠার চেষ্টা কর নিজের বোয়েন্সিতে।'

'তাইতো বলতে চেয়েছি, তোমার নিজের প্যাঁচালো, প্রভাবিত মনের রিফ্লেকসানে, সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলি, পুরাণ, বর্তমান সব এক করে ফেলেছো। তাই তো সাধক গেয়েছে, 'তারা কতদিনে কাটবে বল এ দুরন্ত কালের ফাঁস।'

বঙ্কিম তাড়াতাড়ি আয়নাটা উপুড় করে রাখলো। দার্শনিক বঙ্কিমকে উল্টে চাপা না দিলে আসল বঙ্কিমের অফিস যাওয়া মাথায় উঠবে। প্রায় দশটা বাজলো। বারোটা অবধি লেট অ্যাটেনডেনস চলে। তারপর অফিস যাবার আর কোনো মানেই হয় না। এদিকে পেটের যে রকম গুমোট অবস্থা! দ্বিতীয় কাপ চা-টা পেটে পড়লে হয়তো একটু কাজ হত। প্রতিমাকে খেপিয়ে দিয়েছে, এখন কিছুদিন বঙ্কিম একঘরে; ধোপা নাপিত সব বন্ধ। তোমার তালে তাল দিয়ে চলতে হবে, তাই না। তুমি আমার মানি প্ল্যান্ট দেখেছো, তাই না। নাড়া দিলেই টাকা পড়বে! ওঃ, সোনার বালা! বঙ্কিম মাথাটা এমনভাবে ঝাঁকালো, যেন তার সাজানো বাগান শুকিয়ে গেছে। তার নিজের বিয়ের আংটির সোনাটা তো গেছেই, প্লাস আরো কয়েক পয়সা সোনা, প্লাস

মজুরি। বিষ্ণুর দোকানে আড়াইশো টাকা ধার। যতদিন না দিতে পারছে আসা যাওয়ার পথে জুল জুল করে তাকিয়ে থাকবে।

ঘরের বাইরে প্রতিমার এলাকায় পা দিয়েই বঙ্কিমের ক্ষোভটা আবার উথলে উঠল। বিয়ে করে ঘোড়ার ডিম তার লাভটা কি হয়েছে! এর চেয়ে ব্যাচেলার থাকলে কত আরামে থাকতো। তাড়াহুড়ো না করলে আর একটু বাজিয়ে, দেখে শুনে বৌ আনা যেত। আর একটু চোখা নাক, টানা চোখ, ধারালো মুখ, আর একটু ভাল ফিগার, মৃদুভাষী, নম্র, সমর্পিতা, ছোটো নিট পরিবার। এ এক ডাকা হাঁকা ধ্যাদ্দেড়ে জিনিস। যত পুরোনো হচ্ছে তত আওয়াজ বাড়ছে।

বঙ্কিম যেন পৃথিবীর সবচেয়ে দুঃখী, ক্ষতবিক্ষত মানুষ। বাথরুমের দিকে যেতে যেতে বঙ্কিম বেশ জোরে জোরে বলল, 'যত সব থার্ড ক্লাশ ব্যাপার। প্রেজেনটেশানের লোভে ঝেঁটিয়ে নিমন্ত্রণ করছে আর যত সব পচা জিনিস গিলিয়ে মানুষ মারার তাল করছে। দেশের শত্রু, মার্ডারার!'

'মুখ সামলে!' প্রতিমা রান্নাঘর থেকে ফোঁস করে উঠলো। বঙ্কিম এইটাই চাইছিল। চেঁচামেচি করে অন্তত মনটা খোলসা হোক, 'মুখ সামলে কি। ফ্যাক্ট ইজ ফ্যাক্ট। এত জায়গায় নেমন্তন্ন খেয়েছি এ রকম পেটের অবস্থা কখন হয় নি। নেভার।'

'মাত্রা না রেখে খেলে ওই রকমই হবে। আমরাও তো খেয়েছি। আমাদের কিছু হল না, ওনারই সব হয়ে গেল।'

'তোমার যে বাপের বাড়ি! বাপের বাড়ির সব কিছু অমৃত সমান।'

'কোন্‌টা পচা ছিল—'

'প্রথম তেল। ওটা তেল নয়, ডিজেল। মাছগুলো মর্গ থেকে এনেছে। ওই বোগড়া চালে কোনো শিক্ষিত লোক ফ্রায়েড রাইস করে না। মাংস ধাপা থেকে তোলা। মিষ্টি কাগজের মণ্ড থেকে তৈরি। পেটে ওই মালের ধাক্কা সামলাতেও আরো দুশো যাবে। হাজার টাকার বালা দুশো টাকার ঠেলা। শ্বশুরবাড়ির নিকুচি করেছে।' বুরুশ ঝাড়তে ঝাড়তে বেশ জুতসই করে বঙ্কিম আক্রমণ শানিয়ে নিলে।

'ও, বালার দামটা মিনিটে মিনিটে বাড়ছে। আড়াইশো থেকে আধ ঘন্টার মধ্যে হাজারে উঠলো।'

'আজ্ঞে না, ঘর থেকে যে সোনাটা গেল তার দামটা তখন ধরা হয়নি।'

'সেটার আবার দাম কি? ও সোনা তো ও বাড়িরই। মাছের তেলে মাছ ভাজা।'

'বাঃ, ভাল যুক্তি! তার মানে তুমি বলতে চাইছো, বিয়ের সময় যা ছিটে ফোঁটা দিয়েছিল সব এইভাবেই উসুল করে নেবে?'

'উসুল করে নেবে কেন? তোমার কেনার ক্ষমতা থাকলে কিনে দাও। নেই বলেই এই অবস্থা। অন্য কোনো বৌ হলে এইভাবে ঘরের সোনা দিত বার করে? নেহাত আমার মত বৌ পেয়েছিলে তাই বর্তে গেলে।'

'আহা কি উদারতা! আমার কোনো রিলেটিভের বিয়ে হলে দিতে?'

'রামঃ, তোমার রিলেটিভরা আমাকে কি দিয়েছে, যে আমি দেবো। যারা দেয় তাদেরই গায়ে গায়ে শোধ করে দিতে হয়। একেই বলে শোধ বোধ। কিছু নিলেই কিছু দিতে হয়।'

'সমান সমান হতে আর কত বাকি?'

'ওঃ, এখনো অনেক বাকি? সমান সমান হতে সব ভাই ফুরিয়ে যাবে। আর তো মাত্র দু ভাই বাকি। এখনো এই চার চার আট গাছা চুড়ি আছে। গলার হার আছে। আমার আংটিটা আছে। আইবুড়ো বেলাব দুল আছে। নাকছাবি আছে।'

'আরো আছে। একটা পালিশওঠা খাট আছে, ছেঁড়া তোশক আছে, দাগ লাগা লেপ আছে, আমার বিয়ের পোকায়-ফুটো সিল্কের পাঞ্জাবিটা আছে, জোড়ের কাপড় আছে, একটা জলচৌকি আছে, স্টিলের ট্রাংক আছে, কয়েকটা কাঁসার বাসন আছে, আর আছে তোমার হাতঘড়িটা। ছেলেমেয়ে আধাআধি ভাগ। হাফ আমার, হাফ তোমার। তোমার হাফটা শ্বশুরবাড়িরই প্রাপ্য।'

'ওদের অতটা ছোটলোক ভেবো না। তোমার মত অত চুলচেরা হিসেবে ওরা চলে না।'

'খুব চলে। তা না হলে তোমার এই রকম স্বভাব হয়। এ বাড়ির অর্দ্ধেক মালই তো ও বাড়িতে পাচার। ওদের হল সেই থিয়োরী—জমি যার ফসল তার। আমি হলুম ভাগ চাষী, তোমার সয়েলে বারো বছর চাষ করছি। ফসল সব ওই গোলায়! আমার ভাগে বুড়ো আঙুল। একটা হিসেব তোমাদের হিসেব থেকে বাদ পড়ে গেছে। আর সেই হিসেবের বেলায় জেনে শুনে অন্ধ হয়ে থাকাই ভাল।'

প্রতিমা ঘেঁস ঘেঁস করে লাউ কাটতে কাটতে বললে, 'সেটা কি? আমার হিসেবে ওদের এখনো অনেক পাওনা।'

বঙ্কিম মাথায় তেল মাখতে মাখতে বলল, 'এই যে বারোটি বছর তোমাকে ভাত কাপড়ে পুষছি, তার কস্টটা তো বাছাধন করে দেখোনি। ডেলি এক সের চাল, এক চাকা মাছ, আলু-পটল, কপি-মুলো কচু-ঘেঁচু, গাজর-মাজর চা-চিনি ডাল-দুধ, শাড়ি-জুতো, সিনেমা-থ্যাটার। এসব দেবোত্তর প্রপার্টি থেকে হচ্ছে, না গৌরী সেনের ফাইনানসে!'

'তার বদলে সার্ভিস যা পাচ্ছ চার ডবল।'

'আরে যাও, মাসে একশো টাকা দিয়ে একটা মেয়েছেলে রাখলে টোয়েন্টি ফোর আওয়ার্স আমার সেবা করতো। তাকে হুকুম করা চলত। তটস্থ হয়ে থাকতো। তোমার মত মাথায় চড়ে বসত না। আমার ব্লাডার লিক করে দিত না। যে নৌকোয় চড়ে নদী পার হচ্ছে সেটার তলা ফাঁসাবার জন্যে আকুলি-বিকুলি করত না। একে কি বলে জানো, সাবোতাজ, অন্তর্ঘাত।'

প্রতিমা আধখানা লাউ ধমাস করে আনাজ রাখার চুবড়িতে ফেলে, উহু উহু করে উঠলো। বঙ্কিম আড় চোখে দেখল। আঙুলের মাথা থেকে ঝাঁজিয়ে রক্ত পড়ছে। প্রতিমা উঠে দাঁড়াল। কয়েক ফোঁটা গাঢ় লাল রক্ত মেঝেতে পড়েছে। কুঁচো কুঁচো সাদা নরম লাউ জায়গায় জায়গায় লাল। বঙ্কিম আঙুলটার দিকে ঝুঁকে পড়ে বলল, 'কেটেছো তো! একেবারে অকর্মণ্য। ওয়ার্থলেস টু দি পাওয়ার ইনফিনিটি।'

'একেবারে অকর্মণ্য! সকাল থেকে কানের কাছে বকবক করে মাথা খারাপ করে দিলে! কিনা একটা বালা!'

প্রতিমার চোখে জল।

বঙ্কিম আবার অশ্রুজলে বড়ই কাতর হয়ে পড়ে। রক্তের উর্ধ্বচাপ ইতি মধ্যেই নামতে শুরু করেছে। আঙুলটার জন্যে এখুনি কিছু করা দরকার। অন্তত মানবিক কারণে। বারো বছরের জীবন-সঙ্গিনী। রাগ করে কতক্ষণ কথার চাবুক মারা যায়? বঙ্কিম বললে, দাঁড়াও দাঁড়াও, ডেটল দিয়ে দি। আগে সাবান দিয়ে ধুই।'

'থাক থাক, তোমাকে আর দরদ দেখাতে হবে না। আমার জন্যে একেই দেউলে হয়ে গেছো! আমি মরলেই তো তোমার জ্বালা জুড়োয়।'

প্রতিমা হন হন করে শোবার ঘরের দিকে চলে গেল। বঙ্কিম মনে মনে

বললে, মানুষের মৃত্যু যদি অতই সোজা হত। কত বড় বড় দুর্ঘটনায় ছিন্ন ভিন্ন মানুষকে জোড়া লাগিয়ে বাঁচিয়ে দিচ্ছে, এ তো সামান্য আঙুলটা একটু উসকে গেছে, সুযোগ পেয়ে গেছে এইটাকেই এখন মূলধন করে একচোট আপারহ্যাণ্ড নেবে। তারপর ভাবলো দোষ কি? সে যদি বালা নিয়ে সারা সকাল মাতামাতি করতে পারে, প্রতিমা কাটা আঙুল নিয়ে লড়ে যাবে, এ তো খুব স্বাভাবিক।

বঙ্কিম সাবান দিয়ে তেল হাত ধুয়ে তাক থেকে ডেটলের শিশি নিয়ে শোবার ঘরে যখন এসে ঢুকলো প্রতিমা তখন একখানা ন্যাকড়া দিয়ে বাঁ হাতে ডান হাতের কাটা আঙুলটা জড়াবার ব্যর্থ চেষ্টা করছে। ন্যাকড়াটা ইতিমধ্যে রক্তে লাল হয়ে গেছে। পাকা কলার মত ঠোসা ঠোসা আঙুলে কি কম রক্ত! বঙ্কিম বললে, 'দাঁড়াও দাঁড়াও, কি একটা যা-তা ন্যাকড়া ডেটল না দিয়েই আঙুলে জড়াচ্ছ। এখুনি বিষিয়ে উঠবে যে।'

'ওঠে উঠবে, আমার উঠবে, তোমার তাতে কি?'

প্রতিমার কথায় চাবুক খাওয়া লোকের মত বঙ্কিম টান টান হয়ে গেল। ইস বচনের ছিরি দেখ। হারবো বললেই হারে গা, খামচে খুমচে মারেগা বঙ্কিম হুঃ হুঃ করে শীতল হাসির ঢেউ তুলে বললে, 'আমার কি, তাই না? একটা কিছু হলে তখন কোন সম্বন্ধী দেখবে? কোনো শালা আসবে না। এই শর্মাকেই ডাক্তার বদ্যি করতে হবে চাঁদু।'

'তোমাকে আর কিছু করতে হবে না। তোমার পয়সা ব্যাঙ্কে ডিম পাড়ুক। আমার জন্যে অনেক করেছ। আর করতে হবে না। আমার লজ্জা নেই তাই পড়ে পড়ে মার খাচ্ছি। আমার বাবা বেঁচে থাকলে এই হাল হত? জেনেই গেছ আমার তো কোনো যাবার জায়গা নেই, তাই অষ্ট প্রহর থামসে যাচ্ছ।' প্রতিমা বঙ্কিমের দিকে পেছন ফিরে ফুলে ফুলে কাঁদতে লাগল।

বঙ্কিম মনে মনে বললে, কান্না তোমাদের হাতধরা। সারা জীবনের অশ্রুজল ধরে রাখতে পারলে ভারতবর্ষে সেচসেবিত এলাকা আরো বেড়ে যেত। না, তা কি করে হয়। চোখের জল তো আবার স্যালাইন। সামুদ্রিক মাছের চাষ হতে পারতো। হাঙর কিংবা তিমি লাট খেত। তুলো ডেটলে চুবিয়ে এগিয়ে গেল, 'অফিসের বারোটা বেজে গেল। আচ্ছা ফাঁপরে পড়েছি।'

বঙ্কিম তুলো আর শিশি হাতে প্রতিমার পেছন থেকে সামনে এগিয়ে

গেল। উত্তরটা ঠিকই দিল। আঙুল কাটতে পারে, তা বলে যা খুশি তাই বলে পার পেয়ে যাবে তা তো হয় না। বঙ্কিম বলল, 'হ্যাঁ হ্যাঁ, তোমার বাবা বেঁচে থাকলে সব হত। তিনি থাকলে উনুন ধরিয়ে দিতেন কারণ মেয়ে বঁটি ব্যবহার করতে জানে না। তিনি বেঁচে থাকলে স্বর্গে অপ্সরারা নৃত্যগীত করত, দুন্দুভি বাজাত আর আকাশ থেকে তাক করে এই বাড়ির ওপর পুষ্প বৃষ্টি করত। দেখি আঙুল থেকে তোমার ন্যাস্টি ন্যাকড়াটা সরাও।'

প্রতিমা বড় দোকানের শো-কেসের ঘূর্ণায়মান প্রদর্শনী চাকতির মত কিম্বা আহ্লাদী পুতুলের মত আবার ঘুরে গেল। তুলো হাতে ভ্যাবাচ্যাকা বঙ্কিম আবার পেছনে সরে গেল। বঙ্কিম ছাড়বে না। অ্যান্টিসেপটিক লোশন লাগিয়ে নিজে হাতে ব্যাণ্ডেজ বেঁধে দিয়ে স্বামীর কর্তব্য সে করবেই। এমন কোনো লুপ হোলস সে রাখবে না যার ফাঁক দিয়ে বিবেক বেরিয়ে এসে বলবে. নির্দয়, হৃদয়হীন, পাষন্ড। প্রতিমাকেও পরে খোঁচা মারার সুযোগ সে দেবে না। বঙ্কিম চক্রাকারে ঘুরে আবার সামনে গেল। প্রতিমা আবার ঘুরে গেল। তিনশো ষাট ডিগ্রির খেলা চলেছে। ঘড়ির কাঁটাও এদিকে ঘুরছে। শেষে আর কোনো উপায় না দেখে বঙ্কিম খপ করে প্রতিবার হাত চেপে ধরল, 'চালাকি পেয়েছো, না। বুড়ী বয়েসে ইয়ারকি হচ্ছে? জানো আমার সময়ের দাম আছে, অফিস বেরোতে হবে।'

প্রতিমা হাতটা ছাড়াবার চেষ্টা করতে করতে বলল, 'কে তোমাকে আটকে রেখেছে। যাও না অফিসে, চলে গেলেই পারো!'

'চলে গেলেই পারো।' বঙ্কিম ভেঙচে উঠলো, 'আহ্লাদী পুতুলের মত কোমর দুলিয়ে দুলিয়ে না ঘুরে আঙুলে ওষুধটা লাগাতে দিলেই পারো!'

প্রতিমা প্রাণপণে হাতটা ছাড়াবার চেষ্টা করতে করতে বলল, 'দয়া করে আমার হাতে ওষুধ লাগাবার চেষ্টা করে তোমার মূল্যবান সময় নষ্ট করতে হবে না। আমার চরকায় আমিই তেল দেবো।'

'ইট ইজ মাই চরকা। তেল আমাকেই দিতে হবে। বারো বছরের ইজমেন্ট রাইট। জমির মালিক আমি। ইউ আর মাই জমিদারী।' বঙ্কিম ভীষণ ক্ষেপে গেছে। ওষুধ লাগাবেই।

প্রতিমা আপ্রাণ চেষ্টা করে খামচা-খামচি করেও যখন দেখলে বঙ্কিমের শক্ত মুঠো আলগা হচ্ছে না তখন একেবারেই প্রাকৃতিক কায়দায় খ্যাক করে

বঙ্কিমের হাতে কামড় বসিয়ে দিলে। খুব জোরে নয়, অনেকটা কুকুরের আদুরে কামড় কিংবা 'লাভ বাইটে'র মত। সুখের সময় এই কামড়ের আলাদা অর্থ হতে পারত। ঝগড়ার সময় এই সামান্য কুটুকুটু কামড়েরও অন্য মানে। বঙ্কিম হাত আলগা তো করলই না, বরং আরো জোরে চেপে ধরে বললে—

'অতই সোজা না। কামড়াও, যত পার কামড়াও, তলপেটে ষোলটা ইন-জেকসন নেবো, সেও ভি আচ্ছা, তবু দেখবো কতটা নীচে তুমি নামতে পার। যেমন কুকুর তেমনি মুগুর। ওই দাঁত আমি হাঁ করিয়ে উকো দিয়ে ঘষে ঘষে ফোকলা করে দেবো। কড়মড় করে মাংসের হাড় চিবোনো জন্মের মত ঘুচিয়ে দেবো।'

প্রতিমা এতখানি হাঁ করে বঙ্কিমের হাতটা ধরেছিল ঠিকই, তবে সেটা যতটা ভয় দেখাবার জন্যে ততটা কামড়াবার জন্যে নয়।

বঙ্কিমের মনে হচ্ছিল ফোকলা দিদিমা যেন তার হাতটা পাগলাচ্ছে। প্রতিমারও হয়েছে মহাবিপদ। কতক্ষণ কামড়ে বসে থাকবে। সে তো আর কচ্ছপ নয় যে মেঘ ডাকলে তবে ছাড়বে। বঙ্কিম ডেডলক অবস্থাটা কাটাবার জন্যে বললে, 'যত চাপ পড়বে তত রক্ত বেশী বেরোবে। ছেলেমানুষী করার বয়েস আর আমাদের নেই। মাথা ঠাণ্ডা কর। যে কোনো এক পক্ষকে আত্মসমর্পণ করতেই হবে। যেহেতু তুমি আহত সেই হেতু পরাজয় তোমারই। আমি তোমার ভাল করতে এসেছি, ভালরই জয় হয়। ধর্মে, নাটকে, উপন্যাসে, সর্বত্রই এক বিধান।'

প্রতিমা বাধ্য হয়েই পাগলাপাগালি বন্ধ করে মুখ সরিয়ে নিল। মুখের লালায় বঙ্কিমের হাত ভিজে। পরাজিত প্রতিমা খাটের ওপর ধড়াস করে শুয়ে পড়ল। এ ছাড়া কি আর করবে। গো-হারান হেরেছে। বঙ্কিম ওষুধ লাগিয়ে দিল। ইস্, বেশ কেটেছে! কয়েক দিন জবরদস্ত ভুগবে। আলমারি খুলে ফার্স্টএড বক্স থেকে ব্যাণ্ডেজ বার করে বঙ্কিম দক্ষহাতে আঙুলে জড়িয়ে দিল। আঙুলটা বেশ গোদা হয়েছে। নাও এখন লাগেজের মত পড়ে থাকো। আমার কাজ শেষ। এ টি এস নিতে হবে নাকি? লম্বা বঁটির কাটায় কি আর এমন হতে পারে। হলে বুঝতে হবে ভাগ্য!

বঙ্কিম বাথরুমে ঢুকে পড়ল। পেটটাকে এখন খোঁচা-খুঁচি করতে হবে। সলিড পাথরের মত হয়ে আছে। নাঃ, বয়েস সত্যিই বাড়ছে। সামান্য খাওয়াও আর সহ্য হচ্ছে না। তলপেটে গোটা কত ঘুসি চালাল। প্যাঁত প্যাঁক করে

বার কতক টিপলো। নাঃ পেটও অভিমান করে বসে আছে। নিজের পেটই কথা শুনছে না। ডিসওবিডিয়েন্ট। পরের বাড়ির মেয়ে কথা শুনবে! গ্রেট এক্সপেকটেশন বন্ধু। গুমোট পেট নিয়ে কি আর রাস্তায় বেরোনো যায়। বাড়িতে বসে থাকারও উপায় নেই। আগুন জ্বলছে ধিকি ধিকি। যাক চানটাতো করা যাক।

স্নান সেরে বঙ্কিম ঢকঢক করে কয়েক গেলাস জল খেল। ছ'চামচ ভাস্কর লবণ। একেই বলে সুখে থাকতে ভূতে কিলোনো। বাবুরা সব বিয়ে করবেন আর ছাইপাঁশ খাইয়ে মানুষের সুস্থ শরীকে ব্যস্ত করে তুলবেন। অনেকটা সেই ইললিসিট লিকার খাবার মত কেস। না খেলে বলবে বড়লোকি চাল হয়েছে শালার। এইবার আসছে পরপর অন্নপ্রাশন। বড়বাজারে স্টিলের বাসনের দোকান ত বাঁধাই আছে। আজকাল দোকানে গিয়ে দাঁড়ালেই কাজ হয়ে যায়। মালিক জানে লোকে কি চায়। একটা ছোটো থালা, পুঁচকে গেলাস আর বাটি। প্যাক করকে দাও। সোনালী রোলেক্স রিবনের বাহার। প্যাকিং চার্জ এক্সট্রা টু-রুপিজ বাবু। আবার সেই লুচি, ঘি-ভাত, আঁশটে মাছ, এঁচোড়, টেনে ছেঁড়া যায় না মাংস, মাছ, দই, বোঁদে, পাঁপড়, চাটনি, রসগোল্লা! ওয়াক!

খাবার কথা মনে হতেই গা গুলিয়ে উঠেছে। ওয়াক। চার গেলাস জল পেটে ঢেউ খেলিয়ে দিচ্ছে। তার উপর ভাসমান ভাস্কর লবণ। হিংয়ের ঢেঁকুর উঠছে। সংসারেও মিউটিনি। পেটেও মিউটিনি। বড় এক গেলাস লেবুর জল খেতে পারলে হত। কে করে দেবে! বিদ্রোহী প্রতিমার আঙুল ফুলে কলাগাছ। তিনি এখন নতুন চাল চালার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছেন। যত বেলা বাড়ছে বঙ্কিমচন্দ্র ততই কাবু হয়ে পড়ছে। ঘন ঘন ঢেঁকুর। ওয়াক ওয়াক করে সব ওয়াক আউট করে পেটের অ্যাসেমব্লি থেকে বেরিয়ে আসতে চাইছে। বাথরুম ঘর, ঘর বাথরুম, ঘণ্টাখানেক এই চলল। ওঃ আই অ্যাম টেরিবলি সিক মাই লর্ড। প্রতিমার চোখের সামনে দিয়ে বঙ্কিমের আসা যাওয়া। সকালের মত টান টান বুক নেই। গলা দিয়ে চিঁ চিঁ শব্দ বেরোচ্ছে। হায় ভগবান ক্রমশই কুঁজো হয়ে আসছি। অদ্যাই শেষ রজনী মাগো।

ফন্ ফন্ করে পাখা ঘুরছে। বঙ্কিম খাটে চিৎপাত। ঘণ্টাখানেক হিসেব রাখতে পেরেছিল। তুমি আঙুল কেটে টেক্কা মারতে চেয়েছিলে। আমি মিনি কলেরা দিয়ে স্কোর করে বেরিয়ে গেলুম। একবারে দেহ ছেড়ে বেরিয়ে যেও না মানিক। অন্তর্বঙ্কিমকে বঙ্কিমের রিকোয়েস্ট। দিন ক্রমশ বাদুড়ের ডানার মত ঝুলে আসছে। প্রতিমা আশেপাশে আছে। কাছাকাছি নেই। দুজনের মাঝখানে সোনার বালার গোল ফোকর। স্বর্ণ ব্যবধান। শেষের সেদিন অতি ভয়ঙ্কর। পা দুটো ঠাণ্ডা হয়ে আসছে। ও খাট আর বিছানাটাতো শ্বশুর বাড়ির সম্পত্তি। এর উপর মরাটাতো ঠিক হবে না। প্রভিডেন্ট ফাণ্ডের টাকা থেকে দাম কেটে নেবে। নেমে শুই বাবা।

বঙ্কিম মেঝেতে সতরঞ্জির উপর নেমে এল। এটা নিজের পয়সায় কেনা। এখানে সে বুক ফুলিয়ে, তাল ঠুকে মরতে পারে। দেহটাও আমার, সতরঞ্চিটাও আমার। কোনো শ্যালকের সম্পত্তি নয়। মেঝেতে শুয়ে তেমন দৈহিক আরাম না হলেও বেশ মানসিক আরাম বোধ করল। ভেতর থেকে তার অন্তরাত্মা বলে উঠল, 'আরে ইয়ার, তলায় শক্ত জমি মাথার ওপর নীল আকাশ, ব্যাস্ এর চেয়ে ভাল আর কি আছে। সকাল থেকেই তো পবন আহার করে পওহারী। এ যাত্রা যদি বেঁচে যাও এই শুদ্ধ শরীরের ওপরই আগামী বিশুদ্ধ জীবনের ফাউণ্ডেশান স্টোন প্যাঁ পোঁ প্যাঁপর পোঁ করে লে কর। জীবনটাকে ওই প্রতিমা-বালা, বিয়ে, ভাত, শ্রাদ্ধে বরবাদ কোরো না। আমাকে বেরোতে দাও ফাটতে দাও, ফাটতে দাও, গ্রেট গ্রেটার, গ্রেটেস্ট হতে দাও।

'তুমি হঠাৎ নেমে শুলে কেন?' প্রায় দশ ঘণ্টা পরে প্রতিমার কণ্ঠে যেন একটু দরদ।

'হুঁউ হু আর কি? আমার আর হবে না দেরি, আমি শুনেছি ওই শুনেছি ওই বাজে বাজে তোমার ভেরী। আমি শুনতে পাচ্ছি, ডাক এসেছে, চলে আয়।' কুঁই কুঁই করে বললে।

প্রতিমা আকুল হয়ে ব্যাণ্ডেজ করা হাত বঙ্কিমের কপালে রাখল। বঙ্কিম তখন বলছে, 'তাই তো নেমে এলুম। খাট আর বিছানাটাতো আমার নয় ওতো চলে যাবে। এখান থেকে বের করার সুবিধে। সতরঞ্জিতে রোল করে খাটিয়া লাদাই করে দাও।'

প্রতিমা নাকটানার মত একটু শব্দ করল। হাতটা মাথার চুলে স্থির।

বঙ্কিম আর একটু অ্যাড করল, 'বাড়িটা রইল, কিছু টাকাও রইল। অবশ্য তোমার ভোগে লাগবে না। তোমার ভায়েরা দখল করে তোমাকে একটা লাথি মারবে। ছেলেটা আর মেয়েটার জন্যেই ভাবনা। মামাদের ছেলেমেয়ে ধরে ফাইফরমাশ খেটে পাতকুড়োনো হয়তো একটু জুটবে। বড় হলে ফুটপাত গতি। হা, হা, হা ভগবান।'

বঙ্কিমের কথা বলতে প্রকৃতই কষ্ট হচ্ছে। গলা শুকিয়ে যাচ্ছে। তা না হলে ভবিষ্যতের ছবি আরো গাঢ় রঙে রেখায় আঁকার ইচ্ছে ছিল। প্রতিমা ইতিমধ্যে বেশ বারকতক ফোঁস ফোঁস করেছে। বঙ্কিম উপুড় হয়ে একপাশে ঘাড় কাত করে চোখ বুজিয়ে শুয়ে আছে। খাও, মাঝরাতে ভ্রাতার বৌভাতে হাঁড়ি হাঁড়ি দই খাও। সর্দি হবে না? নিমোনিয়া হবে। এখন আর কি? আহলাদের সময় বাপের বাড়ি; অসুখ, সেবা, ডাক্তার, বদ্যি শ্বশুরবাড়ি। তখন বঙ্কিম আছে, গামছা আছে, বঙ্কিমের ঘাড় আছে, শাশুড়ী আছে। প্রতিমার সর্দি নয়; আসলে সে অল্প অল্প কাঁদছে। মনে দুঃখ হয়েছে। বঙ্কিম একটু মৃত্যু-টৃত্যুর কথা বলেছে, সাদা থান, শাঁখাহীন হাত, সিঁদুরশূন্য সিঁথি, মাছশূন্য দিন! আহা বড় কষ্ট গো। পঙ্গু হয়েও ঘোষালবাবুর মত পড়ে থাকো বেডসোর নিয়ে।

সেবা টেবা আমার ধাতে নেই। সকাল সন্ধ্যে দু'মুঠো গিলিয়ে দেবো। তারপর মার দেওয়া জর্দা আর দু' খিলি পান মুখে ঠুসে সিনেমা, যাত্রা, হ্যাল্লা, ফ্যালা।

প্রতিমা কানের কাছে মুখ এনে জিগ্যেস করল, 'এইবার একটু ঘোল খাবে?'

'ঘোল? ঘোল আর মুখে কেন, এতকাল তো মাথাতেই ঢেলে এসেছো।'

'আঃ, এই অসুস্থ অবস্থায় বাঁকা বাঁকা কথা বলতে নেই। শরীরে আর কিছু নেই। কয়েকদিন একটু শক্তি করে নাও, তারপর আবার হবে।'

'ভূতের মুখে রাম নাম। এ যাত্রা যদি টি'কে যাই, সন্দেহ আছে, তাহলে সাফ বলে রাখছি তোমার বাপের বাড়িতে জল পর্যন্ত খাবো না। সব বিষাক্ত; তুমি যাবে, সন্দেশের বাক্স আর উপহারের মোড়কটি নামাবে। থাকতে হয় থাকবে তুমি। আমি আর ওর মধ্যে নেই। তবে একটা সুবিধে, এমনি ও'রা কখনই আদর করে ডাকেন না, এই বিয়ে পালা পার্বণেই জামাইয়ের খোঁজ পড়ে। লাটের টাকায় লাটের মালের আদর হয়ে যায়। উড়ো খৈ গোবিন্দায় নমঃ।'

প্রতিমার দাঁত কিড়মিড় করছিল। অন্য সময় হলে লেগে যেত। কোনো রকমে সামলে নিল। সামলে নিয়ে বললে, 'বালার শোকটা ভোলবার চেষ্টা কর। বালার ডবল আমি বাগিয়ে এনেছি। পরে হিসেব করে দেখো। প্রণামীর কাপড়, যেটা আমাকে দিয়েছে, ষাট সত্তর টাকা হবে। কালকে প্রেজেন্টেশান যা পেয়েছিল তার থেকে দ্বটো শাড়ি, একটা লেডিজ রিস্টওয়াচ ঝেঁপে এনেছি। তাহলে ষাট, আর ষাট আর ষাট কত হল ?'

'একশো আশি।'

'হ্যাঁ, একশো আশি আর ঘড়িটা ধর দ্বশো তা হলে তিনশো অ · । া ছাড়া বিয়ের আগে ছোড়দা এমনি দেড়শো দিয়েছিল।'

'সেটা তো আবার মেজদাব ধাঃ শোধে চলে গেল।'

'ও হ্যাঁ, তাহলে ফোল্ডিং ছাংটা ধরো, ষাট সত্তর হবে। তারপর একটা বড় স্টেনলেস স্টিলেব থালা াব বাটি আটকে বেখেছি। ওগ্বলোও দেবো না।'

বঙ্কিমের ভেতরে যেন একট্ব শাক্ত আসছে। দ্বর্বল ভাবটা যেন কেটে যাচ্ছে। মাথাটা মেঝে থেকে অল্প একট্ব তুলে দেখল, না, তেমন বোঁ করে ঘ্বরে গেল না।

প্রতিমা বললে, 'আমাকে কি ত্বমি এতোই ক্যাবলা ভাবো। ত্বমি কি ভাবো আমি মাল চিনি না। তোমার সব শালাকে আমি হাড়ে হাড়ে চিনি। এক হাতে যেমন দিচ্ছি, আর এক হাতে তেমনি আদায় করে নিচ্ছি। দ্ব'চার টাকা এদিক-ওদিক হতে পারে। তাও ঠিক উস্বল করে নেবো। মার পঞ্চরত্নের আংটিটা বাগাবার তালে আছি। আর এবাব থেকে বলে রাখছি, ভাতে স্টেনলেস নয়, স্রেফ ওই অ্যাল্বমিনিয়াম।'

বঙ্কিম উপ্বড় থেকে চিৎ হয়ে বলল, 'কাঁচকলা দিয়ে ন্যাংলা সিঙ্গি মাছের ঝোল আর সর্ব চালেব ভাত খাবো।'

প্রতিমা বললে, 'রাত ন'টার সময় ন্যাংলা আর পাবে কোথায় ? এখন চিঁড়ে দই দিয়ে চটকে খাও। কাল সকালে দাম ব্বঝে মাছের ব্যবস্থা হবে। তা না হলে স্রেফ গাঁদাল পাতার পাতলা ঝোল।'

বঙ্কিম ফোঁস করে নিঃশ্বাস ফেলল। মন বললে, 'এ ওম্যান হ্যাজ মাল্টিসাইডস।'

ডেলিভারি

নগেন। আমাদের বন্ধু নগেন। অ্যামিবায়োসিস এবং জিয়ার্ডিয়াসিসের রুগী। অবিচ্ছিন্নভাবে আজ সতেরো-আঠারো বছর ধরে ভুগছে। ওষুধ বদ্যি অনেক করেছে কিছুতেই কিছু হয় নি। ডাক্তাররা বলেছেন, এ রোগ সারার নয়। বিশেষ করে নগেনের মত অসংযমী ছেলের। খাওয়া-দাওয়ার কোন ধরাকাট নেই, মুহুর্মুহুঃ চা, ভাজা কিছু না খেলেই ভাল হয়। অথচ ঘিয়ে ভাজা তেলে ভাজার সঙ্গে তার যেন নাড়ীর যোগ। নগেনকে দেখলে ডাক্তাররা এখন বিরক্তই হন। চিকিৎসা করাতে করাতে নগেন নিজেই এখন ডাক্তার। পেটের কোন্ অবস্থায় কোন্ বড়ি ক'টা, ক'দিন খেতে হবে নগেনের সব জানা। মাঝে মাঝে সে খুব সাবধানী আবার কখন ভীষণ বেপরোয়া।

নগেনের বর্তমানে সমস্যা একটাই। সে বেগধারণ করতে পারে না। অবশ্য নগেনের দাদু সংস্কৃতে বলতেন—ন বেগং ধারয়েত ধীমনে এবং শ্লোকের নির্দেশ মেনে তিনি যে কোনো জায়গায় নির্বিবাদে বসে যেতে পারতেন। বসুধৈব কুটুম্বকম্ ভেবে যে কোনো বাড়িতেও ঢুকে গিয়ে আসল কাজটি হাসিহাসি মুখে সেরে নেবার মত ক্ষমতা ও সাহস রাখতেন। বৃদ্ধের পক্ষে যা সম্ভব, যুবক এবং লাজুক নগেনের পক্ষে তা সম্ভব ছিল না। সুতরাং

নগেন পকেটে একটি নিজের তৈরী গাইড নিয়ে ঘুরতো। প্রচণ্ড বেগে যখন বিহ্বল তখন তার চিন্তার শক্তিও থাকে না। সেই সময় এই ধরনের গাইড ভীষণ কাজে লাগে। গাইডটাই তার রক্ষাকবচ, আশা ভরসা, অস্ত্রবিশেষ।

গাইডে আছে, কলকাতার কোন্ অঞ্চলে বেগধারণ করতে না পারলে চট্ করে কোথায় ঢুকে কাজটি সেরে নেওয়া চলে। লিস্টে সিনেমা হল আছে যেখানে টিকেট ছাড়াই ল্যাভেটরিতে ঢোকা যায়। আছে কলেজ, অফিস, পরিচিত লোকের বাড়ি। নগেনের মত রুগীর অভাব কলকাতায় নেই। বন্ধুবান্ধবদের মধ্যেও অনেক আছে। ফলে একটা আনরেজিস্টার্ড সংস্থার মত গড়ে উঠেছে, যার নাম দেওয়া যেতে পারে—অ্যামিবিক অ্যাসোসিয়েশন অফ ক্যালকাটা মেট্রোপোলিস, সংক্ষেপে 'এ এ সি এম।' সদস্যদের বিভিন্ন সময়ের আলোচনায় এবং পারস্পরিক কুশল বিনিময়ের ফাঁকে ফাঁকে নগেনের গাইড পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত হয়েছে। নগেন জানতো না যে কলকাতার সমস্ত পেট্রল পাম্পের সঙ্গে একটি করে ল্যাভ যুক্ত আছে। নগেনের এক বন্ধুর কল্যাণে লিস্টে পেট্রল পাম্প সম্প্রতি যুক্ত হয়েছে। পেট্রল পাম্প শুধু ফিলিং স্টেশান নয় রিলিভিং স্টেশান এবং এ এ সি এম-এর সদস্যরা প্রায় প্রত্যেকেই তা জেনে গেছেন, এবং মোটামুটি একটা আস্থার ভাব নিয়ে রাস্তাঘাটে চলাফেরা করতে পারছেন। খালি ট্যাঙ্ক যেমন ভরে নেবার ব্যবস্থা আছে, ভর্তি ট্যাঙ্কও তেমনি খালি করার উপায় আছে।

প্রথম প্রথম নগেন খাওয়া-দাওয়া প্রায় ছেড়েই দিয়েছিল। শেষে অ্যাসোসিয়েশনের নির্দেশে পরের পয়সায় সে সামান্য কিছু খেতে শুরু করেছে। নিজের পয়সায় খাওয়ার কোনো মানে হয় না, কারণ মুখ আর জিভ দিয়ে যা ঢুকছে তাতে পুষ্ট হচ্ছে পেট ভর্তি এক গাদা প্যারাসাইট, যারা গীতায় উক্ত আত্মার মত—নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রানি, নৈনং দহতি পাবক, এমন কোনো ওষুধ নেই যা এই প্যারাসাইটের কলোনি ধ্বংস করতে পারে। ফলে খাওয়ার মানেই হল—স্বাদ হামারা পুষ্টি তুমহারা। ভস্মে নিজের ঘি ঢেলে লাভ কি! পরের ঘি-ই ঢাল।

নগেনের চাকরিটাও বেশ মজার। পরের ঘি ঢালার সুযোগ অঢেল। কারণ জিগ্যেস করলে স্পষ্ট করে কিছু বলতে পারব না, শুধু বলব—হুঁহুহুঁহুঁ। নগেনের পিছনে পিছনে একদল ইণ্ডাসট্রিয়ালিস্ট সব সময় ঘোরে। পার্ক স্ট্রীট থেকে শুরু করে পার্ক সার্কাস পর্যন্ত বড় ছোটো সমস্ত দেশী বিদেশী,

মোগলাই খানাঘরে মাথা হেলালেই সে যেতে পারে এবং তার গর্ভস্থ সন্তান-দলের আকুতিতে তাকে যেতেও হয়, যে সমস্ত সন্তানকে সে কোনোদিনই ভূমিষ্ঠ করতে পারবে না।

সেই নগেনেরই এই কাহিনী। বসেছিল অফিসে। ঘরে ঢুকলো যোশী। লম্বা চওড়া ফুটফুটে চেহারা। বড় বাজারের গলির তস্য গলি হাঁসপুকুরে তার কারখানা। তার থাকার বাড়ির পাচতলার শোবার ঘরের পাশের ঘরে দুটো মোষ পুষেছে। নগেন একদিন দেখে অবাক। যোশীর ঘরে বসেই মালাই খেতে খেতে পাশের ঘরে ভোঁস ভোঁস নিশ্বাসের শব্দ শুনে ভেবেছিল হয়তো যোশীর কোনো মোটাসোটা আত্মীয়ের ঘুমের শ্বাস-প্রশ্বাস। অবাঙালীরা একটু মোটা হয়ে থাকেন। শেষে জানতে পারল ও ঘরের বাসিন্দা দুটো সমান সাইজের দুধেলা মোষ। এ যেন এক বিশাল ধাঁধা। মোষ দুটো পাঁচ তলায় উঠলো কি করে? যোশী বলেছিল, কেন? কোলে করে তুলেছি। কত শক্তি এরা রাখে! নগেন অবাক। অবশেষে যোশী সমস্যার সমাধান করে দিয়েছিল। মোষ দুটো যখন শিশু ছিল তখন তাদের এনে তোলা হয়েছিল। এখন বড় হয়েছে দুধ দিচ্ছে, আর তুমি মালাই খাচ্ছ। নগেনের আর একটু প্রশ্ন বাকি ছিল।

'বোলেন না মশা?'

নগেন বললে, 'এরপর যদি মরে যায়?'

যোশী হেসে উঠল, 'অপ্নি তো মরতে পারি নোগেনদা। হামার বোডি যে ভাবে উতারবে ভঁইস ভী উতারবে। এতো প্লেন এণ্ড সিমপল বেপার মোশা।'

সেই যোশী অবেলায় এসে নগেনকে পাকড়াও করল। অনেক দিন নাকি নগেন যোশীর হাঁসপুকুরের কারখানামুখো হয় নি। আজ আর নিষ্কৃতি নেই, যেতেই হবে। প্রথমে নগেন একটু ইতস্তত করেছিল। ক'দিন একটু কোষ্ঠ-কাঠিন্য চলেছে। তাড়াতাড়ি বাড়ি ফেরাই ভাল। যোশী কিন্তু ছাড়ল না। প্রায় জোর করেই তাকে তুলে নিয়ে গেল।

যোশীর কাছে যাওয়া মানেই খাওয়া। প্রথমেই এল তেওয়ারীর সিঙ্গাড়া। খাঁটি ঘিয়ে ভাজা, টাটকা গরম। বেশ বড় বড় সাইজ। খাবোনা-খাবোনা করেও নগেন গোটা চারেক মেরে দিল। লাড্ডুও খেয়ে ফেলল গোটা কতক। তারপর আধসেরী মাড়োয়ারী চা। বট পাতার রসের মত ঘন মোটা আধসেরের

দুধ একটু চা। রং করা। যোশী যেমন খাওয়াতে ভালবাসে তেমনি অনর্গল কথাও বলে! সব বিষয়েই যেন সে সমান পণ্ডিত। বাংলা মেশানো হিন্দীতে কি যে বলে বোঝাও যায় না। নগেন অনেক কষ্টে যোশীর হাত থেকে নিজেকে উদ্ধার করে চিৎপুরে ট্রাম ধরার জন্যে এসে দাঁড়াল।

ট্রামে উঠে নগেন বসতে পেয়ে গেল। ট্রাম চলেছে ধিকি ধিকি, বড়বাজারের রিক্সা আর ঠেলার ভিড় ঠেলে বিশাল বিশাল ভুঁড়িকে পাশ কাটিয়ে। ট্রাম বেশ কিছুটা এগিয়েছে, হঠাৎ নগেনের মনে হল পেটটা যেন কি রকম করে উঠল। সেই কি রকম করে ওঠাটা যেন ভীষণ পরিচিত। নগেনের বিশ বছরের শত্রু। প্রথমে নগেন পেট থেকে মনটাকে সরিয়ে আনতে চাইল। কেমন রিক্সা চলেছে গুটি গুটি। দোকানে কত আলো, কত মাল। মালের কথা মনে হতেই মলের দিকে মন চলে গেল। পেটটা সঙ্গে সঙ্গে ভীষণ মুচড়ে উঠল। বড়বাজারের দিকে বড় একটা আসে না। সুতরাং এই ধরনের এমার্জেন্সির সময় কোথায় যেতে হবে লিস্টে সে রকম কোনো জায়গার হদিস নেই। বাড়ি এখনো এক ঘণ্টার পথ। খুব নার্ভাস হয়ে গেল নগেন। এদিকে ট্রামটাও যেন শামুকের মত চলছে। নিশ্বাস বন্ধ করে তলপেটটা ভেতরে টেনে মূলবন্ধ মুদ্রার মত করে নগেন নিম্নমুখী বেগটাকে উর্ধ্বমুখী করার চেষ্টা করল। কোনো কাজ হল না। বরং উল্টো ফল হল। আর বুঝি ধরে রাখা যায় না। ইষ্টদেবীকে স্মরণ করল। মানত করল মনে মনে। প্রতিজ্ঞা করল জীবনে কোন পাপ করবে না। মেয়েছেলের দিকে কুনজরে তাকাবে না। বাসে-ট্রামে ভাড়া ফাঁকি দেবে না। স্ত্রীর সঙ্গে দুর্ব্যবহার করবে না। কোথায় কি? কিছুতেই বেগতো কমে না। সারা শরীর ঘেমে গেছে।

নগেন দুম করে পরের স্টপেজে নেমে পড়ল। সে যদি রাস্তার নেড়ীকুকুর হত, বেশ হত তাহলে। কোনো সমস্যাই থাকত না। ভগবান তাকে কুকুর করলে না কেন? নগেন তখন মরিয়া। একটা কিছু তো করতেই হবে। তার মত লোকের জঙ্গলে থাকাই ভাল। ওইতো ফুটপাতে অত লোক পড়ে আছে। কই তাদের জীবনে তো এই ধরনের সমস্যা নেই। কখন যায়, কোথায় যায়, কেউ জানে না। আর এই এক হতচ্ছাড়া পেটের জন্যে নগেনের কেরিয়ারটাই নষ্ট হয়ে গেল। এপয়েন্টমেন্ট রাখতে পারে না। সময়ে অফিস যেতে পারে না। কোথাও বেরোবার আগে বার তিনেক বাথরুমে ছুটতে হয়। সাহস করে খেতে পর্যন্ত পারে না। নিজেকে অশ্লীল একটা গালাগাল দিয়ে নগেন রাস্তা:

ক্রশ করল। সামনেই 'মাতৃসদন', মেয়েদের হাসপাতাল। আর সময় নেই। যা হোক একটা কিছু করতেই হবে। পুলিসেই ধরুক আর ধরেই পেটাক নগেন 'মাতৃসদনে' ঢুকে পড়ল।

গেটের পাশেই ছোটো একটা ঘর। একজন সিস্টার দাঁড়িয়ে আপন মনে একটা ইঞ্জেকসানের শিশির মধ্যে 'ডিসটিল্ড ওয়াটার' পুরে ঝাঁকিয়ে ঝাঁকিয়ে গোলবার চেষ্টা করেছিলেন। নগেন হন্ত-দন্ত হয়ে ঢুকেই বলল, 'দিদি বাঁচান।' সিস্টার মুখ ফিরিয়ে বললেন, 'ব্যথা উঠেছে? এনেছেন সঙ্গে করে?' নগেন একটু ঘাবড়ে গেল। সিস্টার সাহস দেবার গলায় বললেন, 'ভয়ের কি আছে? ফার্স্ট ডেলিভারি বুঝি? কার্ড করা আছে তো?' নগেন এতক্ষণে বুঝলো। এই ধরনের কথার সঙ্গে সে পূর্বপরিচিত। নীতার ছেলে হবার সময় এই ধরনের কথাই সে শুনেছিল এক মাঘের রাতে 'মাতৃমঙ্গলে।' নগেনের তখন প্রায় বেরিয়ে এসেছে। লজ্জায় বলতে পারছে না কেসটা কি, কার কেস? কিন্তু এইরকম সময়ে মানুষের লজ্জা বলতে কিছু থাকে না। নগেন দাঁতে দাঁত চেপে বলে ফেলল, 'আমাকে ল্যাভেটরিটা দেখিয়ে দিন।' নগেনের মুখ দেখে ভদ্রমহিলা ব্যাপারটা বুঝলেন, হাত তুলে বললেন, 'ভেতরে ফ্যামিলি কোয়ার্টারের মধ্যে আছে যেতে দেবে কিনা জানি না।'

বুলেটের মত নগেন দৌড়োলো। একটা দেয়ালের গায়ে তীরে আঁকা 'ফ্যামিলি কোয়ার্টারস' শব্দটা নগেন পড়তে পেরেছে। আর তাকে আটকায় কে? পরে পুলিস কেস হলে দেখা যাবে। দু'পাশে সারি সারি ঘর। কোনো ঘরে এক ভদ্রমহিলা পেটিকোট পরে ব্লাউজ পরছেন, কোনো ঘরে চুল বাঁধছেন, কোনো ঘরে চৌকিতে বসে নিছক পা দুলিয়ে চলেছেন। মহিলাদের সব একান্ত নিজস্ব ব্যাপার। কোনো বাইরের পুরুষের যা দেখা উচিত নয়। নগেন ঠিক দেখছেও না। এক্সপ্রেস ট্রেনের মত দ্রুত বেরিয়ে যেতে যেতে শুধু এক ঝলকের জন্যে চোখের পর্দায় ভেসে ওঠা।

নগেনকে কিন্তু অনেকেই দেখে ফেলেছেন। নারী কণ্ঠের অতর্কিত চিৎকার 'কৌন, কৌন।' একেবারে শেষের ঘরটা বাথরুম। নগেন ঝাঁ করে ঢুকেই দরজার বন্ধ করে দিল। বেশ প্রশস্ত ঘর। আলো নেই তবু খুব অসুবিধে হল না লক্ষ্যস্থল খুঁজে নিতে। প্যান্ট নামাবারও যেন সময় নেই। নগেন বসে পড়ল।

এদিকে দরজায় ধাক্কা পড়ছে। পুরুষের বাজখাই গলা, 'অন্দর মে কৌন

হো?' মেয়েরা দরওয়ান ডেকে এনেছে। নগেন ততক্ষণে প্রথম লট নামিয়ে দিয়েছে। গলার স্বরও ফিরে এসেছে। করুণ গলায় উত্তর দিল, 'ম্যায় নগেন হো, বহুত বিপদমে গির গিয়া ভাই, মাফি মাঙতা, চোর নেহি, ডাকু ভি নেহি, ম্যায় নগেন হুঁ!'

বেরিয়ে আসার সময় গেটের কাছে সিস্টারের সঙ্গে দেখা। হেসে জিজ্ঞাস করলো, 'ডেলিভারি হল?'

নগেন একমুখ হেসে বলল, 'আজ্ঞে হ্যা, নেক ডেলিভারি।'

টিপ টিপ করে বৃষ্টি পড়ছে। মাঝে মাঝে দমকা হাওয়া আসছে উত্তর থেকে। ভীষণ ঠাণ্ডা। অন্যদিন এই সময়টায় শশাঙ্কবাবু সাধারণত বেড়াতে যান। গলি পেরিয়ে বড় রাস্তা। বড় রাস্তা পেরিয়ে আবার গলি। গলির মধ্যে ঘুরপাক খেতে খেতে সন্ধ্যের মুখেই ফিরে আসেন বাড়ির দরজায়। বৃদ্ধ মানুষ। সকাল-বিকেল না বেড়ালে ভাল হজম হয় না। এই বয়েসে লোভটাও বাড়ে। মাঝে মধ্যে লুকিয়ে-চুরিয়ে এটা সেটা খেয়ে ফেলেন। তারপর পেট যখন হাঁসফাঁস করে তখন প্রতিজ্ঞা করেন, না, আর কখনও অখাদ্য-কুখাদ্য খাব না! আজ সেই রকম একটা দিন। সকালে মেঘলা দেখে দুটো চপ খেয়েছিলেন। দুপুরে খেয়েছেন খিচুড়ি আর সেঁকা পাঁপড়। একটু আগে খেয়েছেন চা আর নিমকি। এখন বেশ অস্বস্তি হচ্ছে। অন্যদিন এক মাইল বেড়ালে আজ তিন মাইল বেড়ান উচিত।

ঘরের একটা জানালা খুলে শশাঙ্কবাবু আকাশের দিকে তাকালেন। আরো কালো হয়ে এসেছে আকাশ। চারপাশ যেন মাকড়সার জালে ঢাকা পড়ে গেছে। ছাতা নিয়ে বেরোন যেত যদি দমকা হাওয়া না থাকত। জানালাটা আবার বন্ধ করে দিয়ে ঘরের মধ্যে পায়চারি শুরু করলেন। সন্ধ্যের আগেই ঘরে অন্ধকার নেমেছে! আলোটা জ্বালালেও হয়, না জ্বালালেও হয়। সারা দুপুর

অনেক পড়েছেন। ঝাপসা আলোয় পায়চারি ভাল। ঘরে ঘুরে ঘুরেই তিন মাইল বেড়িয়ে নিতে হবে।

একটা ফ্ল্যাটের একেবারে ওপরের তলায় শশাঙ্কবাবু থাকেন। স্ত্রী মারা গেছেন। একটি ছেলে, একটি মেয়ে। দুজনেই উচ্চ শিক্ষিত। মেয়ের বিয়ে হয়ে গেছে। থাকে জামসেদপুরে। ছেলের বিয়ে হয় নি। ইঞ্জিনিয়ার হয়ে বড় চাকরিতে ঢুকেছে। ছেলের বিয়ে দেবার চেষ্টা করছেন। বেশি দেরি করতে চান না। বৃদ্ধ বয়েসে একা থাকতেও ভাল লাগে না। সারাদিন নিঃসঙ্গ। বই, কাগজ, ছবি, আকাশ, ফুলগাছের টব, বারান্দা, রাস্তা, আশপাশের বাড়ি—এই তো তাঁর জগৎ। এর বাইরে তো যাবার উপায় নেই। কাঁহাতক ভাল লাগে। ঠিকে একজন কাজের লোক আছে। ফুড়ুক করে আসে, ফুড়ুক করে পালিয়ে যায়। মাঝে মধ্যে একটা ছোঁচা বেড়াল আসে সঙ্গ দিতে। তিনি তাকে দুধ রুটি মাছ খাইয়ে তোয়াজ করেন। যদি পোষ মেনে যায়। একটা কিছু নিয়ে থাকতে হবে তো।

শশাঙ্কবাবু এতক্ষণ গোল হয়ে ঘুরছিলেন। হঠাৎ তাঁর একটু মজা করার ইচ্ছে হল। ঘুরে ঘুরে ইংরিজী অক্ষর লিখতে শুরু করলেন—এ বি সি ডাবলিউ এ ডবলু। রাত আটটা কি নটায় ছেলে সুখী আসবে। ছেলের নাম সুখী। তার আগে অবশ্য রান্নাবান্না করার মহিলাটি এসে যাবে। মুখে পান। খোঁপাটা মাথার পেছন দিকে উঁচু করে তুলে বাঁধা। মহিলাটির চালচলন কেমন কেমন হলেও রাঁধে ভাল। কামাই করে না।

হঠাৎ কলিং বেলটা বেজে উঠল। এমন সময় কারুর তো আসার কথা নয়। আজকাল পরিস্থিতি এমন দাঁড়িয়েছে দরজার কড়া নড়লে, কি বেল বাজলে ভয় করে। একা থাকেন। শরীরে তেমন শক্তিও নেই। অস্ত্রও রাখেন না। ইদানীং ফ্ল্যাট বাড়িতেই তো নানারকম খুনখারাপি হচ্ছে। দরজার ম্যাজিক আজও নেই যে আগন্তুককে দেখে নেবেন।

শশাঙ্কবাবু গম্ভীর গলায় জিজ্ঞেস করলেন—কে ?

সঙ্গে সঙ্গে ওপাশ থেকে জবাব এল—আমি।

—কে সন্ধ্যা ?

—না আমি।

—তবে কি রমা ?

রমা হল নিচের ফ্ল্যাটের পরেশবাবুর মেয়ে। মাঝে মাঝে বেড়াতে আসে

মেয়েটি দেখতে শুনতে ভাল, তবে ছেলের বউ করা চলে কিনা ভাবতে হবে।

—না আমি।

শশাঙ্কবাবু খুব সমস্যায় পড়ে গেলেন। মহিলা কণ্ঠ, অথচ সন্ধ্যা নয়, রমা নয়। তাহলে কে? কোন পুরুষ মহিলার গলা নকল করছে বলে মনে হয় না। ওপাশে নির্ভেজাল কোন মহিলাই দাঁড়িয়ে আছেন। একমাত্র মহিলারাই কে জিজ্ঞেস করলে আমি আমি করেন। তাছাড়া শাড়ির খসখস শুনতে পাচ্ছেন।

—দয়া করে নামটা বলবেন। শশাঙ্কবাবু সরাসরি নাম জিজ্ঞেস করলেন।

—দরজাটা খুলুন। নাম বললে চিনতে পারবেন না।

—না, না আজকাল দিনকাল ভাল নয়। পরিচয় না দিলে দরজা খুলব না।

—আ গেল যা। পুরুষ হয়ে মেয়েছেলের মত ভয়ে মরছে দ্যাখো!

শশাঙ্কবাবু অবাক হয়ে দরজার দিকে তাকিয়ে রইলেন। কথা শুনে বুঝতে পেরেছেন, চোর ডাকাত নয়, আদি অকৃত্রিম গেরস্থ মহিলা। সাহস করে দরজাটা খুলে দিলেন। দরজার সামনে মোটাসোটা মাঝ-বয়সী এক মহিলা। পাকা পেয়ারার মত রঙ! হাতে ঝুলছে পেটমোটা চটের লেডিজ ব্যাগ। মহিলা সংক্ষিপ্ত একটি নমস্কারঠুকেই বললেন,

- বিপদে পড়ে এসেছি। চিনতে পারছেন কিনা জানি না। পেছনের ফ্ল্যাটের দোতলায় থাকি। দু-একবার চোখাচোখি হয়েছে। একদিন বাসে ওঠার সময় আমাকে ধাক্কা মেরে নিজেই টাল খেয়ে পড়ে যাচ্ছিলেন। ধরেছিলুম বলে মাথাটা পেছনে চাকায় যায়নি। মনে পড়ছে?

- আজ্ঞে হ্যাঁ। ভেতরে আসুন, ভেতরে আসুন। কি বিপদ বলুন?

মহিলা ভেতরে এসে দরজার ছিটকিনি লাগাতে লাগাতে জিজ্ঞেস করলেন,

—এখন কারুর আসার সম্ভাবনা আছে?

—আজ্ঞে না।

—বেশ - খুব ভাল কথা। আপনার শোবার ঘরে একবার চলুন তো।

শশাঙ্কবাবু মহিলার অসঙ্কোচ ব্যবহারে প্রথম থেকেই হকচকিয়ে গিয়েছিলেন, এবার একেবারে অভিভূত হয়ে বললেন,

—না না শোবার ঘরে কেন? বসার ঘরে বসাই তো ভাল।

--বসতে আমি আসিনি। এসেছি কাজে। সে কাজটা শোবার ঘরে না গেলে হবে না।

কথা বলতে বলতেই মহিলা শোবার ঘরের দিকে এগোতে লাগলেন। শশাঙ্কবাবু খুব অবাক হলেন। কোনটা শোবার ঘর মহিলার জানা। হাত ধরে টেনে আনতেও পারছেন না। পায়ে পায়ে এগোতে লাগলেন। শোবার ঘরেই সংসারের যথাসর্বস্ব। দুপাশে দুটো খাট। একটা নিজের অন্যটা ছেলের। দুজনে একই ঘরে শোন। শশাঙ্কবাবু একা শুতে পারেন না। ঘুম আসে না, ভয় ভয় করে। দরজার পাশে আলোর সুইচ। জ্বালাতে যাচ্ছিলেন। মহিলা হাঁ হাঁ করে উঠলেন—

—খবরদার না। আলো জ্বাললেই সব নষ্ট হয়ে যাবে।

শশাঙ্কবাবু হাত সরিয়ে নিয়ে জিজ্ঞেস করলেন,

—কি করতে চাইছেন আপনি? আমি তো মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারছি না।

মহিলা শশাঙ্কবাবুর বালিস থেকে তোয়ালেটা তুলে নিয়ে মাথা মুছতে মুছতে বললেন,

—ওয়াচ। ওয়াচ করতে চাইছি।

—তার মানে? কাকে ওয়াচ করবেন?

—ওই যে ও বাড়ির বুড়োটাকে। আমার স্বামী।

শশাঙ্কবাবুকে আর কোন প্রশ্নের সুযোগ না দিয়ে উত্তর দিকের জানালার খড়খড়িটা ফাঁক করে দেখতে দেখতে বললেন,

—হুঁ, আলো জ্বালা হয়নি। তুমি যাও ডালে ডালে আমি যাই পাতায় পাতায়। কতক্ষণ তুমি আলো না জেবলে থাকবে। এই আমি বসলুম খাটের কিনারায়।

শশাঙ্কবাবু অবাক হয়ে দেখলেন মহিলা তাঁর খাটের পাশে জাঁকিয়ে বসেছেন। একটা পা তুলে দিয়েছেন মাথার বালিসে। কিছু বলতেও পারছেন না চক্ষু লজ্জায়। অথচ প্রায় অপরিচিতা এক মহিলা একেবারে বিছানায় গিয়ে বসবেন এটাও বরদাস্ত করা যায় না।

ছেলের খাটে বসে ব্যাপারটাকে একটু পরিষ্কার করার জন্যে জিজ্ঞেস করলেন,

—ব্যাপারটা কি?

—ব্যাপার? বুড়োকে ঘোড়া-রোগে ধরেছে।

—বুড়ো কাকে বলছেন, আমাকে?

—ছিঃ, আপনাকে কোন সাহসে বলব? বলছি আমার কত্তাকে। সেই

কচিখেকো দেবতাটিকে।

—তার মানে ?

—তাহলে একটু ভেঙেই বলি। তার আগে জিজ্ঞেস করি, চায়ের ব্যবস্থা-টেবস্থা আছে !

ব্যবস্থা আছে, করার লোক নেই।

—একটু চা না খেলে ঠাণ্ডায় যে মরে যাচ্ছি। আমি করলে আপত্তি আছে ?

—আপত্তি নেই, তবে সেটা কি ভাল দেখাবে।

—ওঃ বাবা। আজকাল আবার ভাল মন্দর অত বিচার আছে নাকি ! চলুন কোথায় কি আছে দেখে নি।

চা তৈরি হল। শশাঙ্কবাবু বিস্কুট বের করলেন। বসার ঘরেই চা-পর্ব শুরু হল। মহিলা চা খেতে খেতে নিজেকেই নিজে তারিফ করলেন,

—চা-টা বেশ করেছি কি বলেন ?

—হ্যাঁ বেশ হয়েছে।

—তাও তো মন মেজাজ খিঁচড়ে আছে।

চা খেতে খেতে মহিলা যা বললেন, স্বামী ঠিকেদারী করেন। পয়সা কড়ি আছে। মহিলা বড় একটি হাসপাতালের নার্স। ছেলেপুলে হয়নি। বছর-খানেক হল ভদ্রলোক দূর সম্পর্কের এক আত্মীয়াকে বাড়িতে এনে রেখেছেন। মেয়েটি কলেজে পড়ে। সেই মেয়েটিকে কেন্দ্র করেই যত অশান্তি !

খালি কাপটা টেবিলে রেখে মহিলা বললেন,

—চারদিকে ছিছি পড়ে গেছে। কান পাতা যাচ্ছে না। নিচের ফ্ল্যাটের নন্দা অনেক কিছু দেখেছে। সেদিন আমার খোঁজে দুপুরবেলা ওপরে উঠে-ছিল। ওপরে উঠে দেখে, আরে ছি ছি, বুড়োর মুখে আগুন।

শশাঙ্কবাবুর অন্যের পারিবারিক কথা শুনতে ভাল লাগছিল না। এসব নোংরা ব্যাপারে তাঁর জড়িয়ে পড়তে একদম ইচ্ছে করছিল না। মহিলাকে কোন-রকমে বিদায় করতে পারলে তিনি বেঁচে যান। একি উটকো ঝামেলা ! শশাঙ্ক-বাবু চাইলেই তো আর হবে না, মহিলা নিজের মনে বলছেন,

—অ্যাঁ, যে বয়েসে লোক বনে যেত, সেই বয়েসে তুই ভর দুপুরে একটা ছুঁড়িকে কোলে বসিয়ে মুখে রসগোল্লা গুঁজে দিচ্ছিস ? তাহলে আমার যখন নাইট ডিউটি থাকে তখন তুই কি করিস ? কি শয়তান, কি শয়তান।

মহিলা সোফা ছেড়ে উঠে পড়লেন। শশাঙ্কবাবু হাঁ করে দেখছেন তাঁর গতিবিধি। আবার শোবার ঘরের দিকে চলেছেন। উত্তরের জানালা দিয়ে তাকালে একটা বারান্দার কিছু অংশ একটা ঘরের পুরোটাই চোখে পড়ে। খাট, ড্রেসিং টেবল, চেয়ার আলনা। বারান্দার রেলিং-এ লাল টকটকে একটা সায়ার তলার দিক হাওয়ায় অসভ্যের মত ফুলে ফুলে উড়ছে। খড়খড়ি জানালার পাখি ঈষৎ ফাঁক করে মহিলা নিজের শোবার ঘরের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে বললেন,

—মহারাণীর চুল বাঁধা হচ্ছে। আহা যেন অভিসারে যাবেন। মরণ আর কি? বুড়োটা গেল কোথায় দেখছি না তো।

শশাঙ্কবাবুর খুব ইচ্ছে করছিল ঘটনার নায়িকাকে একবার চোখের দেখা দেখেন। মনের ইচ্ছে মনেই চেপে রাখলেন। মহিলা দাঁতে দাঁত চেপে বললেন,

- শ্যতানী আমার মাথা খাবার জন্যে এসেছেন। মানুষের উবগার করতে নেই।

—আপনার স্বামীকে বারণ করুন না। বোঝাতে পারছেন না।

—বোঝানো? ঝাঁটাপেটা পর্যন্ত হয়ে গেছে। পুরুষ হল পতঙ্গ। আগুন দেখলেই ঝাঁপিয়ে পড়ে। আমার দিকে একবার তাকিয়ে দেখুন তো, আর ওটাকেও একবার এখানে এসে দেখে যান। তারপর বলুন তো, আমার কোন জিনিসটা কমতি আছে। আসুন, আসুন।

শশাঙ্কবাবু পায়ে পায়ে এগিয়ে গেলেন। চোখে ক্যাটারাক্ট ফর্ম করছে। ভাল দেখতে পেলেন না। তবু তাঁর মনে হল, এই মহিলার তুলনায় ওই মেয়েটির সব কিছুই কম কম—বয়েস কম, মেদ কম। বেশির মধ্যে চুল, শরীরের খাঁজ। সরে এলেন শশাঙ্কবাবু। এইবার তাঁকে বিচারকের রায় দিতে হবে।

—না আপনার চে' সব কিছুই ওনার কম কম। কেবল চুলটাই যা বড়।

—আরে মশাই, ওই বয়েসে আমার চুলও পাছা ছাড়িয়ে নামত। এখনই না হয় টিকটিকির ন্যাজ হয়ে গেছে। সব পুরুষেরই এক রা, সব শেয়ালের মত। চুল আর বুক দেখেই গলে গেল।

শশাঙ্কবাবু নিজেকে খুব অপরাধী মনে করলেন। সত্যিই তো মেয়েদের ওই দুটি বস্তুর প্রতি যৌবনে তিনিও ভীষণ আকর্ষণ বোধ করতেন। মনটা কেমন হু হু করে উঠত। সেই আকর্ষণের ছিটেফোঁটা বুড়ো শরীরে এখনও পড়ে

আছে। হিংসে হলে কি হবে, মেয়েটির চুলের ঢল সত্যিই চোখে পড়ার মত। মাথাটা একপাশে কাৎ করে চুলে চিরুনি চালাচ্ছে, সন্ধ্যেবেলা আলো ঝলমলে ঘরে দীর্ঘকায় স্লিম এক মহিলা, সংসারে এর চে' সুখের দৃশ্য আর কি আছে। অথচ এই মহিলাটি রাগে জ্বলে যাচ্ছেন।

চটের হাত ব্যাগ থেকে অন্ধকারে হাতড়ে হাতড়ে মহিলা চ্যাপ্টা একটি কৌটো বের করে মুখে কিছু পুরলেন। পাশের ঘরের আলোর আভা এ ঘরে এলেও শশাংকবাবু স্পষ্ট কিছু দেখতে পাচ্ছেন না। শব্দ শুনে মনে হল পান চিবোচ্ছেন।

—পান খাবেন ? মিষ্টি মশলা দিয়ে সাজা।

সন্ধ্যেবেলা পান আর খাবো না। আগে খুব খেতুম। এখন সকালে খাবার পর সুপুরি ছাড়া এক খিলি খাই।

—আমি খুব খাই। ঘুম থেকে উঠে শুরু করি যতক্ষণ না শুতে যাচ্ছি। কিছু একটা নিয়ে থাকতে হবে তো। ছেলে নেই পুলে নেই। সংসারটাও পরের হাতে চলে যেতে বসেছে। ফ্রাসট্রেশন, ফ্রাসট্রেশন।

মহিলা চেয়ারের ওপর বেশ ভাল করে নড়েচড়ে বসতে বসতে খুব ঘরোয়া গলার জিজ্ঞেস করলেন,

—ওই খাটে কে শোয় ?

—আমার ছেলে।

—আমি যেটায় বসে আছি ?

—ওটা আমার।

—একই ঘরে বাপ ছেলে। ছেলের বিয়ে দিতে হবে তো ?

—হ্যাঁ মেয়ে দেখছি।

—তখন তো ঘর আলাদা করতে হবে।

—বসার ঘরের একপাশে সরে যাবো। অসুবিধের কিছু নেই।

—ছেলের বউ একটু দেখেশুনে করবেন। আজকালকার মেয়েদের ছিরি দেখছেন তো। নিজের বউটিকে তো খেয়ে বসে আছেন। যে বয়সে নিজের বউকে সব চে' বেশি দরকার হয় সেই বয়সেই তো ঘর খালি। এখন লাগছে কেমন একলা একলা।

—একটু ফাঁকা ফাঁকা লাগে। সকলকেই তো যেতে হবে। আগে আর পরে।

শশাঙ্কবাবু শব্দ করে হাসলেন। হেসে অন্যের চোখে ধরা পড়ে যাওয়া নিঃসঙ্গতাটা উড়িয়ে দেবার চেষ্টা করলেন। মহিলা শুনলেন কি শুনলেন না বোঝা গেল না। জানালার পাখি খুলে চোখ রেখেছেন। পুরো মনোযোগটাই ওখানে। চাপা একটা গর্জন শোনা গেল,

—আহাহা হা, পটের বিবি। মরা মানুষেরও লজ্জা থাকে, উনি শুধু সায়া পরে ঘরময় উড়ে উড়ে বেড়াচ্ছেন। জানালা খোলা। আলো জ্বলছে সায়ার রঙ দেখো—লাল, নীল হলদে, সবুজ। যে জিনিস চাপা থাকবে তার আবার অত রঙের বাহার কি জন্য? আমাদের আমলে সব সাদা ছিল। এখন আবার লুঙ্গি উঠেছে বুড়োটা নিশ্চয় ঘরের মধ্যেই কোথাও ঘাপটি মেরে বসে বসে উর্বশীর নৃত্য দেখছে। বাড়ি নয় তো বেশ্যালয়।

জানালার পাখি ফেলে দিয়ে মহিলা সোজা হয়ে বসে শশাঙ্কবাবুকে প্রশ্ন করলেন,

—আজকাল মেয়েগুলোর কি হয়েছে বলতে পারেন? পুরুষদের না হয় ফুলে ফুলে মধু খেয়ে উড়ে বেড়ানোই চিরকালের স্বভাব। ছুঁড়িগুলোর এই মতিচ্ছন্ন ধরেছে কেন?

শশাঙ্কবাবু কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন। প্রশ্নের কি জবাব দেবেন ভেবে পেলেন না। এক সময় বললেন,

—কালের হাওয়া।

শশাঙ্কবাবু নিজেকে সামলে নিয়ে সাবধানে, হিসেব করে করে বললেন,

—এক এক বয়সের মেয়েকে এক এক রকম দেখতে। কম বয়েসে এক রূপ, বেশি বয়েসে আর একরকম রূপ। দুটো রূপই ভাল।

মহিলা খাটের ওপর বেশ করে নড়েচড়ে বসলেন। সাবেক আমলের অমন শক্ত খাটও শব্দ করে উঠল। মুখে আর একটু মশলা ফেলতে ফেলতে বললেন,

—রূপসী অ-রূপসীর কথা হচ্ছে না, আমার কথা হল তোয়াজ। ক'টা স্বামী স্ত্রীকে তোয়াজে রাখতে পারে? সারা জীবন বাবুরা ধামসে যাবেন বুড়ো বয়েসে চাইবেন স্ত্রীর যৌবন, পাছা ভর্তি চুল, সরু কোমর, টান টান তেল তেল চামড়া, হাত ভর্তি...।

শশাঙ্কবাবু আতঙ্কে কেশে উঠলেন। এঁর মুখে তো কোন কথাই আটকায় না।

—কাশি হয়েছে দেখছি। আর হবে না। বর্ষায় চারদিক ঢ্যাপ-ঢ্যাপে হয়ে আছে। রক্তের জোরও তো কমছে। বুকে বসেছে?

—না, শুকনো কাশি।

—একটু মালিসটালিস, কেই বা করবে? এই বয়সের বিবাদের বড় কষ্ট। ওই মড়া কিন্তু বুঝল না, বউ কি জিনিস? এই তো সেবার, অস্থানে বিষফোঁড়া হল। সারারাত ঘুমোতে পারে না। কে সেবা করল? ফুর্তির মেয়ে জুটবে অনেক। কথায় বলে ভাত ছড়ালে কাগের অভাব হয় না। কিন্তু সেবার মেয়ে ওই একটাই—বউ। কিল মার, চড় মার, ঝ্যাটা মার, শেষ পর্যন্ত বউই ভরসা। বয়েস তো হল, অনেকের অনেক নেত্যই তো দেখলুম, ঘাড়ে পাউডার, চুনট করা ধুতি, বার্নিস করা জুতো, শালীর সঙ্গে রপটারপটি ভাদ্দর বউয়ের সঙ্গে গা ঘষাঘষি, বন্ধুর বউয়ের সঙ্গে নুকোচুরির পিরিত, মাসকাবারি মেয়েমানুষ, শেষকালে বুড়ো এসে মরল বউযের কোলে—ওগো তুমি ছাড়া আমার আর কেউ নেই গো! ঘেন্না ধরে গেল জীবনে।

মহিলা জানালার পাখি ফাঁক করে আর একবার দেখলেন।

শশাঙ্কবাবু ভেবেছিলেন কোনও রকম মন্তব্য হবে। না হল না। অনেকক্ষণ বসে থেকে থেকে নিজেকে এইবার একটু ক্লান্ত মনে হচ্ছে। তা হলেও সন্ধ্যেটা বেশ কাটল। মহিলা উঠে দাঁড়ালেন। একটা হাই উঠল। দু হাত মাথার ওপর তুলে আড়মোড়া ভাঙলেন। ঘরে আলো না জ্বললেও, বারান্দা থেকে আলোর একটা আভা ঘরে এসেছে। একটা আবছা স্বপ্ন-স্বপ্ন পরিবেশ। চওড়া পাড় তাঁতের শাড়ি, হালকা রঙের ব্লাউজ। শরীরটা সামান্য ভেঙেচুরে খুব পরিচিত একটা ভঙ্গি তৈরি হয়েছে। সকালে ঘুম থেকে উঠে সেও ত এইভাবে শরীর ভাঙত। বয়েস যখন কম ছিল শশাঙ্কবাবু ঠিক এই রকম মুহূর্তে লোভ সামলাতে না পেরে শরীর কোমর জড়িয়ে ধরে খাটে উল্টে ফেলে দিতেন। না, না, অতীত অতীতই, প্রাচীন ব্যাপার-স্যাপার নিয়ে মনকে দুর্বল করে তোলা ঠিক নয়।

বিছানা থেকে চটের হ্যান্ডব্যাগটা তুলে নিয়ে মহিলা বললেন,

—যাই। গিয়ে সংসারের চুলোয় আগুন ধরাই। মেয়েদের এই জ্বালা, যখন আদর জোটে, তখন ফুটকলাই নিয়ে ফোটে। যখন আদর টুটে তখন মুগুর দিয়ে ঠোকে।

ক্রমশঃ

শশাঙ্কবাবু পেছন পেছন দরজা পর্যন্ত এলেন। বেঁটে মহিলা, দরজার ছিটকিনিতে হাত পাবেন না। ঘাড়ের কাছে সরু সোনার হার চিকচিক করছে আলো পড়ে। গোল-গোল হাতে সাদা শাঁখা। শশাঙ্কবাবু গড়ন-পেটন মানেন। তন্ত্রে এই ধরনের চেহারার যে উল্লেখ আছে তা যদি ঠিক হয়, তাহলে এই মহিলা লক্ষ্মীমন্ত। ছিটকিনি খুলতে খুলতে প্রশ্ন করলেন,

—আপনাকে বিয়ে করার পরই কত্তার ভাগ্য ফিরেছে, তাই না ?

দরজার সামনে থমকে দাঁড়িয়ে মহিলা বললেন,

—ঠিক ধরেছেন তো। জ্যোতিষ-টোতিষ করেন নাকি ?

—তেমন ভাবে করি না, বেকার মানুষ একটা কিছু নিয়ে থাকতে হবে তো।

—তাহলে এবার যেদিন আসব কোষ্ঠীটা আনব।

মহিলা বেরোচ্ছেন শশাঙ্কবাবুর কাজের মহিলাটিও ঢুকছে। অবাক হয়ে একবার তাকিয়ে দেখল। এ আবার কে। মেয়েটির আজ টান করে চুল-বাঁধা। ফেত্তা দিয়ে শাড়ি পরেছে। অন্যদিনের চেয়ে আজ যেন সাজের ঘটা একটু বেশি। বেশ গুছিয়ে নিজের মত করে কাজ করে, তাই সব বেচাল সহ্য করে নিতে হয়। মাঝে মাঝে গুন গুন করে গানও গায়। একটু ফিচলেও আছে। এই তো সেদিন, শশাঙ্কবাবুর সামনেই ব্লাউজের মধ্যে দিয়ে হাতার পিছন ঢুকিয়ে পিঠ চুলকোচ্ছিল। কোন সংকোচ নেই। উলটে জিজ্ঞেস করল, 'ঘামাচির পাউডার আছে আপনার কাছে ?' পাশ দিয়ে চলে গেলে কেমন একটা যৌনতার আঁচ গায়ে লাগে। রক্ত ঠান্ডা হয়ে এসেছে তাও মাঝে মাঝে চমকে উঠতে হয়।

দরজার ছিটকিনি লাগিয়ে শশাঙ্কবাবু নিজের ঘরের দিকে এগোতে এগোতে বললেন,

—মানু, একটু চা করবে নাকি ?

রান্নাঘরের পাশের কলে অনেকখানি কাপড় তুলে মানু পায়ের গোড়ালি ধুচ্ছিল। ভাল দেখতে পান না তবু ক্ষণিকের জন্যে শশাঙ্কবাবুর নজর চলে গেল শ্যামলা দুটি পায়ের গোছে। সায়ার ঝোলা অংশ, শাড়ির পাড়, নির্জন বারান্দা, ঝিমঝিম বৃষ্টির শব্দ, ভিজে ভিজে গাছের পাতা দোলান বাতাস, প্রতিবেশীর রেডিও থেকে ভেসে আসা সংগীত, নাঃ জীবন একটা মধুর অনুভূতি। ফুরিয়ে গিয়েও ফুরোতে চায় না। হঠাৎ মনে পড়ল, যুও,

যুবতী, ভাজা। তিন বাদলের মজা।।

– মানু আর পা ঘষো না, এবার ক্ষয়ে যাবে।

—রাস্তার যা অবস্থা, ঘেন্না করে, ম্যাগো।

– জান ত দাদাবাবু আজ ফিরবে না, কলকাতার বাইরে গেছে।

—জানি, সকালে বলে গেছেন আমাকে। তার থেকে ওই গামছাটা দিন তো। ওটা নয়, ওটা নয়, ওই পাশের লালটা।

—আরে বাবা লাল, নীল বোঝার মত কি আর চোখ আছে আমার। এই নাও ধর!

—বাদাম দিয়ে চিঁড়ে ভাজব, খাবেন।

শশাঙ্কবাবু না বলতে পারলেন না। মানুর খাবার ইচ্ছে হয়েছে। না বললে নৃশংসতা হবে।

—হ্যাঁ হ্যাঁ কেন খাবো না? ভাজ-ভাজ, বর্ষায় জমবে ভাল!

মানুকে শোনাতে ইচ্ছে করল, যুও, যুবতী, ভাজা। তিন বাদলের মজা। এসব কথা হঠাৎ বলা যায় না। নিজেকে সংযত করে রাখলেন। তাড়াতাড়ি ঢুকে পড়লেন নিজের ঘরে। মন বড় মাতাল হয়েছে। বিবাহিত জীবনের কত অভ্যাস স্ত্রী বিয়োগের পর জোর করে ভুলতে হয়েছে। বাবা! অভ্যাস দোষ না ছাড়ে চোরে। শূন্য ভিটায় মাটি খোঁড়ে।

বিছানায় কাৎ মেরে শুয়ে পড়লেন শশাঙ্কবাবু। বেডকভারটা একটু কুঁচকে মুচকে গেছে। বালিশের ঢাকাটা একটু ভিজে ভিজে। চুলের আর তেলের গন্ধ। নাকের কাছে কি একটা সুড়সুড় করছে। হাত বাড়িয়ে আলোটা জ্বাললেন। গোটাকতক লম্বা চুল আটকে আছে তোয়ালের রোঁয়ায়। বেডকভারের যে জায়গাটায় মহিলা বসেছিলেন সেই জায়গাটাও সামান্য ভিজেছে। শাড়িটা বোধ হয় বৃষ্টিতে ভিজেছিল। আলোটা নিবিয়ে দিলেন। স্ত্রী সুধাও মাথায় গন্ধ তেল মাখত। সারা ঘরে এইরকম একটা গন্ধ ভেসে বেড়াত। অনেকদিনের স্মৃতি আবার ভেসে এল। মহিলাশূন্য নীরস সংসারে কিছু ক্ষণের জন্যে যেন রসের ধারা বয়ে গেল। শশাঙ্কবাবু চাদরের ভিজে জায়গাটায় বারকয়েক হাত বুলোলেন। বালিশের ঢাকায় মুখ ডুবড়ে নিজের স্ত্রীকে মনে করবার চেষ্টা করলেন। যৌবন, সংসার, ভালবাসা, ঝগড়া, ভাব। শরীরটা মাঝে মাঝেই একটু সঙ্গ চাইত। সুধা সাবধান করত. একটু বুঝেসুঝে খরচ কর তাহলে দেরিতে ফতুর হবে। নিজেই কেটে পড়ল, পড়ে রইল শশাঙ্ক।

কার কখন তেল ফুরোয়, কে বলতে পারেরে বাবা।

একটু বোধহয় তন্দ্রামত এসেছিল। মানু ঘরে এসে বলছে,

—একি চিঁড়ে খাননি কাকাবাবু। আমি যে চা নিয়ে এসেছি।

শশাঙ্কবাবু ধীরে ধীরে উঠে বসলেন,

—আলোটা জ্বাল ত মানু।

ঘরের ওপর আলো লাফিয়ে পড়ল। শশাঙ্কবাবু যেন স্বপ্ন দেখছেন। চোখে ঘুম রয়েছে। সংসারটাকে বেশ ভরাট ভরাট লাগছে। সব যেন ফিরে এসেছে। এ কে? মানু, না সুধা? মানু বললে,

— অবাক হয়ে কি দেখছেন? শরীর খারাপ?

—না, শরীর খারাপ নয়। বিকেলে বেরোতে পারিনি তো সন্ধ্যের দিকে গাটা কেমন যেন ম্যাজ ম্যাজ করছে।

—সব কটা জানালা বন্ধ করে রেখেছেন, গরম লাগছে না?

চায়ের কাপটা খাটের পাশের ছোট টেবিলে রাখার জন্যে মানু নিচু হল। পরিপাটি করে বাঁধা খোঁপার দিকে শশাঙ্কবাবুর নজর চলে গেল। কুচকুচে কালো চুল। শাড়ির আঁচল দিয়ে মুখ মুছতে মুছতে মানু বললে,

—যা বর্ষা নেমেছে, কি করে বাড়ি ফিরে যাব ভাবছি।

—বাড়ি ফিরতেই হবে?

—না ফিরলে আর একজন ত হেদিয়ে মরে যাবে।

—না, তেমন হলে এখানেও তো শোবার ব্যবস্থা আছে।

—দেখি।

মানু চলে গেল। একবার শশাঙ্কবাবুর খুব জ্বর হয়েছিল, মানু একদিন সারারাত জেগে সেবা করেছিল। সন্ধ্যে থেকেই মনটা বড় দুর্বল হয়ে পড়েছে। যে বাঘ একবার মানুষের রক্তের স্বাদ পায় সে নরখাদক হয়ে যায়। শশাঙ্ক কি সেই বাঘ? ভাজা মুচমুচে চিঁড়েও এখন পাগলে পাগলে খেতে হয়। দাঁতগুলো বাঁধিয়ে ফেললে কেমন হয়। মুখের চেহারাটা আবার যুবকদের মত হয়ে যাবে। চুলে একটু কলপ। আরও যুবক। মন পাখি কি বুড়িয়ে গেছে? ভেতরটা আজ বড় শিরশির করছে। মানু যখন পেছন ফিরে চলে যাচ্ছিল তখন কেমন মনে হল। না মনটাকে বাঁধতে হবে।

নারী সংসৃতিমূলিকা, অর্গল স্বরূপরুকের।
চিত্রতমপি নহি দেখহিং বুদ্ধিমন্ত ঘনের।

এই সংসারে নারীই হল সংসারের মূল ও মোক্ষপথের বাধা। ছবির মেয়েছেলেও চিত্তচাঞ্চল্যের কারণ হয়। জ্ঞানী ব্যক্তি তাই ছবির মেয়েছেলের দিকেও ফিরে তাকান না।

শশাঙ্কবাবু আলোটা নিবিয়ে দিলেন। বিদ্রোহী শরীরটাকে বিছানায় চেপে রাখার ইচ্ছে। হঠাৎ মনে হল, জানলার পাখিটা ফাঁক করে একবার দেখি। সেই সায়া, ফুলে ফুলে উড়ছে। সেই মহিলা ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে মৃদু হাত নেড়ে অদৃশ্য কাউকে শাসন করছেন। বেশ ব্যক্তিত্ব আছে। সেই মেয়েটি কোথায়। অনেকটা মানুষ মতই দেখতে। মানুষ চেহারার বাঁধনটা এখনও ঠিক আছে। একটু যত্নে থাকলে কত লাগদাই হত।

॥ দুই ॥

দুপুরের দিকে মহিলা এলেন। এখনও বেশ চুল আছে। কপালটা তাই ছোট। বিন্দু বিন্দু ঘাম ফুটেছে। নাকের ডগাতেও পুঁতির মত ঘামের দানা। নাকের ডগা ঘামলে প্রেমিক হয়। দরজাটা ভেজাতে ভেজাতে মহিলা বললেন,

--যত বর্ষা হচ্ছে তত গরম বাড়ছে।

ঘাড় বেঁকিয়ে শাড়ির পেছন দিকটা দেখতে দেখতে বললেন,

চটি পরে বর্ষায় হাঁটা যায় না। কাদা ছিট্‌কেছে?

শশাঙ্কবাবু দেখলেন। সাদা শাড়ী ভারী শরীরে মোলায়েম হয়ে জড়িয়ে আছে। এখানে-ওখানে সামান্য কাদার ছিটে। একটা দুটো ছিটে লেগেছে। একেবারে স্প্রে পেণ্টিং হয়ে যায়নি।

কাদার দাগ ওঠে না, বুঝলেন, মনের দাগের মত।

-ছেলে কোথায়?

—ছেলে বেরিয়েছে।

—আজ আমার আঁতুড়ে। বুড়ো জানে না। প্রথম প্রথম বলত আজ আর ও না সুধা, নাই বা গেলে আজ।

—আপনার নামও সুধা ?

—কেন ?

—আমার স্ত্রীর নামও সুধা ছিল।

—ও। এখন কি বলে জানেন, তুমি বেরোবে না? না না কামাই করা ঠিক হবে না দেশের মানুষ সাফার করবে। ওরে আমার দেশ হিতৈষীর বাচ্চারে! চলুন, ঘরে চলুন।

মহিলার এই আদেশের ভঙ্গিটা বেশ ভাল লাগে। তেমন তেমন মেয়ের কৃতদাস হয়েও তৃপ্তি পাওয়া যায়। মনে পড়ছে, দিগ্বিজয়ী যো শূর হোয়, বহু-গুণসাগর তাহিং। ভ্রূকটাক্ষ যো করত হোয়, তাকো পদতলমাহি। দিগ্বিজয়ী, মহাবলশালী পুরুষ। মেয়েছেলের কটাক্ষপাতে পায়ের তলায় লুটিয়ে পড়ল। মহিষাসুরের বুকে দুর্গার শ্রীচরণ।

—এই নিন। ভুলিনি। কাশিটাকে ত কমাতে হবে। দু আঙুলে নিয়ে শোবার আগে বুকে লাগাবেন। মালিশ নয়, শুধু ওপর ওপর লাগিয়ে দেবেন। আর এই নিন খাবার ওষুধ। শোবার আগে এক চামচে চেটে চেটে। ভাল মানুষের জন্যে করতে ইচ্ছে করে। মিচকেশয়তানটার জন্যে অনেক করেছি, দাম দিলে না।

—আপনি শুধু শুধু কষ্ট পাচ্ছেন। হয়ত শুধু শুধু সন্দেহ করছেন। ভদ্রলোক হয়ত মেয়ের মতই ভালবাসেন।

—কিই ?

মহিলা খাটের ওপর ধপাস করে বসে, একটা পা বিছানায় রাখলেন,

—মেয়ের মত? না মেয়েমানুষের মত? শুনুন তবে, ছেলেপুলে হচ্ছে না দেখে দুজনেই ডাক্তারকে দিয়ে পরীক্ষা করালাম। ডাক্তার বললেন, গোলমাল আপনার নয়, আপনার স্বামীর। বুঝলেন ব্যাপারটা! ও তো এখন বেপরোয়া। ঢোঁড়া সাপের বিষ নেই, ছোবলালেও মরবে না! এইবার দেখুন।

উত্তেজিত মহিলা ব্যাগ থেকে একটা ভিউফাইণ্ডার বের করলেন,

—নিন, চোখে লাগিয়ে দেখুন।

চোখ লাগিয়েই শশাংকবাবু চমকে উঠলেন। উরে বাপ। একি। [illegible] দেখছেন যেন। জিনিসটা তাড়াতাড়ি ফিরিয়ে দিয়ে লজ্জায় চোখ ন[illegible] নিলেন।

—এইসব জিনিস বাড়িতে আসছে কিসের জন্যে? বলতে পারেন কিসের জন্যে? সন্দেহ! সাধে সন্দেহ আসে? মেয়েছেলে হতে পারি, মুখ্যু হতে পারি, তা বলে তো আর গাধা নই। প্রথম বয়েসে এসবের মানে বোঝা যায়, শেষ বয়েসে মরার কালে এত চুলবুলুনি কিসের? সব ওই ছুঁড়ির জন্যে। বুড়ো মড়ার যৌবন ফিরে এসেছে। আমার দিকে আর ফিরেও তাকায় না। ভাল কথা বললেও খিঁচিয়ে ওঠে। ওই ছুঁড়ি কিছু বললেই হেসে একেবারে গড়িয়ে পড়ে।

শশাঙ্কবাবু প্রসঙ্গটা ঘোরাতে চাইলেন,

—আজ একেবারে শরতের আকাশ।

—ওসব আকাশ টাকাশ কবিরা দেখবে আপনি কি কবি? একটা পান খাবেন নাকি, জর্দা দিয়ে?

চৌকো মত একটা ডিবে খুলে পর পর দুটো খিলি মুখে পুরলেন। ফর্সা গাল দুটো ঠেলে উঠল। শশাঙ্কবাবু না বলতে পারলেন না। না, বললেই মহিলা সন্দেহ করবেন, দাঁত নেই, ফোগলা দিগম্বর।

—দিন একটাই, খাইনি অনেকদিন ছেড়েছুড়ে দিয়েছি। সুধাও গেছে পানের পাটও উঠে গেছে।

—আর এক স . . . আবার চালু করে দিচ্ছে। নিন হাত পাতুন, একটু জর্দা দি?

—না না জর্দা থাক। মাথাটাতা ঘুরে পড়ে যাব।

—আহা, কচি খোকা। ঘুরে যায় যাবে, জল থাবড়ে দোব। জর্দার জন্যেই তো পান।

পান, পানের পিক, জর্দা সব ভেদ করে কথা আসছে জড়িয়ে জড়িয়ে। মহিলা উঠে দাঁড়ালেন, পিক ফেলবেন। শশাঙ্কবাবু বুঝতে পেরে বললেন,

—আসুন কোথায় ফেলবেন দেখিয়ে দি।

নর্দমার কাছে এসে ডান হাতে কাপড়ের সামনের দিকটা পুরুষ্টু দুই উরুর মধ্যে ঠেসে ধরে, মুখটা ছুঁচ মত করে পোয়াটাক পিক ফেলে সোজা হয়ে দাঁড়ালেন। চারপাশে চোখ ঘুরিয়ে বললেন,

—বাড়িটা নতুন, তবে জায়গা বড় কম। আর কি হবে, এরপর আর দাঁড়াবার জায়গাও মিলবে না।

ঘরে ঢুকে নিজেই রেগুলেটার ঘুরিয়ে পাখার চলন বাড়িয়ে দিলেন। খাটের

ওপর বসতে বসতে বললেন,

—বেশ শান্তির জায়গা। এক ছুতোর মিস্ত্রীর হাতে পড়ে জীবনটা বরবাদ হয়ে গেল।

—কে ছুতোর মিস্ত্রী ?

—ওই হল কনট্র্যাকটারও যা, মিস্ত্রীও তাই। আপনার বউটি এত কম বয়সে খসে গেল কি করে ? এমন সুখের সংসার সহ্য হল না বুঝি ?

—লিভার। লিভারটা নষ্ট করে ফেললে। খালি পেটে কাপ কাপ চা, ঘুরতে ফিরতে মুঠো মুঠো চানাচুর। মেয়েদের স্বভাব জানেন ত, একগুঁয়ে অবুঝ, ভাল কথা কানে ঢোকে না।

—খবরদার। বউ নেই বলে যা খুশি তার নামে বলে যাবেন, সেটি হতে দেব না। কিপটেমি করেছিলেন : ভাল করে চিকিৎসা করান নি। বিছানায় শুধু শুলেই হয় না, মাঝে মাঝে রোদেও দিতে হয়

চিকিৎসা করাইনি মানে ? অ্যালো, হোমিও, কোবরেজি, টোটকা কোনটা বাদ গেছে ? নিজে ঘণ্টার পর ঘণ্টা লাইন দিয়ে ফটিক ঠাকুরের দৈব ওষুধও এনেছি। থাকবে না, যে যাবে, তাকে আটকে রাখবে কে ?

শশাংকবাবুর গলাটা ধরে এল। চোখ ছলছল করছে। কোঁচার খুটে চোখ মুছলেন।

সেকি, চোখে জল এসে গেল ! ভীষণ দুর্বল মানুষ তো ? ওই পাগুড-টাকে দেখে শিখুন। এক চোখে কান্না আর এক চোখে হাসি।

—বয়েস হচ্ছে তো ? পুরনো কথা মনে পড়লেই চোখে জল এসে যায়। দুঃখের দিনে আমার সঙ্গে কষ্ট করে গেল, সুখের দিনে রইল না। সুধাকে আজকাল বড্ড মনে পড়ে যায়। ভেবেছিলুম ছেলের বিয়ে দিয়ে বুড়োবুড়ী কাশীতে গিয়ে থাকব। তা আর হল না। একলাই যেতে হবে। কত সব ছোট ছোট সাধ আহ্লাদ ছিল, যখন মেটাবার মত অবস্থা এল, সব ফাঁকা ! ছেলের রোজগার, ভাল জামাই, কিছুই সহ্য হল না। হাসতে হাসতে চলে গেল। যাবার সময় বলে গেল, আসছ তো ?

টেবিলে মাথা রেখে সুধার শোকে শশাংকবাবু ছেলেমানুষের মত ফুঁপিয়ে উঠলেন। মহিলার চোখেও জল এসে গেছে। তাড়াতাড়ি উঠে গিয়ে শশাংকর মাথার পেছন দিকের কাঁচাপাকা চুলে হাত রাখলেন। চোখ থেকে এক ফোঁটা জল শশাংকর ঘাড়ে পড়ল। আর এক সুধা শান্ত করার জন্যে কিছু বলতে

গেলেন, সঙ্গে সঙ্গে বিষম। পানের কুচি, জর্দার টুকরো শ্বাসনালীতে। দমকা কাশি। মাথার পেছনে রাখা হাত লাফিয়ে লাফিয়ে উঠছে।

শশাঙ্ক মাথা তুললেন, মহিলার হাত মাথা থেকে খসে কাঁধ ছুঁয়ে বুকের ওপর দিয়ে নেমে গেল। জোর বিষম। মুখ চোখ লাল হয়ে গেছে। একে ফর্সা মানুষ। শশাঙ্ক হাত ধরে খাটে বসিয়ে দিলেন। স্ত্রী সুধার বিষম লাগলে মাথার তালুতে চাটা মারতেন। ভাল দাওয়াই! এই সুধার মাথায় কি থাপ্পড় মারা যাবে। যা থাকে বরাতে শশাঙ্ক ব্রহ্মতালুতে থাবড়া মারতে লাগলেন, দু চারবার ফুঁও লাগলেন। সিঁথির কাছে সিঁদুরের রেখা বয়েসে চওড়া হয়েছে। চুলের গোড়ায় সাদার ছোঁয়া লেগেছে। মানুষের মাথা দেখলেই বোঝা যায় কটা ঝড় বয়ে গেছে জীবনের উপর দিয়ে। ভীষণ মায়া হল শশাঙ্কর। জীবনে জীবনে ঠোকাঠুকি করে যে শেষ হবে।

—দাঁড়ান, এক গেলাস জল নিয়ে আসি।

শুধু জল নয়, একটা তোয়ালেও ভিজিয়ে আনলেন।

—নিন, মুখটা বেশ করে মুছে ফেলুন। লাল টকটকে হয়ে উঠেছে। উঁহু ওভাবে নয়, জলটা ধীরে ধীরে খান, তা না হলে আবার বিষম লেগে যাবে।

বুকের ওপর থেকে কাপড় খসে পড়েছে। শশাঙ্কর মনে হচ্ছিল ভিজে তোয়ালে দিয়ে নিজের হাতে মুছিয়ে দেন।

—একটু না হয় ফ্ল্যাট হয়ে শুয়ে পড়ুন। না না, সঙ্কোচের কোন কারণ নেই! আমি পাশের বসার ঘরে চলে যাচ্ছি।

—কেন, আপনিও ছেলের খাটে শুয়ে পড়ুন। এই বয়সে খাবার পর একটু বিশ্রাম করতে হয়।

—আপনার অসুবিধে হবে।

—অবাক করলেন মশাই। আপনার বাড়িতে আমি তো একটা উৎপাত। আমার জন্যে কষ্ট করে সারা দুপুর ঠায় বসে থাকবেন?

না বসে থাকব কেন? ও ঘরে গিয়ে কাৎ হয়ে থাকব।

—কেন এ ঘরে থাকলে কি চরিত্র নষ্ট হয়ে যাবে?

—এঃ ছি ছি, এই বয়েসে চরিত্র বলে কিছু থাকে নাকি? সবই ত ঘুমিয়ে পড়েছে।

তাহলে জানলার পাখিটা ফাঁক করে একবার দেখুন ত।

মহিলা আবার কেশে উঠলেন। বিষমের রেশ এখনও লেগে আছে।

—দেখছি দেখছি, আপনি পাশ ফিরে কিছুক্ষণ শুয়ে থাকুন আর এক গেলাস জল?

—না আর জল লাগবে না।

শশাঙ্ক পাখি ফাঁক করে ও বাড়ির দিকে তাকিয়েই চমকে উঠলেন। বারান্দার রেলিং-এ দুহাতের কনুইয়ের ভর রেখে কর্তা দাঁড়িয়ে। গায়ে স্যাণ্ডোগেঞ্জি, ছাপা লুঙ্গি। মাথার সামনে ওলটান ফুলকো চুল। কপালের দুপাশ টাকে খেয়ে গেছে। হাতের আর কাঁধের গুল দেখলেই মনে হয় শরীরে এখনও বেশ শক্তি। এক ঘুষিতে শশাংক কাৎ। পাশেই সেই মেয়েটি। নীল শাড়ি, সাদা ব্লাউজ। এলো চুল মাথার দুপাশ দিয়ে সামনে ঝুলছে। চুড়িপরা একটা হাত কর্তার পিঠে। শশাঙ্ক ভয়ে ভয়ে পাখিটা বন্ধ করে দিলেন। এই দিকেই যেন চেয়ে আছেন। যদি দেখে ফেলেন।

—কি দেখলেন?

শশাঙ্ক তোতলাতে তোতলাতে বললেন,

—বারান্দাতেই দুজনে দাঁড়িয়ে। বাপ মেয়েও বলা যায়, স্বামীও বলা যায়, বয়েসের ডিফারেনসটা না ধরলে।

—বাপ, মেয়ে। কই দেখি।

শুয়ে শুয়েই শরীরটাকে ঘুরিয়ে জানলার পাখিতে চোখ রাখলেন,

—বাঃ, বাঃ বা ভাই। বেড়ে হচ্ছে। প্রকৃতি দেখে শরীরে প্রেম আনা হচ্ছে। যাচিলে জামাই রুটি না খায়। রাত্রি হৈলে জামাই ঢেঁকশেল চাটিতে যায়। মুখে আগুন তোমার। এইবার আমি যদি এই মানুষটাকে জড়িয়ে ধরি। কেমন হয়।

শশাঙ্ক তাড়াতাড়ি সরে গেলেন খাটের দিকে।

—এত প্রেম ছিল কোথায়? নিজের বউয়ের বেলায় সব শুকিয়ে যায়, অন্যের বেলায় উথলে ওঠে। অন্য মেয়েছেলে দেখলেই আপনারা এত চুলবুল করেন কেন বলতে পারেন?

শশাঙ্ক শুয়ে শুয়ে বলসেন,

—সবাই কি আর করে? এক এক জনের এক এক স্বভাব। কেউ কেউ নিজেকে ঠিক রাখতে পারে না। পাগলা হয়ে যায়।

—পাগলামি আমি ঘুচিয়ে দিচ্ছি। হুট করে বাড়িতে ঢুকে দুজনের

পিরিত চট্‌কে দেবে সে উপায় রাখেনি। দরজায় কড়া নাড়লেই কত্তা অমনি লুঙ্গি সামলে জপে বসে যাবেন। ছুঁড়ি গিয়ে ঢুকবে বাথরুমে। আমি এই জানলাটা খুলে এখান থেকেই চিৎকার করব, এই যে দাদু কেমন হচ্ছে, তোমাদের যম সব দেখছে।

—এই না।

শশাঙ্ক ধড়মড় করে উঠে জানলার ছিটকিনির দিকে মহিলার বাড়ান হাত চেপে ধরলেন। দুজনে চোখোচোখি হল।

—আমাকে বিপদে ফেলবেন না। এই সব নোংরা ব্যাপারে একবার জড়িয়ে গেলে, লোক হাসাহাসি হবে।

শশাঙ্ক হাত ধরে টেনে মহিলাকে চিৎ করে বিছানায় শুইয়ে দিলেন।

—উত্তেজনায় কোন কাজ করা ঠিক নয়। যা করতে হবে ভেবেচিন্তে ধীরে ধীরে। চোখ বুজে কিছুক্ষণ শুয়ে থাকুন। ভগবানই রাস্তা বাৎলে দেবেন।

শশাঙ্ক ছেলের বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়লেন। অনেকদিন পরে মেয়েছেলের গায়ে হাত দিলেন। বেশ লাগল। পুরনো একটা অনুভূতি ফিরে এল। স্ত্রীকে বেশ লাগত। পরস্ত্রীকে যেন আরও ভাল লাগল। না না, এ ভাল লাগা ঠিক নয়। খুব অন্যায়, খুব অন্যায়। শশাঙ্ক সামালকে।

শশাঙ্ক বোধ হয় একটু ঘুমিয়েই পড়েছিলেন। ভাতঘুম। ঘড়িতে চারটে বাজছে। চোখ মেলে তাকালেন। বাইরে মেঘ ভাঙা রোদ। একখণ্ড নীল আকাশে শরতের টুকরো মেঘ। উঠে বসলেন। সেই সুধা থাকলে এখন চায়ের জল বসত। এই সুধা খুব ঘুমোচ্ছে। শরীরটা শিথিল হয়ে বিছানায় পড়ে আছে, মুখটা প্রশান্ত। কোন রাগ বিরক্তি অশান্তির চিহ্ন নেই। ঘুমে সব মোলায়েম। অল্প বয়সে বেশ ধারাল মুখই ছিল। তীক্ষ্নতা একটু কমেছে। তা হলেও বেশ ভালই দেখাচ্ছে। ঠোঁট দুটো অল্প ফাঁক হয়ে আছে। লিপস্টিকের মত পানের লাল দাগ। ধবধবে একটা পা আর একটা পায়ের ওপর আড় হয়ে আছে। একটা হাত খাটের বাইরে ঝুলছে। চিকন চিকন দুগাছা সোনার চুড়ি চিক্‌চিক্ করছে। চারদিকে ছড়িয়ে আছে ভাঁজে ভাঁজে শাড়ি। গলার কাছে একটা শিরা দপদপ করছে। বুকের ভার শ্বাসপ্রশ্বাসে ধীরে ধীরে উঠছে নামছে।

হেই মাঝি। জোয়ার আসছে।

বিলেতে মেমসাহেবরা মুখ চুম্বন করে। যৌবনে একটা বই হাতে এসেছিল, আর্ট অফ কিসিং।

এই বুড়ো বি কেয়ারফুল। মক্ষী বয়ঠি সাহদ পরো পংখা গয়ে লপটাই। মক্ষী ঝটপটায় শিরধুনে, লালচ বুরি দালাই। লোভই এই সংসারে পতনের একমাত্র কারণ। দেখ শশাংক মৌমাছির হাল। মধুতে বসলেই পাখা দুটো আটকে যায়। মৃত্যু। যা করবে ভেবে চিন্তে করবে।

শশাংক রান্নাঘরে ঢুকে চায়ের জল চাপালেন। অন্যদিন এক কাপ, আজ দুকাপ। শূন্য বাড়িটা বেশ ভবাট লাগছে আজ। দুকাপ চা হাতে নিয়ে শশাংক আবার শোবার ঘরে এলেন। মহিলা তখনও অকাতরে ঘুমোচ্ছেন। শান্তি আর ঘুম হাত মিলিয়ে চলে।

—এই যে শুনছেন, উঠুন, চা এসেছে। এই যে। সুধা সুধা।

কতদিন এই নাম ধরে ডেকেছেন। উঠতে বসতে, ঘুরতে ফিরতে কি অদ্ভুত যোগাযোগ।

—সুধা, সুধা, চা।

সুধা চোখ মেলে তাকাল।

—উঠুন উঠুন, চা এসেছে।

—অ্যাঁ সকাল হয়ে গেছে!

—না, সকাল নয় বিকেল। খুব ঘুমিয়েছেন। কেমন লাগছে আপনার?

চায়ের কাপটা সুধার হাতে দিলেন। কাপড়চোপড় সব এলোমেলো আলুথালু চেহারা। এই অবস্থায় কেউ যদি দেখে ফেলে কি যে ভাববে।

—আপনি একবারও দেখেছেন।

—কি দেখেছি?

—হা ভগবান! ও বাড়ির সেই চরিত্রহীন বুড়োটা?

—না তো।

—একটা কাজের ভার দিলুম। ব্যাটাছেলেদের মত অকর্মা পৃথিবীতে খুব কমই দেখেছি।

শশাংকর সেই কথামৃতের গল্পটা মনে পড়ল। এক যাদুকর খেলা দেখাচ্ছে লাগ ভেল্কি। হঠাৎ জিভ আটকে সমাধি হয়ে গেল। সবাই ভাবলে যা ভাগ্যবানের মোক্ষলাভ হল। ওমা যেই জ্ঞান ফিরে এল, সঙ্গে

সঙ্গে আবার সে বলতে লাগল, লাগ ভেল্কি লাগ ভেল্কি, মহিলারও সেই এক অবস্থা। চায়ের কাপটা টেবিলে রেখে, মহিলা পাখি ফাঁক করে দেখতে লাগলেন।

—এই যে দেখে যান, দেখে যান, আপনাদের কাণ্ড দেখে যান।

অনিচ্ছা সত্ত্বেও শশাঙ্ক এগিয়ে গেলেন। মাথাটা নীচু করছেন মহিলাও মাথা তুলছেন। কপালে আর মাথায় ঠোকাঠুকি হয়ে গেল।

—লাগল তো?

শশাঙ্ক বললেন,

—না না, এত সামান্য লাগাকে লাগা বলে না।

চশমাটা নাকের ডগায় হেলে গেছে। চুলের তেলে কাঁচ ঝাপসা। শশাঙ্ক অস্পষ্ট হলেও ওই বাড়ির শোবার ঘরে পুরুষজাতির কাণ্ড দেখে সত্যিই অবাক হলেন। কত্তা মেঝেতে থেবড়ে বসে আছেন মেয়েটি পেছন দিক হতে গলা জড়িয়ে আছে। কত্তা পিঠে ফেলে দোল দোল করছেন। ছেলেবেলায় মার পিঠে চেপে শশাঙ্ক এইভাবে দোল খেতেন। মা বলতেন, দোল দোল দোল দোল, খোকা দোলে খোকা দোলে, দোল দোল দোল দোল।

—মনে হয় ব্যায়াম করছেন। এই বয়েসে শিরফির টেনে থাকে। বারবেলের বদলে ওই মেয়েটিকেই ওজন হিসেবে ব্যবহার করছেন। ফিজিওথেরাপি। অনেকে মোটা বই মাথার ওপর তুলে কাঁধের একসারসাইজ করেন।

—হ্যাঁ হ্যাঁ ব্যায়ামই হচ্ছে। ফিজিওথেরাপি নয় সেই থেরাপি হচ্ছে। আমার ইচ্ছে করছে এখুনি গিয়ে চুলের মুঠি ধরে শয়তানীটাকে রাস্তায় বের করে দি। হাতের তেমন জোর থাকলে এখান থেকে ঢিল ছুঁড়তুম। কিছু তো একটা করতে হয়। বলুন না মশাই কি করা যায়? একটা বুদ্ধি দিতে পারছেন না?

—আমেরিকা হলে ডিভোর্স করার পরামর্শ দিতুম। অ্যাডালটারির চার্জ এনে ঠুকে দাও মামলা।

—সাক্ষী দেবেন?

—আমি নির্বিবাদী। আমাকে কেন জড়াচ্ছেন?

—সেকি! আপনার কোনও সামাজিক দায়িত্ব নেই? চোখের সামনে অনাচার! একটা মেয়েছেলে সংসার তছনছ করে দিচ্ছে। কেউ কোনও কথা বলবে না? আগেকার দিন হলে গ্রামের মোড়ল মাথা কামিয়ে ঘোল ঢেলে

ছেড়ে দিত। কাজির আমল হলে গর্ত করে কোমর পর্যন্ত মাটিতে পুঁতে দিয়ে ডালকুকুর দিয়ে খাওয়াত।

—আপনি স্বাবলম্বী মহিলা আপনার অত ভয় কিসের? কেন পড়ে পড়ে মার খাবেন?

—বাঃ খুব বললেন যা হোক। আমি ডিভোর্স করলে আপনি আমাকে বিয়ে করবেন?

—আমি? শশাঙ্ক হাসলেন, আমার বিয়ের বয়স আছে আর?

—বিলেতে বুড়োবুড়ির বিয়ে হয় না?

- তা হয় তবে এটা তো বিলেত নয়।

—তা হলে ডিভোর্সও হয় না, হয় ঝ্যাঁটা পেটা। ঝেঁটিয়ে আমি আপদ বিদেয় করব। এক গেলাস জল খাওয়াবেন?

শশাঙ্ক জল এনে দিলেন। মহিলা ব্যাগ থেকে একটা ট্যাবলেট বের করে খেলেন।

—প্রেসারটা আবার বেড়েছে। আজ আপনি আমার যা করলেন, জীবনে ভুলব না। আপনারও কেউ নেই আমারও কেউ নেই। মিলেছে ভাল। মেয়েরাও একটু আদর চায় যত্ন চায়। শুধুই সংসারের হাঁড়ি ঠেলবে আর বাচ্চা বিয়োবে তা হয় না। এই নিন কিছু ওষুধ রাখুন, এইটা অম্বলের, এটা মাথাধরার, এটা আমাশার। আরও আরও এনে দেবে। যাই, নরকে ফিরে যাই। সতীন নিয়ে সোনার সংসার। এই বাড়িটা কি শান্তির। সেই চটের হাতব্যাগটা তুলে নিয়ে মহিলা ধীরে ধীরে দরজার দিকে এগোলেন। যাবার ইচ্ছে নেই তবু ত যেতেই হবে।

তিন

কিছু কেনাকাটার ছিল। বিসকুট ফুরিয়েছে, টুথপেস্ট গেল গেল হয়েছে, সাবানের ভেতর দিয়ে আলো দেখা যাচ্ছে। দাড়ি কামাবার ব্লেড। চিঠি লেখার প্যাড। স্টেশনারি দোকানের কাউন্টারে দাঁড়িয়ে আছেন! মালপত্তর ওজন হচ্ছে। নজর চলে গেল একটা প্যাকেটের ওপর হেয়ার ডাই, ব্ল্যাক। অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইলেন। এক শিশি কিনে দেখলে হয়। সুধা মাঝে মাঝে বলত,

কি বুড়োটে হয়ে যাচ্ছ, চুলে একটু কলপ লাগাও না। চুল কাল করে দেখতে ইচ্ছে হয়, দাদু থেকে দাদা হওয়া যায় কিনা।

পাগল। পাগল। বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ।

একশো গ্রাম লজেনসও কিনলেন। একটা মুখে ফেলে পার্কে বার কতক পাক মেরে বাড়িমুখো হলেন। পার্কে আজকাল বুড়োদের বেড়ান চলে না। ছেলেমেয়েরা বড় সাহসী হয়ে উঠেছে। তাকালে আবার সিটি মারে। বইয়ে পড়েছেন লণ্ডনের হাইড পার্কে সকালবেলা ঝুড়ি ঝুড়ি সেই সব পড়ে থাকে। নাঃ, পৃথিবীটা চিরকালই যুবক যুবতীদের! তারা যা করবে সেইটাকেই মুখ বুজে মেনে নিতে হবে। ওই যে রাধাচূড়া গাছের তলায় যে জোড়াটি বসে আছে তাদের কেউ যদি বলে, অ্যায়, কি হচ্ছে? সব কটা জোড়া তেড়ে এসে তার জিওগ্রাফি পাল্টে দেবে।

বাড়ি ফিরে এসে কাপড়ের আলমারিটা খুললেন। সবে সন্ধ্যে নেমেছে। দিন শেষের তরল অন্ধকারে জনপদের বাতি সারি সারি ভাসছে। এখনও কিছু কিছু বাড়িতে শাঁখ বাজে। শশাঙ্ক তাঁর স্ত্রীর একটি শাড়ী বের করলেন। ডুরে শাড়ী! রংটি বেশ গাঢ়। শাড়ীটাকে পাশ বালিশের ওপর ছড়িয়ে দিলেন। সুধা যেন শুয়ে আছে। একটা সায়া বের করে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখলেন। অর্গাণ্ডির একটা ব্লাউজ হাতে ধরে স্পর্শ নিলেন। পুরনো জিনিসগুলোকে জোড়াতালি লাগিয়ে হারানো অতীতকে বর্তমানে টেনে আনার চেষ্টা। যে শরীরের এই সব আচ্ছাদন সেই শরীরটা নষ্ট হয়ে গেছে। কালে এগুলো কীটদষ্ট হয়ে হারিয়ে যাবে। তাঁকেও যেতে হবে। বিছানার দিকে তাকিয়ে ডাকলেন,

—সুধা, ওঠো, সন্ধ্যেবেলা শুয়ে থাকতে নেই, ওঠো, উঠে বসো।

নিজের পাগলামিতে নিজেই হেসে উঠলেন। দুধের সাধ কি ঘোলে মেটে? সব পাট করে তুলে রাখলেন। ইডিয়েট, ইডিয়েট। একটা টিনের কৌটর মধ্যে কাঁচা সিদ্ধির পাতা ছিল। দু চিমটে মুখে ফেলে চিবোলেন। তেতো, তেতো। আজ একটু নেশা চাই, নেশা। স্বপ্ন চাই। সেই স্বপ্ন। সুধার হাত ধরে নৌকা থেকে পারে নামাচ্ছেন। সাবধান, দেখো পড় না যেন।

অনেকদিন তোমাকে চিঠি লেখা হয়নি।

মাঝে মধ্যে সুধাকে চিঠি লেখেন শশাঙ্ক। পৃথিবীর কোন পোস্টম্যান সে চিঠি বিলি করতে পারবে না। লিখে তাই ছিঁড়ে ফেলেন। ছোট ছোট সাংসারিক কথা। মান অভিমান।

সুধা, বহুদিন হয়ে গেল, জানি না তুমি আগের ঠিকানাতেই আছ, না অন্য কারুর মেয়ে হয়ে নেমে এসেছ। ভেবেছিলুম অন্তত একদিনও তুমি আমার মাথার সামনে এসে দাঁড়াবে, রাত তখন গভীর নিস্তব্ধ। আমার জ্বর হল, মানু এসে কপালে হাত বুলিয়ে দিল, তুমি কিন্তু এলে না। ওখানে তুমি হয়ত আমার চেয়ে প্রিয় কোন সঙ্গী পেয়ে গেছ। যে সব দায়িত্ব তুমি দিয়ে গেছ সবই আমি একে একে গুছিয়ে এনেছি, কেবল সুধীর বিয়েটাই বাকি। ওর কাজটা শেষ হলেই, কয়েকটি তীর্থ ঘুরে বাড়ি। তীরে আমার নৌকো বাঁধা। জোয়ার এলেই ভেসে যাব। আর কটা দিন। রাত প্রায় কাটিয়েই এনেছি, আর প্রহরখানেক মাত্র বাকি, একটুর জন্যে তাল আর ছাড়ছি না। বড় ক্লান্ত তবু মুজরো শেষ করেই যাব। ততদিন তুমি কি আমার অপেক্ষায় থাকবে? আর এক সুধা এসে কদিন খুব হামলা করছে। তোমার বিছানা দখলের তালে আছে কিনা কে জানে? মন না মতিভ্রম।

দরজার কড়া নড়ে উঠল।

কে এল? সুধী। আজ বেশ একটু সকাল। কোনদিন কখন আসে।

—যাক আজ বেশ সকাল সকাল এসেছিস।

—হুঁ।

—শরীর ভাল ত?

—হুঁ।

শশাঙ্ক একটু ঘাবড়ে গেলেন। সব প্রশ্নেরই সংক্ষিপ্ত জবাব। সুধীর ত এমন কাটাকাটা স্বভাব নয়।

—কি খাবি এখন? একটু চা বসাই?

—কোনও প্রয়োজন নেই।

ছেলেটা আজ মনের ওপর বড় ধাক্কা মারছে ত। কি হল। অসহায় বুড়ো মানুষ। বড় ভয় করছে।

—আজ তোর কি হয়েছে সুধী?

—কিছু না।

—কিছু একটা হয়েছে, তা না হলে এমন কাটাকাটা উত্তর কেন?

পোর্টফোলিও ব্যাগটা বিছানার ওপর ঝপাং করে ফেলে দিয়ে সুধী রিস্টওয়াচ খুলতে খুলতে বলল,

—তুমি আমাদের ফ্যামিলির মুখে চুনকালি মাখিয়েছ।

ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুল কপালের ওপর ঝুলে পড়েছে। চোখের ওপর চশমা। চশমার কাচে আলোর ছটা। চোখ দেখা যাচ্ছে না।

—আমি!

—হ্যাঁ তুমি। তুমি এই বয়েসে বাড়িতে একটা মেয়েমানুষ ঢুকিয়ে সারা দিন যা তা কর।

—সে কি! কে বললে?

—যাদের মধ্যে বাস করছ তারাই বললে। সমাজের চোখকে ফাঁকি দিয়ে কিছু করা যায় না বাবা!

—ভুল শুনেছিস। এ সব অপপ্রচার।

—তুমি অস্বীকার করতে পার, এ বাড়িতে কোন মহিলা আসে না?

—হ্যাঁ আসে, কিন্তু কেন আসে তুই জানিস? আসল রহস্য জানিস?

—আমি জানতে চাই না। শুধু এইটুকু জানি, আমার দুর্ভাগ্য তোমার ছেলে হিসেবে আমাকে পরিচয় দিতে হয়।

—এত বড় কথা।

—হ্যাঁ এত বড় কথা। বৃদ্ধ বয়েসে পদস্খলন। তোমার ওপর আমার সামান্যতম শ্রদ্ধাও আর নেই।

—তুই আমার কাছে ঘটনাটা শুনবি না?

—না, যা শোনার আমি প্রতিবাসীর কাছ থেকেই শুনেছি। চরিত্রহীন এক মহিলা, প্রথম স্বামীকে ছেড়ে দু নম্বর একজনের সঙ্গে ঘর বেঁধে তিন নম্বরের কাছে নাচতে আসেন। ছি ছি!

চার

সকালে শশাঙ্ককে কিঞ্চিৎ উদ্‌ভ্রান্তের মত মনে হল। শুকনো মুখ। রাতজাগা লাল চোখ। বিছানা সারারাত শূন্য পড়ে রইল। বসার ঘরেই রাত কাটালেন। সুধীর সামনে দাঁড়াবার ইচ্ছে নেই। দুজনেই দুজনের

কাছে ঘৃণিত। সুধী শোবার আগে ভেবেছিল বাবার কাছে ক্ষমা চেয়ে নিয়ে বিছানায় এনে শোয়াবে। রোজ যেমন গল্প করতে করতে ঘুমিয়ে পড়ে সেইভাবেই এক সময় ঘুমিয়ে পড়বে। কিন্তু নিজের মনকে রাজি করাতে পারল না কিছুতেই। ফেরার পথে রাজেনবাবু তাকে যা তা বললেন,

—তোমার বাবার আবার বিয়ে দাও হে। তোমার বিয়ে না হয় পরেই হবে।

কথাটা শূলের মত মনে বিঁধে আছে। চরিত্রহীন পিতার পুত্র এই পরিচয়ে সে পরিচিত হতে চায় না। সে নিজেকে বোঝাল, বেশ করেছি বলেছি। অন্যায়ের প্রতিবাদ অবশ্যই করা উচিত। হলেনই বা বাবা। যদি কষ্ট পেয়ে থাকেন, নিজের স্বভাবের জন্যেই পেলেন। যেখানে খুশি যেভাবে খুশি রাত কাটান। বাড়িতে মেয়েছেলে এনে ফূর্তির সময় তোমার মনে ছিল না বিপত্নীক বৃদ্ধ। সমাজের হাজারটা চোখ।

দুপুরের দিকে নির্জন ঘরে দাঁড়িয়ে শশাঙ্ক উন্মাদের মত বার কতক হাসলেন।

—তোমার সংসার আজ ভেঙে গেল সুধা। চারদিকে সাজান সব তাসের ঘর। জীব শিব সম সুখ মগন সপনে কিছু কর তুতি। জাগত দীন মলিন সোই বিকল বিষাদ বিভূতি। স্বপ্নের ভোগৈশ্বর্য স্বপ্নেই মিলিয়ে গেল। আমি এখন সজাগ মায়ামুক্ত, সুখের স্বপ্ন আমার কাছে ঘোর বিষাদ। তোমার স্মৃতি রইল, তোমার ছেলে রইল। আলমারি ভর্তি তোমার জামা কাপড়, গয়না রইল। তোমার ছেলের বউ এসে পড়বে। তোমারও দেখা হল না, আমারও দেখা হল না। রাত যায়, স্বপ্ন যায়, আবার রাত আসে, নতুন স্বপ্নও আসে। আমি শুধু আমাদের বিয়ের আংটিটা তোমার কাছে চেয়ে নিলাম। সকলেই আমাকে ত্যাগ করেছে। জগতের কাছে ঘৃণ্য হয়েছি। তুমি যেন ঘৃণা কর না।

সাদা টেনিস সার্ট, পায়ে ক্যাম্বিসের জুতো, হাতে কিটব্যাগ। একমাথা উস্কোখুস্কো কাঁচাপাকা চুল। চোখে পুরু কাঁচের চশমা। শশাঙ্ক সিঁড়ি দিয়ে নামছেন। শেষবারের মত তালাবন্ধ দরজার দিকে তাকালেন। মায়া কাছা ধরে টানছে। না, আর না। জয় শিবশম্ভু, উধার দে মকান লাগা দে তাম্বু।

নিচের ফ্ল্যাটের মেয়েটির কাছে চাবি রাখলেন। বলা যায় না—এই চাবিই

হয়ত আঁচলে বেঁধে তুমি একদিন ওপারে উঠবে।

—মা! আমার এই কলমটা তোমার খুব ভাল লাগত। এই কলমটা তোমাকে দিয়ে গেলুম মা। তুমি বলেছিলে বেশ লেখে।

—আপনি কোথায় চললেন, এই দুপুরবেলা?

—মনটা বড় উতলা হয়েছে মা, যাই মেয়ের বাড়ি থেকে ঘুরে আসি কদিন। তোমরা সব সাবধানে থেকো।

—কলমটা দিয়ে দিলেন?

—আর কি হবে মা। চিঠিও লিখি না, চোখেও দেখি না। তোমার কাছে আমার একটা স্মৃতি থাক, কে বলতে পারে, আজ আছি, কাল হয়ত থাকব না।

শশাঙ্ক রাস্তায় নেমে এলেন। মোড়ের মাথায় সেই বুড়ো রিকশাঅলা পাদানিতে বসে গাছের ছায়ায় ঝিমোচ্ছে। শশাঙ্ক তার সামনে এসে দাঁড়ালেন।

—তুমি গত শীতে আমার কাছে একটা সোয়েটার চেয়েছিলে?

—হাঁ বাবু।

—এই নাও।

—শীতের ত এখনও দেরী আছে।

—দূর বোকা! দেরি আছে ত কি হয়েছে। একদিন ত আসবেই, তার জন্যে প্রস্তুত হতে হবে না।

পাড়ার সকলেই শশাঙ্ককে চলে যেতে দেখেছেন। ছেঁড়া ছেঁড়া টুকরো টুকরো সেই সব কথা থেকে কিছুতেই পরিষ্কার হল না, তিনি কোথায় গেছেন। সেই হোমিওপ্যাথ ডাক্তার বললেন,

—আমাকে ওয়েলসের ডায়েরিয়া অ্যান্ড ডিসেণ্টি্র বইটা দিয়ে বললেন, রাখ তোমার কাজে লাগবে। এক পুরিয়া অর্শের ওষুধ খেলেন। জিজ্ঞেস করলুম, এমন সময় কোথায় চললেন কাকাবাবু? হাসতে হাসতে গান গেয়ে ওঠেন, জুড়াইতে চাই কোথায় জুড়াই কোথা হতে আসি কোথা ভেসে যাই।

স্পেসাল অফিসার

রামপ্রসাদ গান গেয়েছিলেন, মা আমায় ঘুরাবি কত, এমন চোখ বাঁধা কলুর বলদের মত। আর আমাদের এই প্রসাদ, প্রসাদ মিত্র ডাকবাংলার হাতায় বসে মনে মনে বলছেন, কি ফ্যাসাদে ফেললে প্রভু। কারুর ওয়াইফও নই, মিড-ওয়াইফও নই, অথচ এ কি পাপ! কুকুর ছানা কোলে নিয়ে কতক্ষণ বসে থাকতে হবে কে জানে। কুঁই কুঁই করলেই চাকরি চলে যাবে।

সময়, সন্ধ্যা। স্থান, একটি জেলা শহর। শীত আসছে। বাতাসে ঠাণ্ডার আমেজ। বেলা একটার সময় ডাকবাংলায় একটা জিপ এসে ঢুকেছিল। জিপ থেকে নেমেছিলেন সস্ত্রীক এস. ডি. ও.। মেমসাহেবের কোলে ছিল এই কুকুরটি। এখন প্রসাদের কোলে।

পমেরেরিয়ানের বাচ্চা। মেমসাহেব মুখে ঝকঝকে দাঁতের হাসি খেলিয়ে, শরীর দুলিয়ে মন্ত্রীর হাতে কুকুর বাচ্চাটি দিতে দিতে বলেছিলেন, দিস ইজ ফর ইওর ওয়াইফ স্যার। গতবার এসে আমাকে বলেছিলেন। আই প্রমিসড হার এ

বিট। আমাদের কুকুরটা তখন প্রেগনান্ট ছিল। সেন্টপারসেন্ট পেডিগ্রিড। ঠিক মত মানুষ করতে পারলে শি উইল বি এ জয় ফর এভার।

এস. ডি. ও. ভেট দিয়ে চলে যাবার পরই মিনিস্টারের খেল শুরু হয়েছে। মিনিট পাঁচেক কুকুরটাকে ঘাটাঘাটির পরই তাঁর অরুচি ধরে গেল। (দলে অরুচি ধরার মত। তিনবার দল বদল করে, এই খেপে গদি পেয়েছেন।) কুকুরটা প্রসাদের হাতে দিয়ে ডি. এমের সঙ্গে লাঞ্চ খেতে চলে গেলেন। যাবার সময় বলে গেলেন, যত্ন করবে, আদর করবে, আনন্দে রাখবে, যেই দেখবে পেট পড়ে গেছে, দুধে তুলো ভিজিয়ে চুকচুক করে খাওয়াবে। দুধ যেন বেশি ঘন না হয়, বেশি তরল না হয়। মায়ের দুধের ডাইলুসানে নিয়ে আসবে জল মিশিয়ে মিশিয়ে।

কুকুরের মায়ের দুধ কতটা ঘন, কতটা তরল প্রসাদের জানা ছিল না। ডাক বাংলার চৌকিদার, ঝাড়ুদার, খানসামা কেউই জানত না। পশুপালন হেলথ্ অফিসারও এ বিষয়ে অজ্ঞ। এত অজ্ঞতায় দেশ চলছে কি করে, কে জানে। যাই হোক প্রসাদ হাফ দুধ, হাফ জল মিশিয়ে হাতাপাতাল থেকে বরিক তুলো এনে নুটি করে ভিজিয়ে দুপুরে কুকুর বাচ্চাটাকে নানা ভাবে চেষ্টা করেছিল দুধ খাওয়াবার। সে এক দুঃসাধ্য ব্যাপার। কেঁউ কেঁউ করবে, না খাবে। একটু জোর জবরদস্তি করতেই তুলোর তালটা কুকুরের গলায় চলে গেল। চোখ উল্টে দম বন্ধ হয়ে মরে আর কি। প্রসাদ রেডি ছিল। কুকুরের প্রাণ বায়ু বেরোলেই সেও ঝুলে পড়বে গলায় দড়ি দিয়ে। কুকুরের কান দুটো ধরে পেছনটা কোঁটো ঠোকার কায়দায় কার্পেটে বার কতক ঠুকতেই তুলোর ডেলা গলা ছেড়ে পেটে চলে গেল। বিপদ কাটলেও ভয় রয়ে গেল। তুলো পেটে গিয়ে হজম হবে তো। না লিভারে মেয়েদের খোঁপার জালের মত জড়িয়ে বসে থাকবে। সঙ্গে সঙ্গে নিজেও সমপরিমাণ তুলো দুধে ভিজিয়ে খেয়ে বসে রইল। সেই পক্সের টিকে যে সাহেব আবিষ্কার করেছিলেন তিনিও তো প্রথম নিজের ওপরেই পরীক্ষা করেছিলেন। প্রসাদ একবার ভেটিরিনারি অফিসারকেও ফোন করেছিল। সরাসরি জিগ্যেস করেনি। কায়দা করে জানতে চেয়েছিল, কুকুরে তুলো খেলে কি হয়?

ডাক্তার বলেছিলেন, জুতো খেয়ে যে জাত হজম করে, তুলো তো তাদের কাছে বেলের মোরব্বা মশাই।

দুপুর গড়িয়ে সন্ধ্যে এসেছে। মন্ত্রী মহোদয় স্নান সেরে শরীরে পাউডার ঢেলে ভস্মমাথা মহাদেবটি হয়ে ধ্যানে বসেছেন। মাথার ওপর পাঁই পাঁই পাখা

ঘুরছে। শরীরের চাপে ডানলোপিলো দেবে গেছে। কোণের টেবিলে রুপোর ফোলডিং ফ্রেমে মন্ত্রীর গুরুদেব বাঘছালে বসে আছেন। শিবনেত্র হয়ে। আর একদিকে মা মহামায়া। নির্বাচন যত এগিয়ে আসছে ধ্যানের মাত্রাও তত বেড়ে যাচ্ছে। জন্মপত্রিকা নিয়ে জ্যোতিষীরা অংক কষে চলেছেন। হস্তরেখাবিদরা হাতের ওপর ম্যাগনিফাইং গ্লাস ফেলছেন।

মন্ত্রীর হুকুমে প্রসাদ কুকুর কোলে পাকুড় গাছের তলায় বসে আছে। কেঁউ কেঁউ শব্দে ধ্যানভংগ যেন না হয়। তৃতীয় নয়নে ভবিষ্যৎ দেখার চেষ্টা করছেন। আর একবার গদি চাই। কত কাজ বাকি! নিজের এলাকায় জমিজমা বেড়েছে। বাস আর ট্যাক্সি খাটছে। এইবার সিনেমা হল, আর একটা কোল্ডস্টোর হলেই কে আর গদির পরোয়া করে! চুলোয় যাক তোদের দেশ, চুলোয় যাক রাজনীতি। চাষীর জমিতেও চাষ হবে, মন্ত্রীর জমিতেও চাষ হবে। চাষ হলেই হল। হিমঘর তো দেশের চাষ আবাদের কল্যাণেই। অর্থনীতি বলছে, ধরো, ধরে রাখ, চড়ো আরো চড়ো, তারপর ছাড়ো। মন্ত্রী বলে কি মানুষ নন। মানুষের কাজই তো গুছনো। আখের চাষের মতই, আখেরের চাষ।

রাতে মন্ত্রী বিশেষ কিছু খেলেন না। লাঞ্চে গুরুভোজন হয়েছে। মাছের মুড়ো দিয়ে সোনামুগের স্পেসাল ডাল। সরু বাসমতী চালের দুচামচে ভাত, একটা মুরগীর ঠ্যাং, এক চৌকো পুডিং দিয়ে রাতের আহার শেষ করে বিশাল একটি ঢেঁকুর তুললেন। পেটের মত মুখও গুরুগম্ভীর হয়ে আছে। নির্বাচন আসন্ন। জেলায় পার্টির ভেতরের অবস্থা বিশেষ ভাল নয়। ফাটল ধরেছে চাকলা চাকলা। যে যেমন পারছে খাবলা খাবলা টাকা মেরে সরে পড়ছে। কোঁদল শুরু হয়ে গেছে। কোঁদল থেকে কোদাল। কোদালেই কবর তৈরি হয়। দাঁতে কাঠি খুঁচতে খুঁচতে ডাকবাংলার বারান্দায় পায়চারি করছেন আর সুর করে বারে বারে একটি নামই উচ্চারণ করছেন, বসন্ত, বসন্ত। অসুখ বসন্ত নয়, মানুষ বসন্ত। রাজনীতির প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী। হজমী পায়চারি চালাতে চালাতে প্রশ্ন করলেন, খাওয়া হয়েছে?

প্রসাদ বললে, এইবার বসব স্যার।

মন্ত্রী বিরক্ত হয়ে বললেন, তোমার নয়, তোমার নয়, কুকুরের খাওয়া হয়েছে?

হয়েছে স্যার।

সারাদিন ক'লিটার দুধ খেয়েছে!

প্রসাদ বিপদে পড়ে গেল। ক ফোঁটায় লিটার হয় জানা নেই। কেউ যদি প্রশ্ন

করেন ক'লিটার কে'দেছে, কোন উত্তর হয় কি ? প্রসাদ বললে, প্রায় এক বাটি।

ইডিয়েট। তোমার মাপজোকের কোনও ফ্যাকালটি নেই। চেষ্টাও কর না। সেদিন ডিস্ট্রিকট কনফারেন্সে জিগ্যেস করলুম, জেলায় কত ধান হয় ? বলতেই পারলে না। ইনএফিসিয়েন্ট ! মন্ত্রীর সঙ্গে ঘুরছ, স্ট্যাটিস্টিকস তোমার মুখে মুখে থাকা উচিত। যখন যা চাইব. চটপট বলে দেবে। তা না, হাঁ করে নিরেট নীরেনের মত মুখের দিকে তাকিয়ে থাকবে। দেশের বারোটা তোমরাই বাজাবে। যেমন অ্যাডমিনস্ট্রেসানের অবস্থা, তেমনি পলিটিক্সের অবস্থা। আমার কি, তোমরাই বুঝবে ঠ্যালা।

মন্ত্রী হাই তুললেন। ঘুম আসছে। জড়ান গলায় বললেন, আমি শুয়ে পড়ছি। কাল ভোরেই বেরতে হবে। তুমি কুকুরটাকে কাছে নিয়ে শোবে। মাতৃস্নেহে সারারাত রাখবে। একটা মা বের করার চেষ্টা কর প্রসাদ। পৃথিবীতে মায়ের বড় অভাব। খরা চলেছে। স্নেহ নেই, ভালবাসা নেই. থাকার মধ্যে ছত্রিশটা দল। ভোট ভাগাভাগি। ভাগের মা গঙ্গা পায় না !

চৌকিদার প্রসাদকে বললে, বাবু ওটাকে হিঁস করিয়ে নিয়ে শুতে যান। তা না হলে বিছানা ভেজাবে। সব সময়েই তো কেঁউ কেঁউ করছে। বুঝবেন কি করে, কোন কেঁউটা হিসির। প্রসাদ গাছতলায় কুকুরটাকে রেখে হিস্হিস্ হিসসস করতে লাগল। চারপাশে গাছ, মাথার ওপর তারাভরা আকাশ। ঠাণ্ডা বাতাস বইছে। কুকুরটা পায়ের কাছে গোল হয়ে ঘুরছে আর কেঁউ কেঁউ করছে। মানুষের বাচ্চা হিস বোঝে।, কুকুরের ভাষাটা কি ? প্রসাদ বিরক্ত হয়ে বার কতক ঘেউ ঘেউ শব্দ করে কুকুরের ভাষা নকল করার চেষ্টা করল। লাভ হল না। শেষে ধৈর্য হারিয়ে বিছানায় চলে এল। সাধে বলে, মা হওয়া কি মুখের কথা।

অনেক রাতে প্রসাদের ঘুম ভেঙে গেল। পেটের কাছটা ভিজে ভিজে লাগছে। পাজামার দড়িটাকে মাতৃস্তন ভেবে মুখে পুরে মন্ত্রীর কুকুর সারা-রাত চুকুর-চুকুর চুষে ভিজিয়ে দিয়েছে। কেমন গুটিসুটি মেরে কোলের কাছে শুয়ে আছে। প্রসাদ বড় সন্তুষ্ট হল, যাক এতক্ষণে কুকুরে কুকুর চিনেছে।

হাইওয়ে দিয়ে মন্ত্রীর গাড়ি ছুটছে। সবুজ রঙের ঝংঝকে অ্যামবা-সাডার। অন্যান্যবার প্রসাদ সামনে ড্রাইভারের পাশে বসে, এবারে ইঞ্জিনের গরমে কুকুরের কষ্ট হবে বলে মন্ত্রী নিজেই সামনে বসেছেন। প্রসাদ

পেছনের আসনে। কোলের ওপর তোয়ালে, তার ওপর কুকুর। পাশে প্লাস্টিকের ঝুড়িতে দুটো ফিডিং বোতল। একটায় দুধ, আর একটায় জল। প্রসাদের নিজের চান আর ব্রেকফাস্ট না হলেও কুকুরের প্রসাধন হয়েছে। পাউডার পড়েছে গায়ে, লোমে বুরুশ পড়েছে। গাড়ির ঝাঁকুনিতে মাঝে মধ্যে প্রসাদের কোল ছেড়ে খচরমচর করে পালাবার চেষ্টা করলেও সুবিধে করতে পারছে না। একদিনেই প্রসাদ বাচ্চা সামলাবার কায়দাটা বেশ রপ্ত করে ফেলেছে। মন্ত্রীকে সামলাতে পারে না ঠিকই, মন্ত্রীও কি পারেন ভোটার সামলাতে, দপ্তর সামলাতে, দল সামলাতে। প্রসাদ ডান হাতের বুড়ো আঙুলটা কুকুরকে চুষতে দিয়েছে, তাইতেই জীবটি বোকা বনে প্রসাদের কোলে পড়ে আছে। সেই একই টেকনিক। দেশের মানুষও তো ওই একই ভাবে পড়ে আছে, রাজনীতির বুদ্ধাঙ্গুষ্ঠ চুষে। ওরাও জীব এরাও জীব। ওরা পাঁচ বছর পারে আর এ ব্যাটা ঘণ্টা দুয়েক পারবে না। বোকা বানান কি এতই শক্ত!

মাইল চারেক আসার পর মন্ত্রী বললেন, প্রসাদ একবার ঘুরিয়ে নাও। প্রসাদ রাস্তার পাশে নেমে কুকুরকে হিস হিস করতে করতে নিজেরই পেয়ে গেল। করার উপায় নেই। গাড়িতে ফিরে এল। মন্ত্রী বললেন, ড্রাই হয়ে গেছে সিসটেম, একটু জলের বোতলটা ধর।

আবার মাইল চারেক গিয়ে মন্ত্রী বললেন, প্রসাদ ট্রাই কর। প্রতি চার মাইল অন্তর প্রসাদ নামে আর ওঠে। এদিকে নিজের পেট ফেটে যাবার অবস্থা। কুকুরের বদলে তাকে করতে বললে ছোটখাট একটা পুকুর তৈরি করে দিতে পারে। শেষে শান্তিপুরের কাছে একটা জংলা জায়গায় প্রসাদ কুকুর নিয়ে নেমে আর সামলাতে পারল না। নিজেও বসে পড়ল। অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল বোধহয়। পেছন ফিরেই চক্ষু চড়ক গাছ। কুকুর নেই। কিছু দূরে হাইওয়ের ওপর মন্ত্রীর সবুজ গাড়ি। প্রসাদ চাপাগলায় ডাকল, আয় আয় তু তু। ডাক শুনে নীচের ঢালু জমি থেকে একটা ঘিয়ে ভাজা নেড়ি কুকুর উঠে এসে ন্যাজ নাড়তে লাগল। ধ্যার ব্যাটা তোকে কে ডেকেছে। প্রসাদের মনে হল, সে যে ডাকে ডেকেছে তাতে নেড়িই সাড়া দেবে। বিলিতির ডাক আলাদা। জোরে ডাকতে পারছে না, মন্ত্রী শুনতে পেয়ে যাবেন। হঠাৎ নেড়িটা ঢাল বেয়ে একটা ঝোপের দিকে এগিয়ে গিয়ে গড়গড় গড়গড় শব্দ করতে লাগল। মরেছে। মন্ত্রীর কুকুর বোধহয় ঝোপে

গিয়ে ঢুকেছে। কামড়ে ছেড়ে দিলে রক্ষে নেই। পড়ি কি মরি করে প্রসাদ ঢাল বেয়ে নামতে গিয়ে পা হড়কে সড়াত করে ফুট ছয়েক হেঁচড়ে নেমে গেল। প্রসাদের পতন দেখে নেড়িটা ভয়ে সরে গেছে। প্রসাদ ঝোপঝাড় থেকে বাচ্চাটাকে বগলদাবা করে কামড়ের হাত থেকে বাঁচালেও নিজে আর ওপরে উঠে আসতে পারছে না। পতন যত সহজে হয় আরোহণ তত সহজে হয় না। দুটো হাত কাজে লাগাতে পারলে হয়ত হত। এক হাতে কুকুর। ছফুট ওপরে আকাশের পটে মন্ত্রী মহাশয়ের মুখ দেখা গেল। তিনি কিছু বলার আগেই প্রসাদ নীচে থেকে বললে,

পড়ে গেছি স্যার।

মন্ত্রীর মুখটি প্রসাদের চোখে কালো আর বীভৎস দেখাচ্ছে। পেছনে উজ্জ্বল আকাশের জন্যেই বোধ হয় ওই রকম মনে হচ্ছে। সাদা সাদা দাঁত ফাঁক হয়ে লাভা স্রোতের মত মন্ত্রীবাক্য নিঃসৃত হল,

পড়লে কি করে?

প্রসাদ কুকুরটাকে দেখিয়ে বললে, আজ্ঞে এ বড় বাইরে করতে নেমেছিল।

ড্রাইভারের সাহায্যে প্রসাদ ওপরে উঠে এল! কেটেকুটে গেছে। হাতে বাবলা কাঁটা ফুটে গেছে। চেহারা দেখে মন্ত্রী বললেন, অপদার্থ! গুড ফর নাথিং।

এক মাসের মধ্যে প্রসাদের প্রোমোশান হয়ে গেল। যে ফাইল কিছুতেই নড়ছিল না, কখনও ডিপার্টমেন্টে আটকায়, কখনও ফাইনান্স থেকে অবজেক-সান নিয়ে ফিরে আসে, সেই ফাইল হঠাৎ সচল হয়ে প্রসাদকে ভাঙা চেয়ার থেকে চেম্বারে তুলে দিলে। মন্ত্রীর কুকুরের বয়েস বেড়েছে, প্রসাদের পদমর্যাদাও বেড়েছে। চেম্বার ছোট হলেও চেম্বার। টেবিলে কাঁচ। চেয়ারের পেছনে ভাঁজ করা তোয়ালে। প্রসাদের কতদিনের আশা। চেম্বারের বাইরে নেমপ্লেট। কাঠের টুকরোর ওপর সাদা হরফে লেখা—স্পেসাল অফিসার। কিসের স্পেসাল অফিসার তা ঠিক না হলেও স্পেসাল অফিসার। টেবিলে আবার ঘণ্টা পেয়েছে। টিপলেই কোঁ কোঁ করে বেজে ওঠে। হঠাৎ একদিন দেখা গেল চকখড়ি দিয়ে স্পেসাল অফিসারের পাশে ব্র্যাকেট দিয়ে কে বা কারা লিখে গেছে, ডগ। প্রসাদ মিত্র। স্পেসাল অফিসার (ডগ)। তা লিখুক। প্রসাদ এখন মিত্তির সাহেব। অধস্তনেরা স্যার সম্বোধন করে।

আজ আছি কাল নেই

'কে, দীনবন্ধু নাকি? এখানে অন্ধকারে ঘাপটি মেরে বসে আছ?'।

'আরে ভবেশ নাকি? তুমি এ সময়ে। কোথায় চললে? বাড়ি ঢুকলে না? আমাব পাশ দিয়েই ত দুরমুশ করতে করতে গেলে, বেরিয়ে এলে কেন? অফিস থেকে ফিরলে, চা জলখাবার খাবে। কুশল বিনিময় করবে সারাদিনের পর। এমন আধলা ইট খাওয়া লেড়ি কুকুরের মত মুখ কেন গো?'

'তোমার পাশে একটু স্থান হবে ভাই?'

'হবে, বারোয়ারি রক, ধুলো ঝেড়ে বোসো। বেশি ওপাশে যেও না। কেলো এইমাত্র বেপাড়ার এক মস্তান কুকুরের সঙ্গে চুলোচুলি করে এসে সবে ন্যাজ গুটিয়ে শুয়েছে। মেজাজ চড়ে আছে। ঘ্যাক করলেই তলপেটে চৌদ্দটা।' ফুংফুং করে ধুলো উড়িয়ে ভবেশ বসে পড়ল। বসার সময় হাতের আঙুলে কি একটা ঠেকল দীনবন্ধুর বাজারের ব্যাগ। কপি মুলো, ভিজে পালংশাক চারপাশে ছেতরে আছে। দীনবন্ধু অফিস থেকে ফেরার পথে,

রোজই বাজারটা সেরে আসে। অভ্যাসটা মন্দ নয়। শীতের ছোট্ট সকাল খানিক সময় বেরোয়। একটু তারিয়ে তারিয়ে দাড়ি কামান যায়। নয়ত তাড়াহুড়োয় ধরো আর মারো টান। ছাল চামড়া গুটিয়ে সাফ।

ভবেশ বলে, 'একি বাজার নিয়ে বসে আছ? দু'কদম এগোলেই ত বাড়ি। বাজারটা রেখে এলেই পারতে। এই নোঙরার মধ্যে ফেলে রেখেছ? পালমে ইনফেকসান ঢুকবে।'

দীনবন্ধু দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললে, 'হাতে ঘড়ি নেই, কটা বাজল তোমার ঘড়িতে?'

'আটটা বাজতে দশ।'

'উঃ এখনো ঝাড়া দেড় ঘণ্টা।'

'হ্যাঁরে ভাই ঝাড়া দেড় ঘণ্টা।'

'বুঝতে তাহলে পেরেছ কেন বসে আছি?'

'হ্যাঁরে ভাই পেরেছি। একটু চা হলে মন্দ হত না।'

'এখান থেকে হেঁকে বিভূতিকে বলো, ভাঁড়ে দুটো চা। দুটো লেড়ো বিস্কুটও দিতে বলো।'

দীনবন্ধু আর ভবেশ খান ছয় বাড়ি ব্যবধানে থাকে। দুজনেই ভাল চাকরি করে। নির্বিরোধী ভদ্রলোক বলে পাড়ায় যথেষ্ট সুনাম আছে। এ তল্লাটে সস্তায় জমি পেয়ে দু'জনেই বাড়ি তৈরী করে স্ত্রী-পুত্র পরিবার নিয়ে সংসার ধর্ম পালন করছে। সেই কথায় আছে, খাচ্ছিল তাঁতী তাঁত বুনে, কাল হল তাঁতীর ছেলে গরু কিনে। দুজনের বাড়ির ছাদের দিকে তাকালে দেখা যাবে পাঁচটি করে অ্যালুমিনিয়ামের আঙ্গুল আকাশের গায়ে ঈশ্বরের আশীর্বাদ খুঁজছে। চ্যাটালো তার বেয়ে সেই আশীর্বাদ ভেণ্টিলেটার গলে কাঁচের পর্দায় কখনো নৃত্যে, কখনো কথকথায়, কখনো সঙ্গীতে গলে গলে পড়ে। সবচেয়ে মারাত্মক দিন শনিবার। সেদিন হয় বাংলা, না হয় হিন্দী ছায়াছবি। গেরস্থের আর্তনাদ, পাঁচু প্রাণ যায়।

অদ্য সেই শনিবার। বাংলা ছায়াছবির আসর। অশ্রুসিক্ত ছবি। খটখটে ছবি হলেও দর্শকের অভাব হয় না। পালে পালে পিলপিল করে আসতে থাকেন নেণ্ডিগেণ্ডি, পুঁচিপেঁটিক নিয়ে। দীনবন্ধু টিভি কিনেছিল এরিয়ারের টাকায় স্ত্রীকে খুশি করার জন্যে। আহা! একা একা বাড়িতে থাক, সন্ধ্যেটা তোমার ভালই কাটবে। স্ত্রীও খুব নেচেছিল। টিভি

আসবে শুনে আহলাদে আটখানা হয়ে কচুরি ভেজে স্বামীকে খাইয়েছিল। জুট কার্পেট পাতা লবিতে টিভি সগৌরবে প্রতিষ্ঠিত হলেন। ছাদে ফোঁস করে ফুঁসে উঠল টিভিশুঁগুলি। সারা পাড়াকে জানান দিতে লাগল, আমি এসেছি, আমি এসেছি। তোমরা এস হে। এইবার বুঝিয়ে দিয়ে যাও কত ধানে কত চাল।

ভবেশ টিভি কিনেছিল গৃহবন্দী, অবসরভোগী বৃদ্ধ পিতার সান্ধ্যসঙ্গী হিসেবে। দোতলায় পিতার সুবৃহৎ শয়নকক্ষে নীল পর্দা আঁটা সেই যন্ত্র এখন শক্তিশালী যন্ত্রণা। ডজনখানেক বিভিন্ন স্বভাবের বৃদ্ধের পীঠস্থান। তাঁদের হাঁচি. কাসি, নাসিকাঝর্তন, কলহ, মতামত প্রকাশের ঘনঘটায় প্রতিটি সন্ধ্যা ভবেশকে স্মরণ করিয়ে দেয়, বাপলায়তে স জীবতি।

দুই কৃতকর্মভোগী কৃতী পুরুষ পাঁচুবাবুর রকে বসে ভাঁড়ের চা খাচ্ছেন। মশা তাড়াচ্ছেন। নর্দমার চাপা গন্ধ শুঁকছেন আর মনে মনে বলছেন, একেই বলে, বাঁশ কেন ঝাড়ে আয় মোর হিন্দিস্থানে। ভাঁড়টাকে সাবধানে পায়ের তলাব বন্ধ নর্দমায় বিসর্জন দিয়ে ভবেশ বললে, ভট করে চা খেয়ে ফেললুম, বড় বাইরে পেলে মরব।

মরবে কেন? বাড়িতে গিয়ে নামিয়ে আসবে।

বাথরুম খালি পেলে তো? বারোটা শর্করারোগী মিনিটে মিনিটে ছুটছেন, আর প্রতিবার হাতে জল নিয়ে সেইখানে আর গোড়ালিতে শাস্ত্রসম্মত ঝাপটা মারছেন। চোখ বুজিয়ে বাথরুমের অবস্থাটা একবার অবলোকন করার চেষ্টা কর ভাই। কর্পোরেশনও লজ্জা পাবে।

তোমার বাথরুম? আমি মানসচক্ষে আমার বসার ঘর দেখছি আর আঁতকে আঁতকে উঠছি।

দীনবন্ধুর বসার ঘর ঠেসে গেছে। অনাহূতরা সারি সারি বসে আছেন বিশিষ্ট অভ্যাগতদের মত। কাউকেই ফেরাবার উপায় নেই। শত্রুতা বেড়ে যাবে। বলে বেড়াবে, বেটার অহঙ্কার হয়েছে। ভগবানের গুনছুঁচ যেদিন বেলুন ফুটো করে দেবে সেদিন চামচিকির মত চুপসে গাবগাছের তলায় পড়ে থাকবে। দীনবন্ধুর স্ত্রী শাপশাপান্তকে ভীষণ ভয় পায়। লাল আলোয়ান গায়ে ওই যে বসে আছেন মীনুর দিদিমা। দু হাঁটুতেই বাত। অন্য সবাই মেঝেতে কার্পেটের ওপর থেবড়ে আছেন, তিনি বসেছেন সোফায়। মুখপোড়া বাত আর জায়গা পেলে না, ধরল এসে হাঁটুতে। 'কত্তা যাবার সময় ওইটি

দিয়ে গেলেন।'

গোবিন্দর মা কোণের দিক থেকে বললেন, 'ও কথা বলছেন কেন? কত্তা একটা বাড়ি রেখে গেছেন, তিনটি ছেলে দিয়ে গেছেন, চার মেয়ে। আর কি চাই?'

'আ মোলো কথার ছিরি দেখ। আমরা আজকালের বিবি ছিলুম না তোমাদের মত। সারা জীবন পেটে একটা কিছু না থাকলে আমাদের কালে শরীরটা খালি খালি মনে হত। বড়ো গর্ব করে বলতেন, সুখদা আমার ইঁদুর কল, একটু ঠুকরেছ কি অমনি ঝপাং। হাত ঠেকালেই সোনা। তোমরা হলে ফাঁকিবাজ। একটা কি দুটা অমনি ছুটলে। কাটিয়ে কুটিয়ে ফাঁকা হয়ে ফিরে এলে।'

দীনবন্ধুর স্ত্রী বিরক্ত হয়ে বললে, 'কি হচ্ছে দিদিমা? বাচ্চারা বসে আছে।'

'তুমি আর সাউকুড়ি করতে এস না। ওরা সব বাচ্চার বাবা। দেখলে না ঠুলির বিজ্ঞাপনের সময় কি রকম হাসাহাসি করছিল। তুমি মা এযুগের মেয়ে। তুমি ওসব বুঝবে না। তোমরা হলে মেয়েমানুষ। আমাদের কালে মুতের কাঁতা শুকোতে পেত না। দাও এক গেলাস জল দাও। আ মর, সিনেমা বন্ধ করে মাগী সেই থেকে বকেই মরছে। আহা কি রূপের ছিরি। চুলে বব করে বসে আছেন। বুকের দিকে না তাকালে ছেলে কি মেয়ে বোঝে কার বাপের সাধ্য।'

বুলডগের মত মুখ করে মীনুর দিদিমা পাগলে পাগলে হাওয়া খেতে লাগলেন।

একেবারে লাগোয়া বাড়ির চার বউ রেলের পিস্টনের মত আসা যাওয়া করছেন। স্থির হয়ে বসার উপায় আছে কি? পাশে ছড়ান সংসার। টিয়াপাখির ঠুকরে ঠুকরে পেয়ারা খাবার কায়দায় চার বউয়ের টিভি দেখা চলেছে। ব্যোমে পায়রা বসার মত। বড় বউ যেন দিশী গোলপায়রা। বয়সের মাঝ সমুদ্রে বয়ার মত শরীর। তিনি একটি বেতের মোড়া দখল করেছেন।

তাঁর সন্তানসন্ততিতে চারপাশে গোল করে মাকে ঘিরে রেখেছে। বসতে না বসতেই তার খেয়াল হল, আলমারির গায়ে চাবিটা ঝুলিয়ে রেখে এসেছেন। সৃষ্টি পড়ে আছে আলমারিতে। দিনকাল ভাল নয়। বড়

মেয়েকে বললেন, 'চাবিটা নিয়ে আয় তো।' বড় মেয়ে ছবিতে মশগুল। প্রেমিক প্রেমিকাকে নিয়ে গাড়ি চালাতে চালাতে গান ধরেছে, এই পথ যদি না শেষ হয়, তবে কেমন হত? লাল্লা লালা লালা। বড় বললে, 'থাক না।' মা একটা চাপা হুংকার ছাড়লেন, 'টিভি দেখা ঘুচিয়ে দেব তোর।' মেয়ে অন্যমনস্ক উত্তর দিলে, 'যাও, সব করবে।' মা হুহুংকারে বললেন, 'দেখবি?'

মীনুর দিদিমা বললেন, 'দুটোকেই বের করে দাও।'

বড় বউ মুখ বেঁকিয়ে ভেঙচি কেটে বললেন, 'কত বড় সাহস! যার ধন তার ধন নয় নেপোয় মারে দই। আপনি বের করে দেবার কে?'

মীনুর দিদিমা হুংকার ছাড়লেন দীনবন্ধুর স্ত্রীকে, 'বউমা, 'বউমা, 'বউমা।'

বড় বউ ততোধিক জোরে বললেন, 'বউমা কি করবে? বউমা এসে আমার মাথা কেটে নেবে?'

টিভির পর্দায় নায়ক নায়িকারা তখন কোরাসে চেল্লাচ্ছেন, লা লালা, ল্যাল্লা, লাল্লা।

মেজ বউটি যেন সীরাজু পায়রা। লাট খেতে খেতে এলেন। এসেই বললেন, 'যাও দেখগে যাও, তোমার নতুন সুজনিতে ছোটর ছেলে পেচ্ছাব করেছে।'

'তোশক ভিজেছে, তোশক ভিজেছে?' বড় বউ মোড়া ছেড়ে লাফিয়ে উঠলেন। ধাক্কায় 'মোড়া কাত হয়ে মহাদেবের ডম্বরুর মত গড়াতে গড়াতে গদায়ের মার কোলের ছেলেটার মাথায় গিয়ে খোঁচা মারল। আঁচলচাপা ছেলে চুকুর চুকুর দুধ খাচ্ছিল। অষ্টপ্রহর তিনি চুষতে না পেলে চিল্লে বাড়ি মাথায় করেন, মোড়ার খোঁচায় বোঁটা ছেড়ে তিনি 'হাইফাই' স্পিকারের মত ওঁয়া ওঁয়া, হোঁয়াও, ওঁয়াও করে মিউজিক ছাড়লেন। প্রেমিক প্রেমিকার 'তুমি, তুমি' হুইসপার চাপা প'ড়ে গেল। মেজ পুতুল নাচে ধসেপড়া পুতুলের মত জমির হাতখানেক ওপর দিয়ে লাট খেয়ে একপায়ে ঝপাৎ করে বসে পড়ে বললেন, 'কার মিউজিক? কার মিউজিক রে?'

পম্পা, শম্পা চম্পা তিন বোন। বাপ মা দু'জনেই চাকুরে। মাথায় মাথায় তিন বোন। পম্পা শরীরের চেয়েও ঘেরে বড় ম্যাক্সি পরে, একবার করে আসছে, বসছে, আবার বেরিয়ে যাচ্ছে। আসা আর যাওয়ার পথে পোশাকের ধাক্কায় সাইক্লোন বয়ে যাচ্ছে। প্রথমে উল্টে গেল দাঁড়া টেবিল-ল্যাম্প। শেডফেড ছিটকে চলে গেল।

মীনুর দিদিমা বললেন, 'দীনুর কাণ্ড দেখ। মাথার ওপর এত আলো তাতে হচ্ছে না। ব্যাঙের ছাতার মতো আলো গজিয়েছে মেজে থেকে।'

দ্বিতীয়বার ছিটকে পড়ল কাটগ্লাসের অ্যাশট্রে। সিগারেটের টুকরো, ছাই, দেশলাই কাঠি কার্পেটের ওপর ছত্রাকার। তার ওপর থেবড়ে বসলেন পাশের বাড়ির সেজ বউ। বসতে বসতে বললেন, 'বেশিক্ষণ বসবো না। ডাল চাপিয়ে এসেছি।' যেন সমবেত মহিলামণ্ডলী তাঁর কাছে জানতে চেয়েছিল তিনি কতক্ষণ বসবেন? কেন বসবেন না?

হঠাৎ সামনের সারির এক বাচ্চা আর একটা বাচ্চার ঝুঁটি ধরে বেশ বারকতক ঝাঁকিয়ে দিল। লেগে গেল দুজনে ঝটাপটি। তারফার ছিঁড়ে লণ্ডভণ্ড হবার আগেই দীনুর বউ দৌড়ে গিয়ে দুজনকে দু'পাশে সরিয়ে দিল। এ বলে তুই বাপ তুললি কেন, ও বলে তুই বাপ তুললি কেন? দীনুর বাড়ি যে মহিলা কাজ করেন, এরা তাঁর বংশপরম্পরা। কান ধরে বার করে দিলে কাল থেকে তিনি আর কাজে আসবেন না। দুজনকে দু'কোণে বসাতে হল। সেখান থেকেই তারা মুখ ভ্যাঙাভেঙি করতে লাগল। একজনের বই ভাল লাগেনি, সে হাত পা ছড়িয়ে ফ্ল্যাট হয়ে পড়ে আছে। ঠ্যাং ধরে টেনে সরিয়ে দেবার উপায় নেই। এখুনি বাড়ি ঘেরাও হয়ে যাবে। দীনের বন্ধুরা এসে দীনুর মাথা কামিয়ে, ঘোল ঢেলে ছেড়ে দেবে।

বড় বউ লাফাতে লাফাতে ফিরে এসে মেয়েদের হুকুম করলেন, 'যা ছোটর বিছানায় করে আয়। ভাসিয়ে দিয়ে আয়।'

মেজ হাতের তালুতে চিবুক রেখে দাঁত চাপা সুরে বললেন, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ করে আয়, যেমন বুনো ওল, তেমনি বাঘা তেঁতুল।'

যে মেয়ে চাবি আনতে রাজি হচ্ছিল না, ঝগড়ার গন্ধ পেয়ে সে তীর বেগে ছুটল। ছোট মেয়ে বোকা বোকা, সে ক্রমান্বয়ে জিজ্ঞেস করতে লাগল, 'দিদি কি করতে গেল মা?' ওপাশ থেকে কে একজন বলে উঠল 'হিসি।'

দীনুর স্ত্রী থাকতে না পেরে রাগ রাগ গলায় বললে, 'টিভি বন্ধ করে দি।'

মীনুর দিদিমা বললেন, 'বাড়িতে বায়স্কোপ বসালে অমন একটু হবেই মা। অধৈর্য হলে চলে?'

নায়ক নায়িকাকে একটু আদরটাদর করছিলেন। কোণের দিকে বাচ্চাবখা খঁসক করে সিটি মেরে উঠল। ওরই মধ্যে প্রবীণা একজন আপত্তি করলেন,

'এতটা বাড়াবাড়ি ভাল নয়! ভদ্দরলোক ছোটলোক এক হয়ে গেলে যা হয়।'

ব্যাস লেগে গেল ধুন্ধুমার। 'ছোটলোক, কথার ছিরি দ্যাখো। নিজে ভারি ভদ্দরলোক। ছেলে তো ছ'মাস বাইরে ছ'মাস ভেতরে।'

মীনুর দিদিমা হঠাৎ বলে উঠলেন, 'হ্যাঁগা এই বুঝি তোমাদের উত্তমকুমার?'

পম্পা পাল তুলে ফড়ফড় করে চলে গেল। বাতাসে দেয়াল থেকে ক্যালেণ্ডার খসে পড়ল। পম্পা হ্যাটট্রিক না করে ছাড়বে না জানা কথা। দৃকপাত নেই। বসেই একগাল হেসে বললে, 'কি সুন্দর?'

বড়র মেয়ে ফিরে এসে বললে, 'ওদের চাকরে হলুদের হাত মুছে দিয়ে এসেছি। গোবাপায়ের ছাপ মেরে এসেছি।'

সেজ বউ বললে, 'কাজটা ভাল করনি।'

মেজ বললে, 'কেন করেনি? বেশ করেছে। ওদের সঙ্গে ওইরকমই করা উচিত। যেমন কুকুর তেমন মুগুর। শাস্ত্রে আছে।'

সেজ বললে, 'বাচ্চা ছেলে শীতের সময় একটু করে ফেলেছে। তোমরা দুজনে আদাজল খেয়ে মেয়েটার পেছনে লেগেছ।'

'তোমাকে যে উল দিয়ে হাত করেছে। তুমি তো বলবেই।'

দীনবন্ধু ভবেশকে বললে, 'আর তো পারা যায় না। সময় যে চলতে চায় না।'

'প্রায় মেরে এনেছি।'

কুকুরটা উঠে দাঁড়িয়ে গা-ঝাড়া দিল। দীনু বললে, 'এ ব্যাটাও পেছনে লেগেছে। সেই থেকে খ্যাচর খ্যাচর গা চুলকোচ্ছে আর ভটাস ভটাস গা-ঝাড়া দিচ্ছে।'

বাড়ি ঢুকে দীনবন্ধু প্রথমে গেট বন্ধ করল। দুটো পাল্লাই হাট খোলা ছিল। সদরে ঢোকার মুখে ধেড়ে পাপোস পায়ের ধাক্কায় মাতালের মত কাত হয়ে পড়েছিল। দীনু ধুলোসমেত টেনেটুনে সেটাকে যথাস্থানে নিয়ে এল। টেবিল ল্যাম্পটাকে সোজা দাঁড় করাতে করাতে বললে, 'এটা কি হয়েছে। হকি খেলেছিল নাকি?'

দীনুর স্ত্রী বললে, 'ওই রকমই হবে।'

'এ কি, দামী অ্যাশট্রে, এখানে উল্টে পড়ে আছে। তোমরা সত্যি। মীনুর

দিদিমা সিগারেট খাচ্ছিল ?'

দীনুর স্ত্রী বললে, 'একটা কথা নয়, ওইরকমই হবে।'

'এ কি এখানে কে চীনাবাদামের খোসা জড়ো করেছে ? তুমি সত্যি একেবারে কাছাকোঁচা খোলা।'

'ওইরকমই হবে।'

'তার মানে ? সামনের শনিবার স্ট্রেট বলে দেবে, হবে না, ঢুকতে দেওয়া হবে না।'

'আমি পারব না, পারলে তুমি বোলো।'

দীনু চাপা গলায় বললে, 'আপদ।'

'তোমারই আমদানি।'

দীনু কার্পেটের ওপর ঝাড়ু চালাতে চালাতে বললে, 'ধূপ জ্বালো, ধূপ। সারা ঘর ভেপসে উঠেছে।'

টিভির সামনে এসে মনে মনে সেই প্রার্থনা আবার জানাল, 'হে পিকচার টিউব দয়া করে বিকল হও।'

ওদিকে ভবেশ বৃদ্ধ সিধু জ্যাঠাকে বাড়ি পেশছে দিতে দিতে একই প্রার্থনা বিধাতার দরবারে পেশ করল। বৃদ্ধ কাশতে-কাশতে বললেন, 'চোখে ছানি, দেখতে পাই না, তবু সময়টা বেশ কাটে। একটা হিসেবও পাওয়া যায়, কে রইল, কে গেল আজ আছি কাল নেই।'

আমার ভূত

আমার ছেলেকে আমি সায়েব বানাবো।

রঙে নয়। শিক্ষায়, দীক্ষায়, মেজাজে, সহবতে। আমি কালো। আমার ছেলে ঝুল কালো। যখন হাসে, মনে হয় ভাল্লুকে শাঁকালু খাচ্ছে। বাপ হয়ে ছেলের সমালোচনা করা উচিত নয়। বউ ফর্সা, ছেলেটা কেমন যেন আবলুস কাঠের মত হল? অভিজ্ঞরা বলেন, ভেব না, মেয়ে তোমার মেম হবে। ছেলেরা বাপের দিকে যায়, মেয়েরা মায়ের দিকে। কৃষ্ণ কালো, কোকিল কালো, কালো চোখের মণি। কালো জগৎ আলো।

সায়েব-পাড়ার ইস্কুলে ব্যাটাকে ভর্তি করাতে হবে।

পয়সা যখন আছে কেন করব না। কিন্তু পয়সায় ত আর নামকরা স্কুলের দরজা খুলবে না। সে অনেক হ্যাপা। শুনেছি, শিশু যখন মাতৃজঠরে ভ্রূণের আকারে গর্ভসলিলে হেঁট মুণ্ডু ঊর্ধ্ব পুচ্ছ তখনই নাকি ভাল স্কুলের ওয়েটিং লিস্টে নাম লেখাতে হয়। স্ত্রীর কানের কাছে চিৎকার করে ইংরেজি বই পড়তে হয়। পুরনো দিনের লেখকের লেখা চলবে না। হাল আমলের লেখক চাই। আমেরিকান লেখক হলে ভাল হয়। গোর ভাইডাল, সল বেলো, স্টেইনবেক। স্ত্রী ডাকলে হ্যাঁ বলা চলে না। বলতে হবে ইয়েস্। এমন

কিছু বই পড়ে শোনাতে হবে যাতে ইয়াংকি স্ল্যাং আছে! হ্যারল্ড, রবিনস, হেডলি চেজ। এ সব করার উদ্দেশ্য, ভ্রূণের চারপাশে একটা ইংলিশ মিডিয়াম তৈরী করা। মানে বনেদটাকে বেশ শক্ত করে গেঁথে তোলা।

আমার শ্যালিকা এ সব ব্যাপারে ভারি এক্সপার্ট। আমার বউয়ের মত গাঁইয়া নয়। বহুকাল আগেই চুলে তেল মাখা ছেড়েছে। শ্যাম্পু করে চুলের চেহারা করেছে কি সুন্দর। ম্যারিলিন মনরোর মত। ফুরফুর করে হাওয়ায় উড়ছে। ঠোঁটে চকোলেট কালারের লিপস্টিক, তার ওপর লিপগ্লস! আজ পর্যন্ত, আমি একবারও ফ্যাক ফ্যাকে ঠোঁট দেখিনি। অলওয়েজ স্মার্ট। চোখে ব্ল্যাক প্যান্থারের চোখের মত বিশাল এক গগলস। সেকসকে সোচ্চার করে রেখেছে। শাড়ি পরার অসাধারণ কায়দা কোথা থেকে সে রপ্ত করেছে! যেমন কোমর তেমনি তার কায়দার প্রদর্শনী। চীনে খাবার ছাড়া খায় না। মাঝে মধ্যে ফ্রাই খায়। স্যুপ দেখলে আমার বউয়ের মত মেগো করে ওঠে না। শুনেছি মাঝে মধ্যে একটা দুটো বিড়ি ফোঁকাও করে থাকে। নাইটি পরে শুতে যায়।

সেই মায়ের ছেলে পেট থেকে ড্যাডি ড্যাডি করে পড়বে, তাতে আর আশ্চর্যের কি আছে! শ্যালিকা বলে, সাজ, পোশাক, আহার বিহারের ওপর মানুষের অনেক কিছু নির্ভর করে। বিকিনি পরলে বাঙালী মেয়েও, কিস মি কিস মি ডার্লিং বলে সি-বীচে ছুটতে থাকবে। শাড়ি পরলে, বলদ, গোয়াল, সাঁজালে, সিঁথির সিঁদুর সন্ধ্যের শাঁখ এই সবই মনে আসবে। মনে আসবে ঘুঁটে, গোবর, গুল, গঙ্গাজল। দোজ ডেজ আর গন পাঁচু!

এখন বাইকের পেছনে বয় ফ্রেন্ডের কোমর জড়িয়ে ধরে অফিসে যাবার যুগ পড়েছে। জীবনের পেছনে লেখা থাকে—Look here. সাঁঝের বেলায় আর সাঁঝাল নয় পার্ক স্ট্রীটের আলো আঁধারী, ঝকাঝকম, ঝকাঝম বারে বসে লাল ঠোঁটে, লাল পানীয়ের গেলাস!

আমার ছেলের মা সারাজীবন কি করে এল? ছাপা শাড়ি পরে এতখানি একটা খোঁপা করে শ্বশুর, শাশুড়ির সেবা। সকাল থেকে রাত পর্যন্ত হেঁসেল ঠেলা। পেটে পুঁই শাক, লাউয়ের ডাল, ছ্যাঁচড়া, খোসা চচ্চড়ি। সেই মায়ের ছেলে ব্যাবা, ব্যাবা করবে না ত, কি করবে?

বউয়ের ত অনেক ধরন আছে। কেউ বউমা, মানে যার মধ্যে মা মা ভাবটা বেশ প্রবল। কেউ বধূ। যার মধ্যে কন্যাভাব প্রবল। কেউ শুধুই বউ,

সাদামাটা, ঘরোয়া একটা ব্যাপার। কেউ ওয়াইফ। স্লিভলেস ব্লাউজ, অর্গ্যাণ্ডির শাড়ি, সে এক আলাদা ব্যাপার। কেউ আবার মিসেস। একটু রঙ চটা। দেহে তেমন বিন্যাস নেই একটু এলোমেলো। বেঁচে থাকার ধরনটা গেলেও হয়, থাকলেও হয়। সংসার চলছে চলুক।

কথায় আছে, স্বভাব না যায় মলে, ইজ্জত না যায় ধুলে। ইজ্জত বলে না ইল্লত বলে কে জানে। একই মায়ের দুটি মেয়ে। আমারটি এক রকম, শ্যালিকাটি আর এক রকম। ওই জন্যেই মানুষের উচিত শ্যালিকাকে বউ করে বউকে শ্যালিকা করা। সে ত আর হবার উপায় নেই, ভেতরে ভেতরে ফোঁস-ফোঁস করে জীবন কাটাই।

একদিন, দু'দিন ইংরেজী সিনেমায় নিয়ে গেলুম। ঘুমিয়ে ঘণ্টা পার করে দিলে। কি গো, ঘুমোচ্ছ কি, ছবি দেখ। অত বড় একজন অভিনেতা মারলেন ব্র্যাণ্ডো।

মুখে সুপুরি ঠুসে কি যে ইংরিজী বলছে কিছুই বুঝতে পারছি না মাথামুণ্ডু।

বোঝার চেষ্টা কর।

তুমি কর। পরে আমাকে গল্পটা বলে দিও।

লাও, বোঝো ঠ্যালা।

দ্বিতীয়বার ঘুমের আয়োজন করতে করতে বললে, মোগলাই খাওয়াবে ত?

ওই এক শিখে রেখেছে, কলকাতায় এলেই মোগলাই। মোল্লার দৌড়।

কেন চাইনিজ খাবে চলো।

না বাবা আরসোলার গন্ধ!

ফিস ফ্রাই।

না বাবা, হাঙরের তেলের গন্ধ।

আমাদের পাশে এক ভদ্রলোক বসেছিলেন, তিনি বললেন, স্বামী-স্ত্রীর ব্যাপার, ও সহজে ফয়সালা হবে না। এখন দয়া করে চুপ করুন, পরে বাইরে গিয়ে যা হয় করবেন।

ইস্‌। লজ্জার একশেষ। তারপর থেকে কোনও দিন আর বউকে কোনও ব্যাপারে চাপাচাপি করিনি। যা হবার তা হবে। এখন ছেলেটা বেশ চড়কো হয়েছে, তাকেই মানুষ করার চেষ্টা করি।

অনেক ধরাধরির পর বেশ নামজাদা এক সায়েবী স্কুল থেকে একটা ভর্তির

ফর্ম মিলল। আমার চোদ্দপুরুষের ভাগ্য। ফর্ম জমা পড়বে, তারপর পরীক্ষা দিতে হবে। রেজাল্ট দেখে দশজনকে নেওয়া হবে।

এইটুকু ছেলের কি পরীক্ষা হবে? মুখে এখনও আধো আধো বুলি। কোমর থেকে প্যান্ট খুলে খুলে পড়ে যায়। কেউ কোনও উলটোপালটা কথা বললে আঁচড়ে কামড়ে দেয়।

ওই আঁচড়ানোটাই ভয়ের। স্কুলের প্রিন্সিপ্যালকে যদি কামড়ে দেয়। সারা জীবনের মত হয়ে গেল। সারসারি বাইম আর পড়তে হচ্ছে না। দুলে দুলে পড়ে যাও, সকালে উঠিয়া আমি মনে মনে বলি। পাড়ার বাঙলা স্কুলে ইন্দিতার চটকান জামা প্যান্ট পরা ছেলেদের সঙ্গে জীবন কাটিয়ে কেরানিগিরি কর। পিন্ডি-চটকান ভাত, ঢ্যাঁড়স ভাতে, কাঁচ কাঁচালঙ্কা দিয়ে বাকি জীবন গিলে মর।

ছেলেকে খুব তালিম দিতে থাকলুম মাসখানেক ধরে। পাখির ইংরেজী, বার্ড। সাহেবরা উচ্চারণ করে ব্যার্ড। টিকটিকির ইংরেজী গেকো। পাখিটি—দ্য ব্যার্ড, স্ত্রী লোকটি, দ্য উওম্যান। ভারতের প্রধানমন্ত্রীর নাম কি? মানুষ কবে চাঁদে গিয়েছিল? কি তাঁদের নাম? সুপ্রভাত, গুড মর্নিং। আমি স্যান্ড উইচ খাই, আই ইট স্যান্ডউইচেস। স্যান্ড মানে বালি, উইচেস মানে ডাইনীরা। আগামী কাল, টুমরো। হাড়ের ভেতর থাকে ম্যারো। টুম্যারো। গতকাল, ইয়েসটারডে। বলো বাবা, বলো। মানিক বলো! না, মানিক বড় সেকেলে, বাঙলা নাম। বলো জ্যাকি, বলো! আমি ভাল ছেলে, আই অ্যাম এ গোড, গোড না গুডই বলো, আই অ্যাম এ গুড বয়!

পরীক্ষার দিন সাত সকালে স্বামী-স্ত্রী ছেলেকে নিয়ে গেলুম পরীক্ষা দেওয়াতে। কর্মকর্তারা বললেন, আপনারা রাস্তায় দাঁড়ান, অভিভাবকদের ভেতরে প্রবেশ নিষেধ। ছেলেকে আমাদের হাতে ছেড়ে দিন। ছেলেও শালা তেমনি। নিজের ছেলেকে কেউ শালা বলে। রাগে বলে। সে ব্যাটা মায়ের কোমর জড়িয়ে ধরে আদুরে গলায় চেঁচাতে লাগল, না, আমি যাব না।

বলতে চেয়েছিলুম, ডোণ্ট বি ফাসসি জ্যাকি। রাগে মুখ দিয়ে বেরিয়ে এল, ভুতো, মারব এক চড় রাসকেল।

সামনেই দাঁড়িয়ে ছিলেন, ফাদার কিচলু। তিনি বললেন, ও, দ্যাটস নট দি ওয়ে।

কি করব ফাদার। রাগে মাথায় খুন চেপে যাচ্ছে।

ওঃ নো নো, খুন চাপিলে চলিবে না। বি সফ্‌ট, বি এ ফাদার, নট এ বুচার।

কাম, মাই সান। মাই লিটল হোলি চাইলড।

ফাদার জানোয়ারটার কোমর দু'হাতে জড়িয়ে ধরে মিশনারী কায়দায় কাছে টেনে নিতে চাইলেন।

কোন্ মাল থেকে কি মাল বেরিয়েছে জানা ছিল না। ভুতো তার পুরনো দাওয়াই ছাড়ল। ঘ্যাঁক করে ফাদারের ডান হাতে দাঁত বসিয়ে দিল।

ও গড, হি ইজ এ লিটল সেটান, অ্যান আগলি ডার্কলিং। আই নিড সাম অ্যান্টিসেপটিক, এ টেট ভ্যাক।

টেট ভ্যাক লাগবে না ফাদার। ট্রিপল অ্যান্টিজেন দেওয়া আছে।

অ্যান্টি র‍্যাবিজ দিয়েছিলেন কি ?

সে তো কুকুরকে দেয় ফাদার।

হি ইজ মোর দ্যান এ ডগ।

আমি ওকে একটা কষে চড় মারতে পারি ফাদার ! ভীষণ রাগ হচ্ছে।

নো নো ডোণ্ট ডু দ্যাট। একটি চড় আপনি আপনার গালে মারুন।

কামড়াবার পর ছেলে একটু শান্ত হল। ফাদারের গাউনের ঝোলা বেল্ট ধরে আমাদের দিকে তাকাতে তাকাতে স্কুলে গিয়ে ঢুকল। আহা চেহারার যা ছিরি হয়েছে। তখন অত করে বারণ করলুম, ভদ্রমহিলা শুনলেন না, চোখে কাজল পরাবার কোনও প্রয়োজন ছিল। সায়েবদের ছেলেরা কাজল পরে ? সারা মুখে কাজল চটকেছে। ভাগ্যিস, ভুতের মত গায়ের রঙ, তা না হলে কি সুন্দরই না দেখাত !

স্কুল বাড়ির দিকে তাকিয়ে দু'জনে গাছতলায় বসে রইলুম পাশাপাশি। শালীর ছেলেটা কি স্মার্ট ! এই বয়েসেই ইংরেজি গালাগাল দিতে শিখেছে ! আধো আধো ভাষায় কি সুন্দর লাগে শুনতে ! ও ছেলে বিলেত যাবেই। ওই জন্যেই লোকে মেম বিয়ে করে। ছেলেটা অন্তত সায়েব হবে। আমার বউটাকে দেখ ! ঠিক যেন শাড়ি জড়ান প্যাকিং কেস ! প্যাকিং কেস থেকে ভুতই বেরবে।

সারা স্কুল বাড়িটা হঠাৎ কেঁদে উঠল। অসংখ্য শিশু কাঁদছে। হাজার রকম সুরে। ঠিক যেন শুয়োরের খোঁয়াড়ে আগুন লেগে গেছে। কি হল রে বাবা ! সব অভিভাবকই চঞ্চল হয়ে উঠলেন। কান্নার পরীক্ষা হচ্ছে নাকি। পরীক্ষক হয় ত প্রশ্ন করেছেন—হাউ টু ক্রাই। একটু পরে হয় ত হাসি শোনা যাবে। থাক-

বাবা, এই একটা আইটেমে আমার ছেলে ফুল মার্কস পাবে। কেউ হারাতে পারবে না।

এক বাঙালী ভদ্রলোক আমার ছেলেকে চ্যাংদোলা করে স্কুল বাড়ি থেকে বেরিয়ে এলেন, ব্যাটা হাত পা ছুঁড়ে চেল্লাচ্ছে দেখ। কানের পোকা বেরিয়ে আসবে।

নিন মশাই, আপনার ছেলেকে বাড়ি নিয়ে যান। ত্রিসীমানা থেকে দূর হয়ে যান। নিজে কেঁদে সব ছেলেকে কাঁদিয়ে এসেছে। নিয়ে যান, নিয়ে যান!

এসো বাবা এসো, কে মেরেছে বাবা?

মায়ের আদিখ্যেতা শুরু হল। আদর দিয়ে বাঁদর হয়েছে। দু চোখ বেয়ে কালো জল পড়ছে। ভূতের কান্না ত কালোই হবে।

ওটাকে নর্দমায় ফেলে দাও!

আহা, বাছা আমার! ফুলে ফুলে কাঁদছে।

রাসকেল আমার।

কান ধরে টানতে টানতে নিয়ে চললাম—চল, তোর আর সায়েব হয়ে দরকার নেই। তুই বাঙালীই হবি চল।

টিফিনের সময় সোমনাথ বললে, 'আমার মনে হয় যূথিকা তোর প্রেমে পড়েছে।'

যূথিকা আমাদের নতুন টাইপিস্ট। এই মাসখানেক হল চাকরি পেয়েছে। শ্যামবর্ণা কিন্তু মুখটি ভারি মিষ্টি। দেহটিও মন্দ নয়। না লম্বা, না বেঁটে। মাথায় অনেক চুল, তা না হলে অত বড় খোঁপা হয় কি করে। চোখে সোনালী ফ্রেমের ফিনফিনে চশমা। হাসলে গালে টোল পড়ে। সামনে দিয়ে চলে গেলে হৃদয়ে দোলা লাগে। অফিসে আরও মেয়ে আছে, তবে তাদের কেউ না কেউ দখল করে বসে আছে। যেমন সোমনাথ রেবাকে। একমাত্র যূথিকাই ফ্রি আছে। আর অপরপক্ষে আমরা দুজন, আমি আর বিধান। বিধানের সম্প্রতি ফ্লু হয়েছে। অফিসে আসছে না।

'কি করে বুঝলি?'

'টাইপ করতে করতে মাঝে মাঝেই তোর দিকে তাকিয়ে থাকে।'

আমি যেখানে বসি তার পেছনেই বিশাল একটা জানলা। সেই জানালায় হাওড়ার পোল আটকে আছে। যূথিকা হয়ত পোলটাই দেখে। মেয়েরা অত সহজে প্রেমে পড়বে বলে বিশ্বাসই হয় না। বহুত কাঠখড় পুড়িয়ে তবে প্রেম। প্রেম কি যাচিলে মেলে, আপনি উদয় হয় শুভ যোগ পেলে।

'আমার দিকে তাকায় না, আমার পেছনের হাওড়ার পোলের দিকে তাকায়।'

'তোর দিকেই। আমার সঙ্গে চোখাচোখি হলেই কেমন ঘাবড়ে যায়।'

'ঠিক বলছিস ?'

'ডেড সিওর।'

হতেও পারে। সোমনাথ ভেটারেন প্রেমিক। প্রেম কা কচ্চে। হিন্দি ছবিতে এইরকমই যেন কি একটা বলে। মেয়েছেলে একসপার্ট। মেয়েদের চোখে চোখ রেখে মনের গভীরে ঢুকে যেতে পারে। কথায় কথায় বলে, এই সংসার সমুদ্রে এমন কোন মেয়ে নেই যাকে আমার চারে ভেড়াতে না পারি! বলে বলে লটকে আনব।

সেই সোমনাথ যখন বলছে তখন সত্যিই হয়ত যূথিকা আমার প্রেমে পড়েছে।

'আমার এখন তাহলে কি করা উচিত ?' প্রশ্নটা করে কেমন যেন বেখাপ্পা লাগল। মেয়ে যেন প্রথম গর্ভবতী হয়ে ডাক্তারের পরামর্শ চাইছে।

সোমনাথ গম্ভীর মুখে বললে, 'নট ব্যাড। মেয়েটা ভালই। পটাতে পারলে সহজেই পটবে। তবে প্রেম আর মামলা মকর্দমা একই নেচারের জিনিস। সময় দিতে হবে। ভাল খেলোয়াড়ের মত খেলতে হবে, খেলাতে হবে। তোকে একটু স্মার্ট হতে হবে। এই ম্যাদামারা, ভিজে বেড়াল ভাবটা সামলাতে হবে। বি এ সোডা ওয়াটার বট্‌ল। মুখ খুললেই ভাব আর ভাষার গ্যাঁজিলা বুজবুজ করে বেরোতে থাকবে।'

'কিন্তু ব্যাপারটা ত এখনও মুখোমুখি হয় নি। চোখাচোখি হয়েছে বললেও ভুল হবে। চোখা হয়েছে চুখি হয়নি।'

'দ্যাটস ট্রু। তোমার সেই চোখকে এবার কায়দা দেখাতে হবে। চোখে চোখ মারতে হবে।'

'ছি ছি ছি চোখ মারা খুব গর্হিত কাজ, লোফারদের কাজ। আমাদের পাড়ায় একটা মেয়ে আছে সে চোখ মারে বলে তার নামই হয়ে গেছে চোখমারা মিনু। ও ভাই আমি পারব না। ভীষণ শক্ত কাজ। একটা চোখ খোলা রেখে আর একটা চোখ পিচিক করে বোজান।'

'আরে সে চোখ মারা নয়। এ হল নজরো কা তীর মারে কষ কষ কষ, এক নেহি, দো নেহি, আট নও দশ। স্ট্রেট তাকিয়ে থাকবি প্রেমিকের পাওয়ারফুল দৃষ্টিতে। বিবেকানন্দের চোখ, মজনুর হৃদয় এই হল প্রেমিকের অ্যানাটমি।'

আমরা দুজনে পাশাপাশি বসে কথা বলছি। চা দিয়ে গেছে চা খাচ্ছি। ওদিকে

আমাদের আলোচনার সাবজেকট উল্টো দিকের দূ সার টেবিলের ওপারে বসে খটুস খটুস করে টাইপ করে চলেছে। সোমনাথের কথা শোনার পর আমি একবারও ওদিকে তাকাইনি। যূথিকার পাশে বকুল, বকুলের পাশে রমা, রমার পাশে আশা। সারি সারি যুবতী, যৌবন যায় যায় এমন সব মহিলা। সকলেরই কিছু না কিছু অ্যাফেয়ারস আছে।

সোমনাথ বললে, 'তোর ড্রেসটাও পালটাতে হবে। এই মালকোঁচা মারা ধুতি আর দাদু মার্কা শার্ট চলবে না। কেমব্রিকের পাঞ্জাবি গোটা চারেক বানা। স্টিম লন্ড্রিতে কাচাবি। তিন দিনের বেশি পরবি না।'

'বেশ কস্টলি হয়ে যাবে না?'

'তা একটু হবে ভাই। প্রেম আর ব্যবসায় ইনিশিয়াল ইনভেস্টমেন্ট কিছু থাকবেই। বিনা পয়সায় হয় না। সে হয় মেয়েছেলেদের। মেয়েরা হল রিসিভার। আমরা দিয়ে যাব, ওরা নিয়ে যাবে।'

'কি দেবে?'

সোমনাথ বেমক্কা প্রশ্ন শুনে রাগ রাগ মুখে তাকাল।

'তুমি শালা জান না কি দেবে? যা দেবার তাই দেবে। প্রেম পাকলে বিয়ে হবে। বিয়ে হলে বুক ফুলিয়ে বলতে পারবি, লাভ ম্যারেজ। লাভ ম্যারেজে একটা ছেলের ইজ্জত কত বেড়ে যায় জানিস? লাভার হল হিরো, টক অফ দি টাউন।'

আমি একটু ঘাবড়ে গেলুম। প্রেম এবং বিবাহ। প্রেম জিনিসটা মন্দ নয়। কিন্তু বিয়ে। যূথিকার সঙ্গে বিয়ে মানে অসবর্ণ বিবাহ। মেরে ফেলবে। বাড়ি থেকে লাথি মেরে দূর করে দেবে। ত্যাজ্যপুত্তুর করে দেবে। আমার কোষ্ঠীটাও আবার তেমন ভাল নয়। বদনামের যোগ আছে। চরিত্র নাকি চোট খাবে।

'আচ্ছা সোমনাথ, শুধু প্রেম হয় না ভাই? বিয়ে ফিয়ে বড় ঝামেলার ব্যাপার। ওটা এভয়েড করা যায় না?'

'যায়, তবে কিছু স্টিকি মেয়ে আছে, আঠাপাতার মত গায়ে লেপটে যায়, ছাড়ান যায় না।'

'যূথিকাকে তোর কি মনে হয়?'

'আর একটু স্টাডি করে বলব। তবে জেনে রাখ, প্রেমে অনেক হোঁচট থাকে। কটা প্রেম ম্যাচিওর করে রে! হাতে গোনা যায়। আমাদের

ইনসিওরেন্সের মত। প্রিমিয়াম ল্যাপস করবেই। কেস ক্যাচ। ভেরি ডিফিকালট সাবজেকট। মেয়েরা প্রথম প্রেমে ধাত পাকায়, দ্বিতীয় প্রেমে খেলা করে, তৃতীয় প্রেমে দাগা খায়। তারপর যখন দেখে যৌবন যায় যায়, তখন নাছোড়বান্দা হয়ে ঝুলে পড়ে। বিয়ের ভয়ে পেছিয়ে যাসনি। সিমটম যখন দেখা গেছে তখন ব্যাপারটা নিয়ে একটু ড্রিবল কর।'

'কি ভাবে করব, বলবি ত?'

'তুইও কাজ করতে করতে যখন তখন তাকাবি। চোখে চোখ ঠেকলে উদোবঙ্কার মত ভয়ে চোখ নামিয়ে নিবি না। ধরে রাখবি। আস্তে আস্তে সময় বাড়াবি। চোখে হাসবি।'

'চোখে হাসব কি রে! লোকে ত মুখেই হাসে।'

'আজ্ঞে না স্যার। প্রেমিকের হাসি চোখে। রোজ আয়নায় সামনে দাঁড়িয়ে প্র্যাকটিস করবি।'

'ভয় করে।'

'কি ভয় করে? কাকে ভয় করে? ভয়ের কি আছে রে। প্রেমে আর রণে ভয় পেলে চলবে না।'

'আমাদের পাড়ার মধুকে একটা মেয়ে একবার জুতো মেরেছিল। মধুর অপরাধ সে মেয়েটাকে দেখলেই মুচকি মুচকি হাসত।'

'মধু ইডিয়েট।'

'ইডিয়েট! কেন ইডিয়েট?'

'প্রথমে চোখে চোখে সইয়ে নিয়ে তারপর হাসতে হয়। দেওয়ালে পেরেক ঠোকা। প্রথমে ঠুকুর ঠুকুর তারপর ঠকাস ঠকাস।'

'যদি আবার ঠকে যাই।'

'ঠকে যাই মানে?'

'এই ত তিন চার দিন আগে। আমি যাচ্ছি, উলটো দিক থেকে একটা মেয়ে আসছে। পাড়ারই মেয়ে। মুখ চেনা। হঠাৎ হাসল। আমিও হাসলুম। আমি হাসতেই তার মুখটা গম্ভীর হয়ে গেল। খুব নার্ভাস হয়ে গেলুম। ভয়ে ভয়ে পেছন ফিরে তাকালুম। আমাকে দেখে হাসে নি। সে হেসেছে আমার পেছনে একটা ছেলে আসছিল তাকে দেখে। মনটা এত খারাপ হয়ে গেল মাইরি! আমার দিকে তাকিয়ে হাসতে কি হয়েছিল! মেয়েটা এত নিষ্ঠুর! কুকুরের মত। ওয়ান মাস্টার ডগ।'

সোমনাথ সিগারেট খেতে খেতে বলল, 'ও রকম একটু আধটু মিসফায়ার হবেই। ভাল শিকারীর বন্দুক থেকেও মাঝে মধ্যে শিকার ফসকে যায়। প্রেমের পেছনে চোখ নেই। সাকসেসের রাস্তা হল লিপ বিফোর ইউ লুক। জহরব্রতের মত, জয় মা বলে ঝাঁপ মার আগুনে।'

সোমনাথ মেয়ে মহলের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে সিগারেট টানছে। যূথিকা বকুলের সঙ্গে হেসে হেসে কথা বলছে। একদিন আমার সঙ্গেও হয়ত হেসে হেসে ওই ভাবে কথা বলবে। জলজ্যান্ত একটা মেয়ে। চুল, খোঁপা, আঁচল। ভাবা যায় না। ভেতরটা কিরকম গুড়গুড় করে উঠছে। প্রেমের উপন্যাসে যা পড়েছি তা এবার সত্য হবে। হবে তো?

সিগারেটটা অ্যাশট্রেতে চেপে ধরে সোমনাথ উঠে দাঁড়াল। আমার মাথার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে। কি দেখছে রে বাবা? লোকে হাত দেখে, কপাল দেখে, মুখ দেখে। মাথা দেখে বলে জানা ছিল না। সোমনাথ অ্যাস্ট্রলজি করে শুনেছি। অবশ্য নিজে কখনও সামনে হাত ফেলে পরীক্ষা করে দেখিনি, অ্যাস্ট্রলজি না হেয়ারোলজি।

সোমনাথ হাতের একটা আঙুল আমার মাথার চুলে ঠেকিয়েই চাটনি চাখার মত করে তুলে নিল। 'ইস ছি ছি, তুই চুলে তেল মাখিস? থার্ডক্লাস। কবে যে তুই মানুষ হবি। নো তেল। চুলে তেল মেখে প্রেম হয় না। প্রেম হল ফুরফুরে ব্যাপার। চুল ফুরফুরে, মন ফুরফুরে, প্রেম ফুরফুরে।'

সোমনাথ চলে গেল। আজ আবার ময়দানে খেলা। খেলার মাঠে যাবে। ঠিক ম্যানেজ করে অফিস কাটবে। আমাদের অত সাহস নেই। সাহস না থাকলে পৃথিবীতে কিছু করা যায় না। ক্রীতদাস হয়ে ফাইল রগড়াও। একবার আড়চোখে যূথিকার দিকে তাকালুম। না আমার দিকে তাকিয়ে নেই। মাথা নীচু করে টাইপ করছে। কানের দুল নড়ছে টিনিটিনি করে। কে কার প্রেমে পড়ছে। আমি যূথিকার না যূথিকা আমার। ভেবে লাভ নেই। দেখা যাক কি হয়।

টিফিনের পর দেখা গেল। ছোট্ট লেডিজ রুমাল বের করে ঠোঁটের ঘাম মুছতে মুছতে যূথিকা আমার দিকে তাকিয়ে আছে। হঠাৎ মাথা ঠোকা-ঠুকির মত চোখে ঠোকাঠুকি হয়ে গেল।

সঙ্গে সঙ্গে ভয়ে চোখ নামিয়ে নিলুম। চোখ নামালেও মন-ঘুড়িটা

যূথিকার আকাশেই লাট খেতে লাগল। কমলালেবু রঙের শাড়ি পরেছে ৷ সাদা ব্লাউজের হাতা ওপর বাহুতে খাপ হয়ে বসে আছে। একপলকের দেখা? কি জানি, আমাকে দেখছিল, না আমার পেছনে আকাশের টঙে হাওড়ার পোলের সদ্য রঙ করা ঝলমলে মাথা? সোমনাথ বলে যায় নি কতক্ষণ অন্তর অন্তর দেখা উচিত। পরের বার যখন চোখ তুলে তাকালুম যূথিকা নেই। শূন্য চেয়ার। ধাৎ তেরিকা, গেল কোথায়! এখন ত সবে তিনটে। ছুটি হতে পাক্কা দুঘণ্টা বাকি। এর নাম প্রেম। গ'দের আঠার মত চেয়ারে যদি আটকেই না রইল তাহলে আর প্রেম হল কি। বড় অভিমান হল। সোমনাথ বলার পর থেকে আমি একবারও সিট থেকে উঠিনি। সামান্য অদর্শনে প্রেম যদি চটকে যায়? সব সময় চোখের সামনে নিজেকে হাজির রেখেছি। দুয়ারে খাড়া এক যোগী। ধুর, প্রেম ফ্রেম সব ফল্‌স। আসলে ক্লান্ত চোখটাকে নীল আকাশে একটু খেলিয়ে নেয়। আমার দিকে তাকাবে কেন? আমি কি সিনেমার হিরো। মেয়েরা হয় হিরোর প্রেমে পড়ে, না হয় ভিলেনের। আমি ত কোনোটাই নই। মাছি মারা কেরানি।

॥ দুই ॥

আমার একটু সকাল সকাল অফিসে আসা অভ্যাস। বাসে-ট্রামে ভিড় কম থাকে। তাছাড়া চড়া রোদে রঙ কালো হবার ভয় থাকে না। দরজা দিয়ে ঢুকতেই বুকটা ছাঁত করে উঠল। যূথিকা এসে গেছে। কেউ কোথাও নেই। বহু দূরে নৃপেনবাবু টেবিলে জোড়া হাঁটু ঠেকিয়ে উট হয়ে খবরের কাগজ পড়ছেন। একটা পিওন খালি এসেছে। পকেট থেকে একগাদা কাগজ বের করে একমনে সারা মাসের ঘুষের হিসেবে ব্যস্ত। আড়চোখে যূথিকাকে একবার দেখে নিলুম। বেশি দেখ দেখ না। কালকের ঘটনায় ঘণ্টনায় আমার ভীষণ অভিমান হয়েছে। কথা বললে বন্ধ করে দিতুম। বলি না বলে বেঁচে গেল।

যূথিকা নিচু হয়ে টেবিলের নীচের ড্রয়ারটা ধরে টানাটানি করছে।

সরকারী টেবিল। মাঝে মাঝেই ড্রয়ার আটকে যায়। আমাদেও আটকায়। লাথালাথি করলে তবে খোলে। খেলোয়াড় না হলে যেমন প্রেম হয় না, সরকারী চাকরিও করা যায় না। সবে একমাস চাকরি হয়েছে মহিলার। এখনও অনেক কিছু শিখতে বাকি।

হঠাৎ মনে হল, এই সুযোগ। নাও অর নেভার। পাশে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করলুম।

'কি খুলছে না? আটকে গেছে?'

উঃ। যূথিকা ওই নিচু অবস্থাতেই ঘাড় বেঁকিয়ে খোঁপা লতপাতিয়ে আমার দিকে তাকাল। কি মনোরম, কি অপূর্ব, কি অসাধারণ।

'দেখুন না খুলছে না। চাবি ঘুরে যাচ্ছে অথচ...

'একেই বলে কলের গ্যাঁড়াকল।' বাঃ বেশ বলেছি স্ট্রেট বলেছি, একটুও আটকায়নি।

'দেখি, সরুন। এসব লোয়েস্ট কোটেশানের মাল। খোলার কায়দা আছে।'

যূথিকা সোজা হল। এতক্ষণ হেঁট হয়েছিল। আহা মুখটা বেগুন হয়ে গেছে। আমি উবু হয়ে চেয়ারের পাশে বসে পড়লুম। ধুতি পরার ঐ সুবিধে। আমার মুণ্ডুর একেবারে পাশেই যূথিকার জোড়া ফল। সেন্টের কি প্রসাধনের গুমোট গন্ধ। ফ্লোরে শাড়ির ঘের ছড়িয়ে আছে। ভেবেছিলুম আমাকে বসতে দেখে ছুঁয়োনা ছুঁয়োনা বঁধুর মত একটা ভাব করে সরে বসবে। না সে সব কিছুই করল না। একেবারে সহজ। যেমন ছিল তেমনিই বসে রইল জমাটি হয়ে। উঃ সোমনাথ, মার দিয়া কেল্লা। যূথিকার একটা হাত তখনও চাবির ওপর।

'কই দেখি।'

গলাটা একটু কাঁপা কাঁপা মনে হল। হাতে হাত ঠেকল। যেন শক খেলুম। ঠিকই, মেয়েদের শরীরে বিদ্যুৎ আছে। ঠেকলেই ঝটাস করে মেরে দেয়। প্রথম প্রথম ডি-সি। তারপর কনভার্টারে পড়ে এ সি। আঁকড়ে মাকড়ে ধরে।

চাবিটা বোঁ করে ঘুরে গেল। বাঃ বেশ কল তো। জয় মা, দেখো, মা, খুলে দাও মা। প্রেম একবারই জীবনে আসে। বেইজ্জত করে দিও না। খুলতে পারলেই হিরো। ডানদিক ঘোরাচ্ছি আর কায়দা করে টানছি। আমার

ড্রয়ারটারও এই একই অবস্থা ওয়ান, টু, থ্রি। কি গুরবল! খুস করে খুলে গেছে।

'এই নিন।' আমার সারা মুখে বিজয়ীর হাসি। দাও শ্যামা সুন্দরী, গলায় বরমাল্য পরিয়ে দাও। এত বড় একটা দুরূহ কাজ করে দিলাম। হরধনু ভঙ্গের মত ব্যাপার।

'খুলেছে?' যূথিকা ঝুঁকে পড়ল। ডান গালটা আমার মুখের কাছে। ধন্যবাদ টন্যবাদ দেবার কোনও ইচ্ছেই নেই। কাগজ, কার্বন বের করার জন্যে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। জাত টাইপিস্ট। কোথায় প্রেম? উঠে দাঁড়ালুম। পা ব্যথা হয়ে গেছে। আর দাঁড়িয়ে থেকে লাভ কি! এতবড় একটা ব্যাপার ঘটে গেল, মনে কোন রেখাপাত করল না। কি মন রে বাবা! মা কালীর মত পাষাণী। এদিকে বকুল এসে গেছে। আমাকে যূথিকার চেয়ার ঘেঁষে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে অবাক হয়ে গেছে। আমার কৃতিত্বটা জানিয়ে দেওয়া দরকার।

'বুঝলেন, আটকে গিয়েছিল। ঘোরে কিন্তু খোলে না।'

বকুল হাতব্যাগ রাখতে রাখতে বললে, 'কি আটকে ছিল?'

আমাকে উত্তর দিতে হল না, যূথিকা টাইপ মেশিনে কাগজ আর কার্বন পরাতে পরাতে বললে, 'ড্রয়ারের চাবি।'

বকুল বললে, 'মুখপোড়া ড্রয়ার, ভেঙে ফেলে দে না?

আমি হেলে দুলে ধীরে সুস্থে বেশ খেলে খেলে নিজের সিটে গিয়ে বসলুম। চোখ বুজিয়ে বেশ কিছুক্ষণ ভাববার মত ব্যাপার। এর পর কি! সোমনাথ আসুক। বেলা বারোটার আগে আসবে না। ততক্ষণ একটু কাজের অভিনয় করা যাক। তাড়াতাড়ি একটা প্রমোশন চাই। বলা যায় না, যদি ফেঁসে যাই, বিয়ে করতে হবে। বিয়ে করলে বাড়ি থেকে দূর করে দেবে। তখন এ মাইনেতে চলবে না।

সোমনাথ এসে গেল। বসতে না বসতেই শুরু করে দিলুম। সিগারেট খেতে খেতে মন দিয়ে শুনল। আমি জিজ্ঞেস করলুম, 'এইবার? হোয়াট নেকসট।' বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে সোমনাথ বললে, 'কত আছে?'

কি কত আছে?'

'হ্যাড' ক্যাশ?'

'সে আবার কি! হার্ড' ক্যাশ দিয়ে কি হবে? দু'দশ টাকা পড়ে আছে।

মাস শেষ হতে চলেছে !'

'গোটা পনের টাকা পড়ে আছে ! কোন রকমে মাসটা চলবে।'

'ওতে হবে না রে ! তোর একটা ফাণ্ড তৈরি করতে হবে মিনিমাম পাঁচশো নিয়ে নামতে হবে।'

'পাঁচশো ! অত টাকা পাব কোথা থেকে ?'

'কো-অপারেটিভ থেকে লোন নে, আমি গ্যারাণ্টার দাঁড়াচ্ছি।'

'ধার করে প্রেম !'

'শাস্ত্রেই আছে ঋণ করে ঘি। প্রথমে পাঁচশো তারপর কেস বেশ জমে গেলে কোথায় গিয়ে ঠেকবে কে জানে। তোর পাড়ায় লাইব্রেরী আছে।'

'হ্যাঁ আছে।'

'মেমবার ?'

'এক সময় ছিলুম। চাঁদা বাকী পড়ায় ছেড়ে দিয়েছি, একটা বই মেরে দিয়েছি।'

'বেশ করেছিস। আজই আবার মেমবার হয়ে যা।'

'লাইব্রেরীর মেমবার হবার সঙ্গে প্রেমের কি সম্পর্ক। লেখাপড়া করতে হবে নাকি ?'

'আজ্ঞে না। অফিসের মেয়েরা বই পড়তে ভীষণ ভালবাসে। কালকে তুই...'

'কালকে আমি কি করব ?'

'তুই একটা বই হাতে, মলাটের দিকটা সামনে করে যূথিকার সামনে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করবি, হেসে হেসে জিজ্ঞেস করবি—কি ড্রয়ার আটকে গেছে নাকি ?'

'তারপর ?'

'তারপর বইটা হল টোপ। কি বই দেখি ? ব্যাস বইটা দিবি পড়তে। দিবি আর নিবি, নিবি আর দিবি। দেবে আর নেবে মেলাবে মিলিবে।'

'ভীষণ ভয় পাই রে ! ছাত্র জীবনে এক পড়ুয়া মেয়ের পাল্লায় পড়েছিলুম। বইয়ের পর বই দিয়েই যাই, ফেরত আর পাই না। সাহস করে চাইতেও পারি না। বই পেয়ে খুশি খুশি ভাব। মেয়েদের খুশি করে ছেলেরা কি রকম আনন্দ পায় ভাব ! বই ফেরত চাইলে যদি রেগে যায়। সেই ভয়ে মাইরি দিয়েই যাই। আমি দিতে থাকি সে নিতে থাকে।

হাতে তেমনি পয়সাও নেই। জলখাবারের জন্য রোজ এক আনা বরাদ্দ। তিরিশ দিনে তিরিশ আনা। পাঁচটা রোববারে পাঁচ আনা বাদ। তার মানে পঁচিশ আনা। এদিকে যাদের যাদের কাছ থেকে বই এনে পড়তে দিয়েছি তারা বই চেয়ে না পেয়ে খেপে বোম! একদিন সবাই মিলে রাস্তায় চেপে ধরে বেধড়ক ধোলাই দিলে। তিনমাস জলখাবার বন্ধ রেখে যার যার বই কিনে ফেরত দিলুম। আর আমার কুমকুম!'

'কুমকুমটা কে?

'আরে সেই বই-মারা মেয়েটা। কি জিনিস মাইরি। পরে জেনেছিলুম ওই মেয়েটা আমাদের মত এক একটা বোকা ছেলে ধরে ধরে বই মেরে নিজের বাড়িতে একটা লাইব্রেরী তৈরি করছিল, একটু মিষ্টি হাসি, সুর করে টেনে টেনে কথা, উয়ুঃ কি সুন্দর ব্যাস, আমরা কাত। গিলোটিনে মাথা পেতে বে-হেড।'

সোমনাথ ফুস্ করে সিগারেটের ধোঁয়া ছেড়ে বললে;

'তোর প্রেম নেই! তোর দ্বারা প্রেম হবে না। শালা ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর বেনেদের মত মেণ্টালিটি। প্রেমিক আর যোগী একই মতের মানুষ। একজন মেয়ে-পাগল আর একজন ব্রহ্ম-পাগল। দুজনেই পাগল! পাগল না হলে প্রেম হয় না। শ্যাম পাগল বুঁচকি আগল হারা, তাদের জন্যে সংসার, হিসেবের খাতা, বগলে ছাতা, মুতো কাঁথা।'

'তুই বুঝছিস না, আমার এখন একস্ট্রা খরচ করবার মত টাকা নেই ভাই। এক একটা বইয়ের দাম আট টাকা, দশ টাকা, পঁচিশ টাকা। মেরে দিলেই হাতে হ্যারিকেন।'

'তবে হাঁ করে বসে থাক। ওদিকে বিধান ভিড়ে পড়ুক।'

সোমনাথ আর কথা না বাড়িয়ে একটা পুরোন বস্তাপচা ফাইল খুলে বসল। ওরকম ফাইল আমার টেবিলেও গোটা কতক আছে। একটা খুললেই সারাদিন হেসেখেলে চলে যাবে। বাইরের আকাশে চাঁপা ফুলের মত রোদ খেলে যাচ্ছে। ফুরফুরে বাতাস। এমন দিনে কি মানুষের দুঃখ কষ্টের ফাইল খুলে বসে থাকা যায়। রাজ্যের আরজি। পশ্চিমবঙ্গের সমাজ-চিত্র দুটো বাদামী মলাটের তলায় যতদিন চাপা থাকে ততদিনই ভাল। কল্পনায় যূথিকাকে নিয়ে বোটানিকসে ঘুরে বেড়াই।

সোমনাথ চিঠি ড্রাফট করছে। আজ দেখছি কাজে খুব আঠা। দেশের

উন্নতি না করে ছাড়বে না। ওদিকে প্রসূন গিয়ে যূথিকার টেবিল ঘেঁষে দাঁড়িয়েছে। মুলোর মত দাঁত বের করে খুব হাসছে। যূথিকাও হাসছে। কোনও মানে হয়! প্রসূন আবার ভাল রবীন্দ্র সংগীত করে। চাকরিতে যেমন প্রতিযোগিতা, প্রেমেও তেমনি। কোন মেয়ের সঙ্গে একা প্রেম করার উপায় নেই! ফোড়ে, ফেউ জুটবেই। কেকের টুকরো। ডিশে রাখলেই পিল পিল পিঁপড়ে। এখুনি এক কলি গান গেয়ে কেল্লা দখল করে নেবে। দাঁত বড়, গাল ভাঙা, চোখ বসা, এসবের কোনটাই যূথিকার চোখে পড়বে না। গান গাইতে পারে, বাস, সাতখুন মাপ। আমি নাচ দেখাব। ভাঙড়া নাচ। ধুত প্রসূনটা আচ্ছা হারামজাদা। কিছুতেই নড়তে চাইছে না।

'সোমনাথ!'

'বল।'

গান শিখবি?'

'গান শিখে কি করব?'

'ওই দেখ, প্রসূন ব্যাটা পাকাধানে মই দিতে গেছে।'

'যাক না তাতে তোর কি? ভ্যাকুয়ামে প্রেম করবি ভেবেছিস? ফেউ, এর পর ফেউ আসবে। লড়ে জিততে হবে। রোপ ওয়াক। গেল গেল, এল এল। কোন দিন ঘুড়ি উড়িয়েছিস? তুমি ত শালা জীবনে কিছুই করনি শুধু জন্মে বসে আছে, প্রেম হল ঘুড়ির প্যাঁচ। কাটতে থাক, কাটতে থাক, একসময় ফাঁকা নীল আকাশ, প্রাণ খুলে ওড়ো। নীলাকাশের সঙ্গে প্রেম।'

সোমনাথ আবার খসখস করে চিঠি লিখতে শুরু করল। আমি টেবিল থেকে উঠে পড়লুম। ওদের পাশ দিয়ে একবার চলে যাই। ননপ্লেয়িং ক্যাপটেন হয়ে বসে থাকলে চলবে না। যা ভেবেছি তাই। প্রেমে পড়লে সিকসথ্ সেনস বেড়ে যায়। প্রসূন বলছে, এ মণিহার আমায় নাহি সাজে রেকর্ডটা আমার আছে। কালই এনে দেবো। ঢং করে একটা সিকি পায়ের কাছে পড়ল। উঃ কি লাক্। যূথিকার পয়সা ব্যাগ থেকে ছিটকে এসেছে। তাড়াতাড়ি তুলে দুবার ফুঁ মেরে হাসি হাসি মুখে এগিয়ে গেলুম।

'আপনার পয়সা।'

প্রসূন হাত বাড়িয়ে সিকিটা নিয়ে পকেটে ফেলে গম্ভীর মুখে বললে, 'ধন্যবাদ। হাঁ হাঁ, আকাশ ভরা সূর্য তারাটাও আছে। কি নেই আমার

কাছে।'

যাঃ শালা। কি বরাত। প্রস্নের পয়সা জানলে কে তুলত। পা দিয়ে মাড়িয়ে চলে যেতুম। প্রেম তুমি আমাকে উদার কর। বেশ জমিয়ে প্রেমে পড়ার আগেই কেন হিংসে এসে যাচ্ছে। কেন মনে হচ্ছে প্রেম বড় এক তরফা। প্রেমে গলি কি ওয়ান ওয়ে? হৃদয়ের গাড়ি ঢোকে। ঢুকে আটকে যায়। বেরোতে গেলে ব্যাক করে বেরিয়ে আসতে হয়। আপাতত ব্যাক করে নিজের জায়গায় চলে যাই। মাথায় কিছু আসছে না। সোমনাথই ভরসা।

মুখ খোলার আগেই সোমনাথ বুঝে গেছে।

'প্রসূন লাইন দিয়েছে। দেখেছি। তোর চেয়ে ভাল ক্যানডিডেট। শীতকালে কাশ্মীরী শাল গায়ে দেয়। পাঞ্জাবীটা দেখেছিস, চিকনের কাজ করা। ভাল গান গায়। প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে বেশ শক্তিশালী। বেশ কায়দা করে লড়তে হবে রে! মেয়েছেলের মন পদ্মপাতায় জল। যাক, তোর আর একটা সুযোগ করে দি। এই চিঠিটা টাইপ করতে দিয়ে আয়। বলবি ডবল স্পেসিং, দুপাশে মার্জিন। আর ফট করে জিজ্ঞেস করবি, বিকেলে কি করছেন?'

'যদি বলে কেন? কেনটা আবার যদি খুব চিৎকার করে বলে! পাশে যারা বসে আছে তারা যদি শুনতে পায়!'

'আ মোলো।' সোমনাথ মেয়েলী ভাষায় গালাগাল দিয়ে উঠল। 'রাসকেল যদি যদি করেই তোর জীবনটা যাবে। যদি ফদি আবার কি। জীবন হল, তক্কা মারা পেরেক।'

'যদি বলে কেন।'

'আবার শালার যদি। বলবি সোমনাথ কোরবানীর টিকিট কেটেছে।'

একেবারেই জামপ করে অতদূর!'

'আজ্ঞে হ্যাঁ। একেই বলে বলিষ্ঠ অ্যাপ্রোচ। সেকরার ঠুকঠাক কামারের এক ঘা। যা যা।' যূথিকাকে চিঠিটা টাইপ করার জন্যে দিতেই, সোমনাথ সঙ্গে তার চোখাচোখি হল। সোমনাথ ইশারায় হাতের ভঙ্গী মুখের হাসি দিয়ে বুঝিয়ে দিল টাইপ। যূথিকা চোখের সামনে মেলে ধরে বললে, 'কি সাংঘাতিক হাতের লেখা!'

আমি অমনি ফট করে বলে ফেললুম, 'আমার হাতের লেখা খুব ভাল।

মুক্তোর মত।' বলে ফেলেই ভীষণ লজ্জা পেয়ে গেলুম। প্রেম মানুষকে জাহির করতে শেখায়। অহমটাকে খুঁচিয়ে তোলে। ভেরি ব্যাড।

যূথিকা বললো 'দেখেছি। শিল্পী শিল্পী চেহারা, শিল্পী শিল্পী কথা মানানসই লেখা।'

যূথিকার কথা শুনে পা কাঁপছে। উবে বাব্বা, প্রেমের ঘণ্টা বেজেছে ঢং করে। মুখে কথা সরছে না। কাঁপতে কাঁপতে চেয়ারে ফিরে এলুম।

সোমনাথ বললে, 'কি হল? জিজ্ঞেস করেছিস? কি বললে? বিকেলে কি করছে?'

'দাঁড়া, এক গেলাস জল খাই।'

'কেন? খিস্তি করেছে?'

জলের গেলাসটা নামিয়ে রেখে, হাত দিয়ে ঠোঁট মুছে ফিস ফিস করে বললুম,

'মরে গেছি, ফিনিশ। বুকটা কেমন করছে।'

'পেটে উইণ্ড হয়েছে। একটা পান খা।'

'ভাগ শালা। বুকে হিল্লোল বইছে, হিল্লোল।'

'কেন রে। চোখ মেরেছে?'

'মোর দ্যান দ্যাট। তীর মেরেছে। তোর হাতের লেখার নিন্দে করে আমায় বললে, "যেমন আপনার শিল্পী শিল্পী চেহারা, ঠিক সেই রকম আপনার কথাবার্তা, ঠিক সেই রকম আপনার মুক্তোর মত হাতের লেখা।"'

'এইতেই তোর বুক ধড়ফড়। ওর গদিতে তোকে দিয়ে খাতা লেখাবে না কি। তোর গালে হাত দিলে কি করবি। দম ফেল করে মরে যাবি। শোন, কোনটা মেয়েদের কথা আর কোনটা কথার কথা আগে, বুঝতে শেখ। যা জিজ্ঞেস করে আয়।'

এবার আমার সাহস বেড়ে গেছে। বরফ যখন গলতে শুরু করেছে তখন আর ভয় কি। নদী বইবে কুলু কুলু। পাখি গাইবে গান, পিউ কাঁহা। গড়গড়িয়ে চলে গেলুম।

'আজ বিকেলে কি করছেন?'

'ক্লাস আছে।'

'কিসের ?'

'স্টেনোগ্রাফির।'

'ও।'

সোমনাথের কাছে ফিরে এলুম, 'ওর স্টেনোগ্রাফির ক্লাস আছে।'

'বলে আয় ক্লাসফ্লাস যাই থাক, আজ সিনেমা।'

আবার যেতে হল, 'ক্লাসফ্লাস যাই থাক, আজ সিনেমা। কোরবানী।'

'কোরবানী।' যেন লাফিয়ে উঠল। 'কে বললে ?'

'গ্রেট সোমনাথ।'

'ঠিক আছে।'

সোমনাথকে এসে বললুম, 'ঠিক আছে।'

সোমনাথ বললে, 'সিনেমার কথায় যে মেয়ে না বলবে, জানবি সে অসুস্থ। স্ত্রীরোগে ভুগছে!'

সারাটা দুপুর পেটটা কেমন কেমন করতে লাগল। নার্ভাস ডায়েরিয়া। বেয়ারাকে দিয়ে দুটো ট্যাবলেট আনিয়ে খেয়ে নিলুম। বলা যায় না হলে বসে প্রকৃতির বেগ এসে গেলে লজ্জার একশেষ হবে। একেই মেয়েরা গ্ল্যাডিয়েটার কিম্বা বুল ফাইটার কিম্বা কাউবয়দেরই ভালবাসে। আমার আবার একটু মেয়েলী মেয়েলী ভাব। হরমোন খেয়ে পুরুষ পুরুষ হতে হবে।

দেখতে দেখতে বিকেল। সোমনাথের দুপ্যাকেট সিগারেট উড়ে গেছে। অফিস প্রায় ফাঁকা। আমরা তিন জনে লিফটে করে নিচে নেমে এলুম। রাস্তায় সোমনাথ হাঁটছে আগে আগে। লিডার অফ দি টিম। পেছনে আমি। আমার এক কদম পেছনে যূথিকা। সোমনাথ আমাকে প্রেম করাতে নিয়ে যাচ্ছে। একেই বলে বন্ধুর মত বন্ধু। বন্ধু হো তো অ্যায়সা।

বাইরের আলোয় যূথিকাকে একটু বেশি শ্যামবর্ণ মনে হচ্ছে। হলেও খারাপ লাগছে না। হাতে ফোলডিং লেডিজ ছাতাটা না থাকলেই ভাল হত। ছাতা হাতে তেমন রোম্যানটিক লাগে না। যাকগে, যা করে ফেলেছে। সিনেমায় যাব বলে ত আর বাড়ি থেকে বেরোয় নি। বেরিয়েছিল অফিসে।

সোমনাথ ভস ভস করে সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে আগে আগে গটগট করে চলেছে। স্টিম ইঞ্জিন চলেছে। আমরা যেন দুটো বগি। পেছন পেছন চলেছি লাফাতে লাফাতে। ইঞ্জিন যে দিকে যাবে, বগিও সেই দিকে যাবে। ইঞ্জিন হেলেদুলে একটা নামজাদা রেস্তোরাঁর অন্ধকার গর্ভে গিয়ে ঢুকল। বেশ

মনোরম পরিবেশ। প্রেমের সুখপাখি এমন জায়গাতেই পাখা মুড়ে বসতে পারে। ফিসফাস খুসখাস, ঘেঁষাঘেঁষি। দুল, চুড়ি, গোঁফ, দাড়ি, ঘাড়, গলা, চিবুক সব একাকার।

সোমনাথ ত খুব গ্যাটগেটিয়ে মেয়ে বগলে ঢুকল! মেয়ে ঢুকল ছাতা বগলে। আমি ঢুকলুম কোঁচা বগলে। কিন্তু। কিন্তু আর যদিহেই আমার জীবনটা শোঁয়াপোকার মত কুঁকড়েই রয়ে গেল। প্রজাপতি আর হল না। কত বিল হবে কে জানে। টাকা কে দেবে! আমার পকেটে পনের টাকা পড়ে আছে।

সোমনাথের বাঁ পাশে যূথিকা। আমি বসেছি উল্টো দিকে একা। সোমনাথ মেজর জেনারেলের মত হাঁকল 'ওয়েটার'! বাব্বা কি দাপট। 'মেনু প্লিজ'। মেনুটা হাতে নিতে নিতে সোমনাথ বললে,'জিরাপানি'। সেটা আবার কি রে বাবা! মেনুর ওপর আবছা চোখ বুলিয়ে পরের অর্ডার, 'রোগনজুস। নান। স্যালাড। আইসক্রীম, ভ্যনিলা'। মেনুটা ওয়েটারের দিকে ঠেলে দিল। হাতটা নিস্‌পিস্‌ করে উঠল। একবার টেনে নিয়ে দেখতে ইচ্ছে করছিল, ক-টাকার ধাক্কা। দেখার সুযোগ পাওয়া গেল না। নেভি ব্লু সুট পরা ময়ূর ছাড়া কার্তিকের মত ওয়েটার টুক করে তুলে নিয়ে আলোছায়া ঘেরা স্বপ্নের মধ্য দিয়ে হেঁটে চলে গেল।

'তারপর ম্যাডাম!' সোমনাথ সব মেয়ের সঙ্গেই ম্যাডাম দিয়ে শুরু করে। এইটাই হল ওর টেকনিক। বিরাট পার্সোন্যালিটি, মেগালোম্যানিয়াক। ম্যাডাম বলে যূথিকাকে দেয়ালঠাসা করে বসল। ম্যাডাম টেবিলের ওপর হাত রেখে আঙুলে আঙুলে কিলিবিলি খেলছেন। নাকছাবি, দুল, চশমা আলো পড়ে চিক চিক করছে। স্বপ্ন, স্বপ্ন।

সোমনাথ হঠাৎ ছাতাটা যূথিকার কোল থেকে তুলে নিয়ে দেখতে দেখতে বললে, 'ফরেন?'

'হ্যাঁ ফরেন। আমার এক পিসতুতো দাদা আমেরিকা থেকে এনে দিয়েছে!'

সোমনাথ ছাতাটা আবার যূথিকার কোলে খচর মচর করে গুঁজে দিল। মেয়েটা সোমনাথের হাতের স্পর্শে কেঁপে কেঁপে উঠল। উঃ ভাবা যায় না। সোমনাথের কি সাহস রে বাবা। মেয়েরা বোধহয় এই রকম হাতকেই বলে অ্যাগ্রেসিভ হ্যাণ্ড। আমি একটা ভ্যাবাচ্যাকা জরদ্‌গবের মত উল্টো দিকে বসে আছি। প্রেম ফ্রেম মাথায় উঠে গেছে। বেশ বুঝতে পারছি প্রেমের মাঠে আমি এক নাবালক।

ঢক ঢক করে তিন গেলাস জিরাপানি ওয়েটার আমাদের সামনে নামিয়ে রেখে গেল। সোমনাথ বললে, 'নে খেতে থাক অ্যাপেটাইজার।'

পৃথিবীতে কত রকমের যে খাদ্য আছে, পানীয় আছে। এই পঁচিশটা বছর ধরে শুধু ভাত ডাল আর ডাল ভাত খেতে খেতেই জীবনে অরুচি ধরে গিয়েছিল। জিরাপানিতে চুমুক মেরে পঁচিশ বছরের বোদা মুখ ছেড়ে গেল। বিশেষ একটা সময়ে মেয়েদের স্বাদ না সাধ কি একটা হয় না! মনে হল আজ আমার তাই হচ্ছে।

খাবার এসে গেল! সে এক এলাহি ব্যাপার! ব্যাঙের মত ফুলো ফুলো নান না কি যেন ওই। মাঝখানে ঘি, কালো জিরে। রোগনজুস। স্যালাড। সোমনাথ গপাগপ খেতে শুরু করল। যূথিকাও কম যায় না। আমি মাঝে মাঝে আড় চোখে দেখছি। মনে হচ্ছে আমার সামনে বসে আছে জামাইবাবু আর দিদি। আমি যেন ছোট্ট শ্যালকটি। দুজনে বেশ জমে গেছে। কথা চলছে, হাসি চলছে। সোমনাথ মাঝে মাঝে বাঁ হাতে চামচে দিয়ে যূথিকার প্লেটে স্যালাড তুলে দিচ্ছে। কোলের ওপর ন্যাপকিন পেতে দিচ্ছে। সোমনাথের কাণ্ড [illegible]মার মুখ শুকিয়ে আসছে। হয়ে গেল আমার প্রেম। নদী এখন অন্য [illegible] শুরু করেছে।

আ[illegible]এসে গেল। মাঝখানে আবার কায়দা করে পাতলা পিচবোর্ড গোঁজা। [illegible]থ বললে, 'পিচবোর্ড নয় রে, ওটা বিসকুট। ওকে বলে ওয়াফার।'

যূথিকা [illegible] সায় বললে, 'আইসক্রীম খাব না। গলা ধরে যাবে।'

সোমন[illegible] 'কিচ্ছু হবে না ম্যাডাম। ঠাণ্ডা ঘরে বসে আইসক্রীম খেলে গলায় ঠাণ্ড[illegible]।'

সোমনা[illegible]ন বেদবাক্য। যূথিকা হেসে হেসে খেলে খেলে আইসক্রীম খেতে লাগল [illegible]বার গরম জল এল বাটিতে। এক টুকরো লেবু ভাসছে। আমি ভেবেছিল[illegible]পাক খাওয়া হল ত, তাই জিরাপানির মত লেবুপানি এসেছে। সোম[illegible]ল, 'মূর্খ, একে বলে ফিঙ্গার বোল। লেবুটা হাতে ঘটকে দে। ইট [illegible] গ্রিজ।' পেছনের দিকে মুণ্ডু ঘুরিয়ে চিংকার করে উঠল, 'বেয়ারা, বিল[illegible]'

কি আদেশের সু[illegible]ব ছেলে পৃথিবী শাসন করতে পারে, যূথিকা ত সামান্য মহিলা। বি[illegible] আমার জিভেতে আটকে গেছে। আমাকে দিতে হলে ঘড়ি খুলে দিতে হ[illegible] সোমনাথ পকেট থেকে এক গোছা নোট বের করল। ঠোঁটে সিগারেট [illegible]ক ছুঁয়ে ধোঁয়া উঠছে চোখের সামনে দিয়ে। নাকের কাছটা কোঁচকান। [illegible]া হয়ে আছে গ্রেট গ্যাম্বলারের তাসের চাল

দেবার মত। বিল সমেত পঞ্চাশ টাকার একটা নোট প্লেটের ওপর ফেলে দিল।

রেস্তোরাঁ থেকে বেরোবার সময় যূথিকার পিঠে তবলায় তেহাই মারার মত ঝরে আঙুলের তিনটে চাপড় মেরে বললে, 'চল, চল।'

বাঃ ভাই। বত কায়দাই জান? আমার প্রেমিকার পিঠে তবলা বাজানো। আমার আর কি রইল। যূথিকা যে ভাবে তোমার বক্ষলগ্না, তৃতীয় চোখে দেখলে মনে হবে পারফেকট্ স্বামী-স্ত্রী।

রেস্তোরাঁর উল্টো দিকেই পান সিগারেটের দোকান। বরফের চাঙড়ার ওপর হলদে হলদে পান পাতা শোয়ান। বিশাল দোকান। বিশাল আয়না। বোতলের জল। জর্দার গন্ধ। ধূপ জ্বলছে। সোমনাথ বললে, 'তিনটে মঘাই পান। একটায় পিলাপাত্তি জর্দা। আর এক প্যাকেট সিগারেট নিয়ে আয়।'

'আমি পান খাই না।'

'তাহলে দুটো নিয়ে আয়।'

বুঝলাম এটা আমার ইনভেস্টমেন্ট। সাড়ে তিন টাকা খসে গেল। যূথিকা পান চিবোচ্ছে আর ঠোঁট উলটে উলটে দেখছে কি রকম লাল হল।

সোমনাথ আমাকে ফুটপাথের একপাশে টেনে নিয়ে গিয়ে চাপা গলায় বললে, 'শোন, আমার কাছে দুটো টিকিট আছে। ব্যাপারটা তোর জন্যে প্রায় সড়গড় করেছি, বাকিটা সিনেমা হলে গিয়ে করব। একটু ইজি না করে দিলে তুই সামলাতে পারবি না। আমরা চলি, কাল তোকে সব বলব। হয়ে এসেছে। যেটুকু বাকি আছে হলে হয়ে যাবে।'

সোমনাথ ইঞ্জিনের মত ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে চলেছে [illegible] এবার একটা বগি। আর একটা বগি সাইডিং-এ পড়ে রইল। সেই ব[illegible]রে কে একজন হই হই করে হেসে উঠল, মুর্খ মুর্খ। প্রেম বলে কিছু [illegible]ছে লটকালটকি। আছে শানটিং।